

হ্রাস্যন আজাদ

সব
কুড়া
ভেঙ্গে
পড়ু

সব কিছু ভেঙে পড়ে

‘ব্রিজ একটি কাঠামো; সব কিছুই আমার কাছে কাঠামো’, বলেছে সব কিছু ভেঙে পড়ের নায়ক, সেতু-প্রকৌশলী, মাহবুব; সে আরো বলেছে, ‘বিশতলা টাওয়ার, জানালার গ্রিলে বৃষ্টির ফোটা, শিশিরবিন্দু, সভ্যতা, বৃদ্ধিগঙ্গার ব্রিজ, সমাজ, সংসার, বিবাহ, পনেরো বছরের বালিকা, তার বুক, দুপুরের গোলাপ, দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম, আর একটির পর একটি মানুষ—পুরুষ, নারী, তরুণী, যুবকের সাথে আমার সম্পর্ক, অন্যদের সম্পর্ক, সব কিছুই, আমার কাছে কাঠামো।’ কাঠামোর কাজ ভার বওয়া; যতোদিন ভার বইতে পারে ততোদিন তা টিকে থাকে; ভার বইতে না পারলে ভেঙে পড়ে। কোনো কাঠামোই চিরকাল ভার বইতে পারে না। মাহবুব জানে, ‘সত্য হচ্ছে ভেঙে পড়া, কাঠামোর কাজ ওই ভেঙে পড়াকে, চরম সত্যকে, কিছু কালের জন্যে বিলম্বিত করা; কিন্তু একদিন সব কাঠামোই ভেঙে পড়বে।’ হ্মায়ুন আজাদের সব কিছু ভেঙে পড়ের বিষয় নারীপুরুষের শারীরিক ও হৃদয়সম্পর্কের কাঠামোটি। নারীপুরুষের পরম্পরারে প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে, এটা তাদের নিয়তি; এবং আরো মর্মান্তিক নিয়তি হচ্ছে তাদের আকর্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সব কিছু ভেঙে পড়ের নায়ক মাহবুব ব্রিজের পর ব্রিজ বানিয়েছে, নদীর ওপর তার ব্রিজগুলো টিকে আছে, যদিও একদিন ভেঙে পড়বে; কিন্তু ওই ব্রিজের থেকেও শক্ত উপাদানে সে মানুষের সাথে, নারীর সাথে, অনেকগুলো মানবিক সেতু সৃষ্টি করেছিলো, তার একটিও টেকে নি, একের পর এক ভেঙে পড়েছে। বিবাহ ভেঙে পড়েছে, প্রেম ভেঙে পড়েছে, কাম ভেঙে পড়েছে; কোন কাঠামোই টেকে নি। মাহবুব বলেছে, ‘পৃথিবী জুড়ে মহাজগত জুড়ে ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে; আমি ভাঙা দালানের ভেতর দিয়ে পথ থেকে পথে ছুটছি, দালানের পর দালান ভেঙে পড়ছে, শহর ভেঙে পড়ছে, আমি অঙ্ককারে ভেঙে পড়া দালানের পর দালানের ভেতর দিয়ে ছুটছি, কী যেনো খুঁজছি, আমার চারদিকে দালান ভেঙে পড়ছে, শহর ভেঙে পড়ছে, সব কিছু ভেঙে পড়ছে।’ অসামান্য গদ্যে হ্মায়ুন আজাদ এ-উপন্যাসে উদঘাটন করেছেন নারীপুরুষের সম্পর্কের নিয়তি—সব কিছু ভেঙে পড়ে।



হ্মায়ুন আজাদ একজন প্রধান কবি, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, কলামপ্রাবন্ধিক, কিশোরসাহিত্যিক; এবং উপন্যাসিক। ১৯৯৪-এ বেরোয় তাঁর প্রথম উপন্যাস ছাপ্নামো হাজার বর্গমাইল, যা অভৃতপূর্ব সাড়া জাগায়, এবং গণ্য হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিনব উপন্যাস ব'লে। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রথাবিরোধী লেখক তিনি, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। ছাত্র হিশেবে ছিলেন অত্যন্ত কৃতী, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানে ডক্টরেট করেছেন; পড়িয়েছেন চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪: ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ বিক্রমপুরের রাড়িখালে। তাঁর বইয়ের মধ্যে রয়েছে—কবিতা: অলৌকিক ইস্টিমার, জলো চিতাবাঘ, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল, আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে, হ্মায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা; উপন্যাস: ছাপ্নামো হাজার বর্গমাইল; সমালোচনা-প্রবন্ধ: রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিক্ষা, শামসুর রহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা, শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি, আধাৰ ও আধেয়, প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে, নিবিড় নীলিমা, মাতাল তরণী, নরকে অনন্ত ঝুতু, জলপাইরঙ্গের অঙ্ককার, নারী, সীমাবন্ধতার সূত্র; ভাষাবিজ্ঞান; বাক্যতত্ত্ব, বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, *Pronominalization in Bengali*, বাঙলা ভাষা [দু-খণ্ড], তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান; কিশোরসাহিত্য: লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী, কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী, ফুলের গক্ষে ঘুম আসে না, আবুকে মনে পড়ে, বুকপকেটে জোনাকিপোকা; তাঁর একটি ব্যতিক্রমী বই হ্মায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ। আধুনিক বাঙলা কবিতার একটি আপোষহীন সংকলন সম্পাদনা করেছেন তিনি আধুনিক বাঙলা কবিতা নামে; তাঁর আরেকটি বইয়ের নাম সাক্ষাৎকার।

ISBN 984-401-264-3

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

ওমায়ন আজাদ

সব কিছু ভেঙে পড়ে

ওমারুন আজাদ
সব কিছু
তেমে পড়ে



আগামী প্রকাশনী

একাদশ প্রকাশ ফালুন ১৪১৭ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশ ফালুন ১৪০১ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ ফালুন ১৪০১ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

তৃতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০২ : জুলাই ১৯৯৫

চতুর্থ মুদ্রণ চৈত্র ১৪০৩ : এপ্রিল ১৯৯৭

পঞ্চম মুদ্রণ ফালুন ১৪০৫ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

ষষ্ঠ মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৪০৭ : সেপ্টেম্বর ২০০০

সপ্তম মুদ্রণ ফালুন ১৪১০ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪

অষ্টম মুদ্রণ ফালুন ১৪১২ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

নবম প্রকাশ ফালুন ১৪১৩ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

দশম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ : নভেম্বর ২০০৮

স্বত্ব : মৌলি আজাদ, স্থিতা আজাদ, অনন্য আজাদ

**প্রকাশক উসমান গনি আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১**

**প্রচ্ছদ সমর মজুমদার
মুদ্রণ ব্রহ্মপুর প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুক্লাল দাস লেন ঢাকা**

মূল্য : একশো আশি টাকা

Sab Kichu Bhenc Pare : Things Fall Apart ::

A Novel by Humayun Azad.

**Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh.**

Phone : 711-1332, 711-0021

c-mail : info@agameeprakashani-bd.com

Eleventh Printing : February 2011

Price : Taka 180.00 only

ISBN 978 984 04 1409 6

উৎসর্গ
যাদের আমি পাই নি
যারা আমাকে পায় নি

আমি ব্রিজ বানাই; বলতে পারতাম সেতু বানাই, তবে সেতু কথাটি, অন্যদের মতোই, সাধারণত আমিও বলি না, বলি ব্রিজ;— ব্রিজ বললেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় আমার কাছে, চোখের সামনে ব্যাপারটি আর বস্তুটি দাঢ়ানো দেখতে পাই। সেতু বললে এখন আর কিছু দেখতে পাই না। বড়ো কয়েকটি ব্রিজ আমি বানিয়েছি, এখনও একটি বানাচ্ছি; কিন্তু সব সময় আমি ভয়ে থাকি ওই ব্রিজগুলো হয়তো এ-মৃহূর্তেই ভয়ঙ্কর শব্দ ক'রে ভেঙে পড়বে। তবে জানি এ-মৃহূর্তে পড়বে না, যদিও পড়বে; ভবিষ্যতে ভেঙে পড়ার শব্দ এখনই আমি শনতে পাই, দেখতে পাই তার দৃশ্যও। ছোটবেলায় আমি একটি সাঁকো, বাঁশের পুল নিয়ে ভেঙে পড়েছিলাম; আমার বানানো ব্রিজগুলোর পাশে সেটা কিছুই নয়, কিন্তু সব ব্রিজকেই আমার ওই সাঁকোটির মতো নড়োবড়ো মনে হয়। ব্রিজ একটি কাঠামো; সব কিছুই আমার কাছে কাঠামো;—বিশ্বলা টাওয়ার, জানালার গ্রিলে বৃষ্টির ফোটা, ঘন্টা, শিশিরবিন্দু, সত্যতা, বুড়িগঙ্গার ব্রিজ, সঞ্জ, সংসার, বিবাহ, পনেরো বছরের বালিকা, তার বুক, দুপুরের গোলাপ, দীর্ঘস্থায়ী, ধর্ম আর একটির পর একটি মানুষ— পুরুষ, নারী, তরুণী, যুবকের সাথে স্বামীর সম্পর্ক, অন্যদের সম্পর্ক, সব কিছুই আমার কাছে কাঠামো। কাঠামোর কাজ তার বওয়া; যতোদিন তার বইতে পারে ততোদিন তা টিকে থাকে; তার বইতে না পারলে ভেঙে পড়ে। কোনো কাঠামোই চিরকাল তার বইতে পারে না। কাঠামোগুলো বর্ষন তৈরি করা হয়, তখন একটা ভারের হিশেব থাকে; কিন্তু দিন দিন তার বাচ্চকে থাকে সেগুলোর ওপর, একদিন বাড়তি তার আর সহ্য করা সম্ভব হয় না সেগুলোর পক্ষে। তখন ভেঙে পড়ে। সত্য হচ্ছে ভেঙে পড়া, কাঠামোর কাজ ওই ভেঙে পড়াকে, চরম সত্যকে, কিছু কালের জন্যে বিলম্বিত করা; কিন্তু একদিন সব কাঠামোই ভেঙে পড়বে। আমার পেশা ভেঙে পড়াকে একটা চমৎকার সময়ের জন্যে বিলম্বিত করা। আমার বন্ধু কলিযুক্ত কবিতা পছন্দ করে;— কবিতা একদিন আমিও পছন্দ করতাম— সেও ব্রিজ বানায়, কথায় কথায় সে বলে ব্রিজ হচ্ছে নদীর ওপর লোহার সঙ্গীত, বিম-পিয়ার-স্প্যানের লিরিক; তখন আমি সঙ্গীত আর লিরিকের কাঠামোর কথা ভেবেও তয় পাই, সঙ্গীত ও লিরিকের প্রচণ্ডভাবে ধ্বংস হওয়ার শব্দ শনতে পাই, ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখতে পাই।

ব্রিজ বানাতে বানাতে আমি চারদিকে ব্রিজ দেখতে পাই, ব্রিজ খুঁজি; কোনো মানুষকে দেখলেই তার ব্যক্তিগত ব্রিজের অবস্থা কী;— সে কার সাথে কেমন ব্রিজ দিয়ে নিজেকে যুক্ত করেছে, তার খালের বা নদীর এপার-ওপারের সম্পর্ক কী, তার কতোগুলো ব্রিজ নড়োবড়ো, কতোগুলো ব্রিজ ভেঙে পড়েছে, কতোগুলো সে আবার নতুনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছে, তা জানতে ইচ্ছে করে; তার মুখের দিকে তাকালে অনেক ধ্বংসপ্রাণ ব্রিজের কাঠামো দেখতে পাই। তবে আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি

না। প্রত্যেকেই এমন তাৰ কৱে যে তাৰ প্রত্যেকটি ব্ৰিজ চিৱকাল ধ'ৰে ঠিক আছে, চিৱকাল ধ'ৰে ঠিক থাকবে; কিন্তু আমি যেহেতু কাঠামো নিয়ে কাজ কৱি, কী উপাদান কতোটা টেকসই, তা আমাৰ মোটামুটি জানা, তাই তাৰের তান দেখে আমাৰ দুঃখ হয়। আমাৰ ব্ৰিজগুলোই কি আমি ঠিকমতো রাখতে পেৱেছি? নদীৰ ওপৰ বানানো আমাৰ ব্ৰিজগুলোৱ কোনোটি আজো ভেঙে পড়ে নি; কিন্তু সেগুলোৱ থেকেও শক্ত উপাদানে আমি সে-সব ব্যক্তিগত ব্ৰিজ বানিয়েছিলাম, তাৰ অনেকগুলোই ধ'সে পড়েছে; যে-ব্ৰিজগুলো আমাৰ জীৱনকালে হয়তো ধ'সে পড়বে না, সেগুলোৱ বিমে ফাটল ধৰেছে, তত্ত্বে তয়কৰ চাপ পড়ছে; সেগুলোকে আমি ঢিকিয়ে রাখতে পাৰবো না, যদিও সবাই চায় আমি ওগুলো ঢিকিয়ে রাখি; কিন্তু সেগুলো যে নিৰ্বৰ্থক হয়ে গেছে, তা আমি ভালো ক'ৱেই জানি। আমাৰ ওই ব্ৰিজগুলো আছে, কিন্তু সেগুলোৱ ওপৰ দিয়ে কোনো চলাচল নেই; তাই ওগুলো থাকাৰ কোনো অৰ্থ হয় না।

কিন্তু ব্ৰিজ, অৰ্থাৎ সাঁকো, আমাৰ ভালো লাগে। খাল, নদী, পৰিষা, পুকুৱ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা; ব্ৰিজ হচ্ছে সম্পর্ক। ছেলেবেলায় সাঁকোৱ ওপৰ দিয়ে যাওয়াৰ জন্যে অনেক পথ যুৱে আমি ইঙ্গুলে গেছি, মামাৰাড়ি যাওয়াৰ সোজা পথকোনো সাঁকো ছিলো না ব'লে সোজা পথ দিয়ে না গিয়ে আমি অনেক পথ যুৱে গেছি, সে-পথ দিয়ে যাওয়াৰ সময় প্ৰথম একটি কাঠেৰ সাঁকো পড়তো, তাৰপৰ জনেক দূৰ হাঁটাৰ পৰ পড়তো একটা বড়ো লোহাৰ পুল। মাঘ মাসেই কাঠেৰ পুলটিৰ নিচেৰ খাল শুকিয়ে যেতো, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা হতো; সবাই ওক্টোমাত্রা দিয়েই যেতো, পুলটি দাঁড়িয়ে থাকতো শুকনো কঙালেৰ মতো, তখন সোজি দেখে আমাৰ কষ্ট হতো। আমি তখনও পুল দিয়েই যেতাম, যদিও যেকেন্তে আমাৰ ভালো লাগতো না; যে-পুলেৰ নিচে পানি নেই, তাকে পুল মনে হতো না। তাই এক সময় আমিও পুলেৰ নিচেৰ রাস্তা দিয়েই যেতাম, পুলটিৰ দিকে তাকিয়ে কষ্ট পেতাম। লোহাৰ পুলটি যে-দিন ভেঙে পড়লো, সে-দিন আমাৰ কষ্টেৰ সীমা ছিলো না; ছেলেবেলায় যা কিছুকে আমাৰ অবিনশ্বৰ মনে হতো, তাৰ প্ৰথমেই ছিলো লোহাৰ পুলটি;— অমন শক্ত কাঠামো তখন আমি আৱ দেখি নি, আমাৰ বিশ্বাস ছিলো ওটা কখনো ভেঙে পড়বে না। লোহাৰ পুলেৰ কথা মনে হ'লৈই আমাৰ বাবাকে মনে পড়ে, এবনও মনে পড়ছে; তাৰ সম্পর্কে বড়ো ইওয়াৰ পৰ আমি কিছু ভাবি নি, কিন্তু যখন কিশোৱ আমি তখন বাবাই ছিলেন আমাৰ ভাবনাৰ বড়ো বিষয়, ওই লোহাৰ পুলটিৰ মতোই। বাবা দেখতে লোহাৰ পুলটিৰ মতোই বিৱাট আৱ শক্ত ছিলেন; লুঙ্গি আৱ দামি পাঞ্জাবি পৰতেন, হাঁটতেন সামনেৰ দিকে একটু ঝুকে; কোথাও যাওয়াৰ সময় তাৰ পেছনে আমাদেৱ শক্ত চাকৱটা যেতো, তাছাড়া আৱো দু-চাৰজন লোক তাৰ দু-পাশে থাকতো সব সময়ই। বাবাৰ পাশে লোকগুলোকে মানুষই মনে হতো না, নেড়ি কুকুৱেৰ মতো দেখাতো; তবে ওই লোকগুলোৱ মুখে আমি কোনো যন্ত্ৰণাৰ ছাপ দেখতে পেতাম না, কিন্তু বাবাৰ মুখে দেখতে পেতাম। ওই লোকগুলোৱ যন্ত্ৰণাৰ শক্তিই সম্ভবত ছিলো না। বাবাৰ সম্ভবত কোনো ব্ৰিজ ছিলো না; তাৰ কাছে যাবা আসতো তাৱা এতো সামান্য ছিলো যে বাবাৰ সাথে তাৰেৱ কোনো সম্পর্ক হ'তেই পাৱে না। বাবাৰ মুখেৰ দিকে তাকালে আমি ব্ৰিজহীনতাৰ কষ্ট

দেখতে পেতাম। হোটোবেলায়ই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমরা প্রতোকেই খালের একপার,— খালের রূপকটিই আমার মনে হতো যেহেতু আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটি বড়ো খাল চ'লে গিয়েছিলো,— তাই অন্যপারের সাথে, অন্য কারো সাথে, অন্য অনেকের সাথে সাঁকো বাঁধা দরকার; কিন্তু বাবা কোনো সাঁকো বাঁধতে পারেন নি।

আমাদের পুরের পুরুষটি বেশ বড়ো ছিলো, সেটি ঘিরে ছিলো অনেকগুলো ঘাট। আমাদের ঘাটটির থেকে দক্ষিণে, পুরুষটি যেখানে পুব দিকে বাঁক নিয়েছে, সেখানে ছিলো মোল্লাবাড়ির ঘাট; ওই ঘাটে একদিন খুব তোরবেলা, আমার যখন আট বছর বয়স হবে, আমি ওই বাড়ির একটি নতুন বউকে গোসল করতে দেখি। সে-দিন খুব তোরে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আমাদের দোতলা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরুষের দিকে তাকাই, উপুরি আর নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখি নতুন বউটি গোসল করছে। সেটা শীতকাল ছিলো, জলের ওপর ধুয়োর মতো কুয়াশা উড়ছিলো, শিশিরে উপুরি আর নারকেলগাছগুলো ভিজে গিয়েছিলো, সে-কনকনে ঠাণ্ডায় এতো তোরে বউটি কেনো গোসল করে তেবে আমি অবাক হই। বউটি গোসল করে শাড়ি বদলায়, পরার শাড়িটি পানিতে ছুঁড়ে মেরে দু-তিনবার ধোয়, তারপর শাড়িটি দু-হাতে চেপে একটি বলের মতো বানিয়ে সিডির মাথায় রেখে দিয়ে বাড়ির ঢিকে চ'লে যায়। সে কেনো এতো তোরে গোসল করলো? মাকে কি জিজ্ঞেস করবো ঘুম থেকে উঠলে? কিন্তু হোটোবেলা থেকেই জিজ্ঞেস ক'রে কোনো সত্য জানতে আমার ইচ্ছে করে না, সত্য আমি নিজে জানতে চাই নিজে বের করতে চাই। বিকেলবেলা আমি একবার মোল্লাবাড়ি যাই; মাঠে যাবো ব'লে আমি বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মোল্লাবাড়ি গিয়ে উঠি। বউটিকে আমি আগেও দেখেছি, একদিন সে আমাদের বাড়ি এসেওছিলো; আমাকে দেবেই সে ঘর থেকে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে। তার জড়িয়ে ধরা আমার ভালো লাগে, কিন্তু আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেস্ট করি। বউটি আমাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে, এবং আমার আরো ভালো লাগতে থাকে।

‘আপনি এতো তোরে গোসল করেন কেনো?’ আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি।

বউটি অবাক হয়, বিব্রত হয়, এবং হেসে ফেলে।

‘আমি তোরে গোসল করি তুমি জানো কীভাবে?’ বউটি নিচু গলায় বলে।

‘তোরে ঘুম ভাঙলে আমি বারান্দায় দাঁড়াই, তখন দেখি আপনি গোসল করছেন’, আমি বলি।

‘নতুন বউরা তোরেই গোসল করে’, বউটি হেসে হেসে আমার গাল টিপতে টিপতে বলে, ‘তোমার বউও তোরে গোসল করবে।’

আমি তার বাল্ল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড় দিই।

নতুন বউরা কেনো তোরবেলা গোসল করে?— প্রশ্নটি ঘুরতে থাকে আমার মাথার মধ্যে। নতুন বউরা সুন্দর থাকতে চায়, তোরবেলা গোসল করলে বউরা সুন্দর হয়ে ওঠে; নতুন বউদের চামড়া খুব ঝলমল করে, তোরবেলা গোসল করে ব'লেই হয়তো, এমন একটা উন্নতি আমার ভেতরে তৈরি হয়ে যায়। পরের দিন তোরেও তাকে আবার

আমি গোসল করতে দেখি, কুয়াশার ভেতরে সে গায়ে পানি ঢেলে গোসল করছে, তার শরীর থেকে ধূয়োর মতো কুয়াশা উড়ছে, সে বদনা দিয়ে মাথায় পানি ঢালছে, বাঁ হাত দিয়ে বারবার বুক ঘষছে, তার দু-পায়ের মাঝখানে তলপেটের দিকে পানি ঢালছে, ঘষছে, কুয়াশা উড়ছে; আমার শরীর কেনো যেনো হঠাত খিলিক দিয়ে ওঠে; আমি ফিরে এসে বিছানায় শয়ে পড়ি। পরে আমি বুঝতে পারি বউটির সাথে তার পুরুষটির একটি সাঁকো তৈরি হয়েছে। বিয়ে একটা ব্রিজ, এমন একটা ধারণা আমার তখনি হ'তে থাকে; বউটির বাড়ি শিয়ুলিয়া আর লোকটির বাড়ি দক্ষিণের মোহাম্মদপুর, তাদের কথনো দেখা হয় নি, কিন্তু একটা সাঁকো তৈরি হয়ে গেছে তাদের মধ্যে, তাই তারা এখন এক ঘরে ঘুমোয়, আর বউটি প্রত্যেক ভোরে উঠে কুয়াশার মধ্যে গোসল করে। আমি বুঝে উঠতে থাকি যানুষ দু-প্রকার, পুরুষ আর মেয়েমানুষ, আর তাদের মধ্যে একটা রহস্যজনক সাঁকো তৈরি হয়। তখন থেকে পৃথিবী আমার চোখে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়, মেয়ে আর পুরুষমানুষ, এবং আমি তাদের মধ্যের বিজগুলো খুঁজতে থাকি, দেখতে থাকি, মাঝেমাঝে আগনের মতো জুলে উঠি আর কর্মনো বরফ হয়ে যাই।

পাশের বাড়ির মোহাম্মদ আবদুর রহমানদের ঘর ছিলো একটি। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাবা ছিলো মৌলভি, সিলেটে চালু করতো; বাড়ি আসতো আট-দশ মাস পরপর; রহমানকে সে বাবা মোহাম্মদ আবদুর রহমান বলে ডাকতো, আমরা রহমানকে রহমান বললে আমাদের ভেকে বাস্তুয়ে দিতো যে সে রহমান নয়, সে মোহাম্মদ আবদুর রহমান, তাকে ওই বাস্তুর ডাকা উচিত, নইলে কবিরা শুনাই হবে; সে—মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাস্তু তলে একটা ঘটনা ঘটতো। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের মাও মৌলভি ছিলো মনে রাখ; মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাবা বাড়ি এলেই সে লজ্জা ক'রে ঘোমটা দিতে, সন্ধ্যার আগেই সুন্দর ক'রে চুল আঁচড়াতো, চোখে সুরমা পরতো, আর সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর মোহাম্মদ আবদুর রহমান, তার একটি ছোটো ভাই ও একটি বড়ো বোন আমাদের পশ্চিমের ঘরে ঘুমানোর জন্যে কাঁথাবালিশ নিয়ে উঠতো। বোনটি আমার থেকে বড়ো ছিলো, বালিশ নিয়ে এসে আমাদের ঘরে ঘুমোতে সে লজ্জা পেতো। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বাবা বাড়ি এলেই মোহাম্মদ আবদুর রহমানের মা ভোরবেলা গোসল করতো, উঠেনের তারে শাড়ি ঝুলিয়ে দিতো; মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বোনটি মায়ের ঝোলানো শাড়ি দেখে লজ্জা পেতো। কিছু দিন পর মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বোনটির বিয়ে হয়, সেও ভোরবেলা গোসল করতে শুরু করে। ভোরবেলা গোসল ক'রে তার কালো ঝঙ্গ ঝলঝল ক'রে ওঠে। মোহাম্মদ আবদুর রহমানের মা আর বোন কিছু দিন ধ'রে একই সাথে বুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে থাকে, ঘাটে গিয়ে একসাথে গোসল করতে থাকে; মোহাম্মদ আবদুর রহমানের বোনের গালে অনেকগুলো দাগ ফুটে থাকতে দেবি আমি, তবে তার মায়ের গালে কোনো দাগ দেখতে পাই না।

আমি বেড়ে উঠেছি সবুজের মধ্যে— আমাকে ঘিরে ছিলো গাছপালা; আমি বেড়ে উঠেছি নীলের নিচে—আমার মাথার ওপর ছিলো জমাট নীল ঝঙ্গের আকাশ; আমি বেড়ে উঠেছি জলের আদরে—আমাকে ঘিরে ছিলো নদী, আঘাতের খাল আর তাদ্রের বিল;

এবং আমি বেড়ে উঠেছি নারীপুরুষের মধ্যে— আমাকে ঘিরে ছিলো নারী, পুরুষ তাদের শরীর, কাম, ভালোবাসা। আমি গাছপালার ভেতরে চুকতে পেরেছি, আকাশের নিচে ইঁটতে পেরেছি, জলে সাঁতার কাটতে পেরেছি; কিন্তু নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে চুকতে পারি নি; আমি বুঝতে পেরেছি ওটি নিষিদ্ধ এলাকা, ওই এলাকায় সরাসরি চুকতে পারা যাবে না, কারো কাছে কিছু জানতে চাওয়া যাবে না, শুধু দূর থেকে দেখতে হবে, দেবে চোখ বুজে ফেলতে হবে, এবং চোখ বুজে দেখতে হবে। আমারও একটি শরীর ছিলো, আমার শরীরেরও কতকগুলো একান্ত ব্যাপার ছিলো—হোটোবেলা থেকেই আমি তা বোধ ক'রে এসেছি, কিন্তু সেগুলোর কথা কাউকে বলতে পারি নি। ক্ষুধা লাগলে বলেছি, সাথে সাথে সাড়া প'ড়ে গেছে; মাথা ধরলে বলেছি, তাতে আরো সাড়া পড়েছে; কিন্তু ওই ক্ষুধা আর মাথা ধরার থেকেও ভয়ঙ্কর অনেক পীড়ন আমি টের পেয়েছি আমার শরীরের ভেতর, তা আমি কাউকে বলতে পারি নি। আমি বুঝতে পেরেছি শরীর এক মারাত্মক আগুন, প্রত্যেকটি মানুষ বয়ে বেড়ায় একেকটি লেনিহান অগ্নি। আমি পুরুষ-অগ্নি দেবেছি, নারী-অগ্নি দেবেছি, তাদের গোপন দাউদাউ জুলা দেবেছি, নিতে যাওয়া দেবেছি; আমার মনে হয়েছে যান্ম স্তুতি অন্যের সাথে সবচেয়ে নিষিদ্ধ সোকোটি তৈরি করে শরীর দিয়ে। শুনতের শরীর খুব মারাত্মক ব্যাপার, হোটোবেলায়ই বুঝেছি আমি। আমি শরীর দেখে, শরীর আগুন দেখে প্রথম কবে কেপে উঠেছিলাম? আমার মনে নেই, কারোই হয়তো মনে থাকে না; কিন্তু আজো চোখ বুঝলে ঝিলিকের পর ঝিলিক দেখতে পাই, চোখ বুজে তাকালে আমি মাছরাঙ্গা দেখতে পাই, আমের বোল দেখি, টিয়ের্টুটো আমগাছে সিদুর দেখি, চিল দেখি, আর দেখতে পাই আমাদের কাজের মেয়ে, যে আমার থেকে অনেক বড়ো ছিলো, কদবানের বুক ত'রে দুটি সবুজ পেপে,— সে ঘর মেটে দিচ্ছে, তার সবুজ পেপে কাপছে, সে গোসল ক'রে আমার সামনেই লাল গাম্ভী দিয়ে মুছছে পেপে, আমি অঙ্ক হয়ে যাচ্ছি। আমার অঙ্ক চোখের কথা কেউ জানে না, কদবান কখনো টেরও পায় নি।

পুরুষদের আমি হোটোবেলা থেকেই এক বিশ্বয়কর প্রাণী হিশেবে দেখে এসেছি; মনে হয়েছে এর ক্ষুধাতৃক্ষণ কখনো মিটিবে না। আমারও একদিন এমন ক্ষুধা দেখা দেবে ভেবে আমি ভয় পেয়েছি, উল্লাসও বোধ করেছি। আমাদের বুড়ো চাকরটি তার বউকে বেশ মারতো, তার রোগা বউটি তার ভয়ে কাপতো, বউর সামনে সে কখনো হাসতো না; কিন্তু কদবানকে দেখলে সে গলে যেতো, তার ভাঙ্গা গল হাসিতে ত'রে উঠতো। কদবানের গোসল করার সময় সে ঘাটের পাশের মরিচ আর কচু খেত নিড়োতে শুরু করতো, কচুপাতার আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকতো কদবানের দিকে, এমনভাবে তাকাতো যেনো কিছু সে দেখতে পায় না। কদবানও তাকে থাটাতো, এবং কদবান তাকে থাটালে তার সুখের শেষ থাকতো না। কোনো কোনো দিন গোসলের পর কদবান তাকে ডাকতো সে দৌড়ে ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হতো। কদবান তাকে শাড়ি ধুয়ে দেয়ার আদেশ দিতো, আর সে আনন্দের সাথে কদবানের শাড়ি ধুতে শুরু করতো, মনে হতো কদবানের যদি গোটাদশেক শাড়ি থাকতো তাহলে সক্ষে পর্যন্ত সেগুলো ধুয়ে তার প্রাণমন ত'রে উঠতো। কদবানকে একটু ছোয়ার জন্যে তার হাত

কাপতো। কদবানের হাত থেকে হঁকো নেয়ার সময় তার হাত কাপতে কাপতে গিয়ে পড়তো কদবানের হাতের ওপর, তখন তার হাত আর নড়তো না; কদবান ঠেলা দিয়ে তার হাতে হঁকো ধরিয়ে দিতো। দক্ষিণের বাড়ির শালু ফুপুর দিকে কেউ চক্ষুল হয়ে তাকাও তো না? শালু ফুপুকে দেখলে আমি যাটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। চকচকে কালো ছিলো তার গায়ের রঙ, বুক দুটি সাংঘাতিকভাবে উঁচু, আর পেছনের দিকটা ত্যক্ষর; সে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঝড়ের বেগে যেতো, তার বুক ঢেউয়ের মতো কাপতো, তার পেছনটা নৌকোর মতো দুলতো; সে গিয়ে দাঁড়াতো কারো রান্নাঘরের দরোজায়, কারো বড়ো ঘরের দরোজায়, উঁচু গলায় কথা বলতো; আবার ঝড় জাগিয়ে অন্য কোনো বাড়িতে যেতো। আমি একদিন শুনতে পাই বাবা তাকে ডাকছেন 'কালো শশী' ব'লে। 'শশী' শব্দের অর্থ তখন আমি জেনে গেছি, কিন্তু 'কালো শশী' শোনার পর আমার ভাবনাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, কালো চাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার রক্তনালি ভ'রে উজ্জ্বল অঙ্ককার ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছোটো খালা বেড়াতে এলে আমাদের খুশির শেষ থাকতো না, এবং বাবাকেও খুব খুশি দেখাতো। ছোটো খালা আমাদের বাড়ি দু-এক মিনিটে পরপরই বেড়াতে আসতো, তাকে দেখলে আমরা সবাই খুশি হয়ে উঠতো। তার ঝলমলে রঙ আর গোলগাল মুখ দেখে আমাদের বুক ভ'রে উঠতো, কেলনা ছোটো খালা মানেই ছিলো আদর, আরো আদর, এবং আদর। আমি জন্ম লড়ো হয়ে গেছি, তবু খালা আমাকে ঘ'ষে ঘ'ষে গোসল করিয়ে দিতো, চুল ঝাঁঁচড়ে দিতো; ইঙ্গুলে খাওয়ার জন্যে আধুনি বাটাকা দিতো। চমৎকার চমৎকার রান্না তৈরি করতো ছোটো খালা, আনন্দে আমাদের বাড়িটা ঝলমল ক'রে উঠতো। সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন বাবা, যদিও তা দেখা যেতো না, কিন্তু আমি দেখতে পেতো। ছোটো খালার নাম খ'রে বাবা ডাকতেন, একটা সুর ঝ'রে পড়তো বাবার গলা ধোকে; ছোটো খালা পাখির মতো উড়ে গিয়ে উপস্থিত হতো, কখনো পান নিয়ে কখনো তামাক নিয়ে, কখনো শুধুই একটা ঝলমলে মুখ নিয়ে। মায়ের নাম খ'রে ডাকতে বাবাকে কখনো শনি নি। মায়ের সাথে বাবার আসলে কোনো কথাই হতো না। বাবার সাথে মায়ের কোনো ঝগড়া ছিলো না, মাকে বাবা কখনো গালাগালিও করতেন না, মাকে অনেকক্ষণ না দেখলে 'তোর মা কইরে' ব'লে আমার কাছ থেকে মায়ের ঘবর নিতেন; কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার মুখে কখনো আভা ফুটে উঠতে দেখি নি, আর মাকেও কখনো চক্ষুল হয়ে উঠতে দেখি নি বাবাকে দেখে বা না দেখে। বাবা ও মায়ের মধ্যে যতেটুকু কথা হতো, তার সবটাই কাজের কথা; আর কাজের কথা মানুষের বেশি থাকে না ব'লে তাদের বিশেষ কথাই হতো না। আমি আরো কয়েকটি বাবা আর মা দেখেছি; রফিকের, সিরাজের, রোকেয়ার মা ও বাবাকে দেখেছি, দেখে বুঝেছি মা ও বাবার কাজ মা ও বাবা হওয়া, এবং তাদের মধ্যে এর বেশি আর কোনো সাক্ষাৎ না থাকা। রফিকের বাবা মাঝে মাঝেই মারতো শুর মাকে, আর রফিকের মা ও বাবাকে 'খাইনকার পো' ব'লে গালি দিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাওয়ার জন্যে বাল্ল গোছাতো, কিন্তু তার যাওয়া হতো না। অথচ ওই রফিকের বাবাই আমাদের বাড়ি এসে মাকে 'তাবিছাব' ব'লে মধুরভাবে ডাকতো, কদবানকে

তামাক সেজে আনতে বলতো, কদবানের থেকে হঁকো নেয়ার সময় অনেকক্ষণ ধ'রে তার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতো। সিরাজের বাবা সকালের বাবার খেয়েই বাজারে চ'লে যেতো, দুপুরের পর বাড়ি ফিরতো আবার খেয়েই বাজারে চ'লে যেতো; আমরা যখনই যেতাম দেখতাম সে চায়ের দোকানে ব'সে আছে, চা খাচ্ছে গল্প করছে বিড়ি টানছে। সব সময়ই হাসি হাসি তার মুখ। কিন্তু সিরাজের মায়ের সাথে ধমক না দিয়ে সে কথা বলতো না।

তখন থেকেই আমার সন্দেহ হ'তে থাকে, সন্দেহটা গভীর হ'তে থাকে যে বাবাও মা হওয়ার মধ্যে কোনো একটা গভীর সংকট রয়েছে; এ-কাঠামোটি তেরে তেরে দুর্বল, বাইরে থেকে তাকালেই শুধু মনে হয় বাবা ও মায়ের মধ্যে একটা শক্ত ব্রিজ রয়েছে, কিন্তু তেরে চুকলে দেখা যায় অনেক আগেই ব্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কোনো ব্রিজ নেই, তাদের মধ্যে একটা প্রথা রয়েছে। বাবার সঙ্গে মায়েরও কোনো ব্রিজ ছিলো না, কিন্তু ছোটো খালার সাথে বাবার একটা ব্রিজ ছিলো, তা দুজনের মুখ দেখলেই বোঝা যেতো। মাও তা বুঝতো ব'লেই মনে হয়, তবে মায়ের তাতে কোনো আপত্তি ছিলো ব'লে মনে হয় না। আমি আমাদের দোতলার দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে থাকতাম, বাবা থাকতেন উত্তর দিকের একটি ঘরে, মা ও আমার ছোটো বোনটি একতলায় থাকতো। দোতলায় আরো একটি ঘর ছিলো, মা তাতে থাকতে পারতো, বাবা তাকে সেবানেই থাকতে বলতো, বা বাবার সাথে একই ঘরে থাকতে পারতো, কিন্তু মা বোনটিকে নিয়ে একটু ধূঁধ থাকতেই পছন্দ করতো। ব্রিজ তৈরিতে মায়ের কোনো আগ্রহ আমি দেখি নি। খালাকে মা-ই মানুষ করেছে, বিয়েও দিয়েছে, খালাকে মা নিজের মেয়ের মতোই সন্দর করতো; এবং আমি দেখেছি খালাকে মা বাবার ঘরে পাঠিয়ে দিতো যাবে আবেই— কখনো পান হাতে কখনো বাবার ঘরটি গুছিয়ে দেয়ার জন্যে, কখনো বাবার হাতপা টিপে দেয়ার জন্যে। অবশ্য আমাদের বাড়িটা ছিলো খালারই বাড়ি, ছোটোবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে আছে খালা, শুধু বিয়ে হওয়ার পর একটু দূরে স'রে গেছে; তাই খালা আমাদের বাড়ির কোথায় যাবে বা যাবে না, সেটা কারো ব'লে দিতে হতো না; আর সে কোন ঘরে কখন কী করবে, তাও কারো বলার অপেক্ষা করতো না। আর খালার সব কিছুই এতো ঝলমলে ছিলো যে তাকে দেখলে সবাই ঝলমল ক'রে উঠতো। আমি ঘরে ফিরে যখন দেখতাম আমার ঘরটি ঝকঝক করছে, বুঝতাম খালা আমার ঘর ঘুরে গেছে; এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই যে খালাকে দেখতে পাবো, তাও নিশ্চিত থাকতাম। খালা এসে হাজির হতো, হাতে কোনো খাবার।

হাসান তাই, মেজো কাকার ছেলে, পড়তো কলেজে, তাকে আমি তখন আমার স্বপ্নের নায়ক মনে করতাম : তার চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি আমাকে মুক্ষ করতো, হাঁটার সময় বাঁ হাতে যেভাবে লুঙ্গি ধ'রে হাঁটতো, তাতে মুক্ষ হতাম। আমি তার মতো চুল আঁচড়ানোর স্বপ্ন দেখতাম, আর ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যখন লুঙ্গি পরবো, তখন হাসান তাইয়ের মতো বাঁ হাতে লুঙ্গি ধ'রে হাঁটবো। হাসান তাই তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেছিলো, তখন আমি তৃতীয় বিভাগ কাকে বলে বুঝতে পারি নি; তেবেছিলাম আমি

যেমন ক্লাসে থার্ড হয়েছি, হাসান ভাইও তেমনি থার্ড হয়েছে। আমাদের বাড়িতে যে-
আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিলো, তাতে আমার সন্দেহ ছিলো না যে হাসান ভাই থার্ড
হয়েছে। হাসান ভাই মুনশিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে পাগল করার মতো গল্প শোনাতে
লাগলো আমাকে। একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললো, ‘এর নাম সুচিত্রা, সিনেমার
নায়িকা। জানিস চাইলে এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে পারি।’ মেয়েটির মুখ দেখে
আমার বুক কাঁপছিলো, অতো সুন্দর মুখ আমি আর দেবি নি, আমার একটু সীর্ষা হলো;
কিন্তু হাসান ভাইকে আমি অবিশ্বাস করতে পারলাম না, আমার বুবই বিশ্বাস হলো যে
হাসান ভাই চাইলেই ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে। হাসান ভাই বললো, ‘তবে
সিনেমার নায়িকা আমি বিয়ে করবো না, কলেজের কতো ভালো ভালো মেয়ে আমার
পেছনে ঘোরে।’ আমার রক্ত ঝলক দিয়ে উঠলো। তখন থেকে হাসান ভাই ঘর থেকে
বেরোলেই আমাকে ডাকে, আমি তার পেছনে আর পাশেপাশে হাঁটি; হাসান ভাই
আমাকে একের পর এক মেয়ের গল্প শোনাতে থাকে। হাসান ভাই আমার বুকের
ভেতরে মেয়ের পর মেয়ে চুকিয়ে দেয়, মেয়েদের মুখ ~~কেটে~~ চুল বাহু আমার ঢোকে
নতুনভাবে রূপ ধরতে শুরু করে। তখন হাসান ভাইয়ে ~~কেটে~~ মেয়েতে ভরে গেছে,
মেয়ে ছাড়া তার আর কোনো কিছুতে স্বাদ নেই, ~~কেনে~~ কথা বলে সুখ নেই; আমিও
তার কথা শোনার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করতে শুরু করেছি। বিকেল হলেই আমাকে
বলতো, ‘চল।’ কখনো সড়ক দিয়ে হাটতে ~~কেটে~~, কখনো নদীর পারে বসে হাসান
ভাই আমাকে তার বুক বোঝাই মেয়েদের গল্প শোনাতো।

‘হাসান ভাই, আপনি সব সময় যেয়ের গল্প করেন কেনো?’ আমি কখনো
জিজ্ঞেস করতাম।

‘তুই বুঝবি নারে যেখেরা কো জিনিশ’, হাসান ভাই বলতো, ‘এই বয়সে যেয়ে
ছাড়া আর কিছু তালো লাগেননা।’

হাসান ভাই সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলতো, ‘মেয়েদের কথা না ভাবলে ভাত
খেতে ইচ্ছে করে না, রাতে ঘুম হয় না।’

হাসান ভাইয়ের সিগারেটের গন্ধটা আমার তালো লাগতো। এখন আমি প্রচুর সিগারেট খাই, দামি বিদেশি সিগারেট ছাড়া খাই না, কিন্তু সিগারেটে আমি কোনো স্বাদ পাই না; যখন আমার সিগারেটে স্বাদ পেতে ইচ্ছে করে তখন আমি তাবতে থাকি হাসান ভাই নদীর পারে বসে সিজৰ্স সিগারেট খাচ্ছে, আমি পাশে বসে আছি, তার সিগারেটের ধোয়ার অঙ্গুত গন্ধে আমার বুক ত'রে যাচ্ছে। হাসান ভাই শেফালির গল্প করছে, নূরজাহানের গল্প করছে, বকুলের গল্প করছে, আমার রক্ত বিরবির করছে। শেফালির গল্পটা তার প্রিয় ছিলো— শেফালি অর্থাৎ রবি সাহার ঘেয়ে শেফালি, যে হাসান ভাইয়ের সাথে পাশ ক'রে বসে আছে, হাসান ভাই যাকে ইচ্ছে করলেই বিয়ে করতে পারে, যে হাসান ভাইয়ের সাথে পালিয়ে যেতে চায়। শেফালিকে আমি দেখেছি, তাকে দেখতে আমারও তালো লাগে, কার তালো লাগে না শেফালিকে দেখতে? স্যারদেরও তালো লাগে শেফালিকে দেখতে। হাসান ভাই শেফালির গল্প বলতে উক্ত করে। শেফালি একদিন সন্ধ্যায় হাসান ভাইকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে, হাসান

ভাই গিয়ে দেখে বাড়িতে আর কেউ নেই—পুজো দেখার জন্যে সবাই বাজারের মন্দিরে গেছে; শেফালি হাসান ভাইয়ের জন্যে উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শেফালি চুল আঁচড়ে বুকের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। হাসান ভাই যেতেই শেফালি তার হাত ধ'রে তাকে ঘরে নিয়ে যায়, হাসান ভাই বুঝতে পারে শেফালি কী চায় হাসান ভাইয়ের কাছে। হাসান ভাই শেফালিকে জড়িয়ে ধরে, শেফালির ব্লাউজ খুলে ফেলে, দুধে হাত দিয়ে দেখে মাথনের মতো নরম। আমার চোখ তখন সম্পূর্ণ অঙ্ক হয়ে গেছে, কান বধির হয়ে গেছে; হাসান ভাইয়ের কোনো কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না। অঙ্ককারের তেতর কী যেনো আমার চোখের সামনে ধৰ্বধব করছে, অঙ্ককারের মধ্যে এক অসহ্য কোমলতা আমাকে ঢেকে ফেলছে।

হাসান ভাইকে আমার হিংসে হয়; আমি একবার শেফালিদির পেছনে পেছনে ইঙ্গুলে গিয়েছিলাম, মাথা নিচু ক'রে হাঁটছিলাম, শেফালিদির ধৰ্বধবে পা মাটিতে পড়ছে আর উঠছে দেখে দেখে আমার চোখ দুধের রঙে ভ'রে গিয়েছিলো। শেফালিদির আর কিছু দেখার কথা তাবার আমার সাহস হয় নি, কিন্তু হাসান ভাই সব দেখেছে, সব ছুঁয়েছে, আমার হিংসে হ'তে থাকে। কিন্তু তখনও যেনে আত্ম রক্ষের মধ্যে ঢেকে নি; কোনো যেয়ের কথা তাবার থেকে তখনও আমি বেশ কিছু পাই যেয়ের কথা তাবতে, যে-পার্থিতি গতকাল আমি গাছের ডালে এসে বসেছিলো, দুটি বড়ো হলদে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গিয়েছিলো, তার ডানার হলদে রঙের কথা তাবতে। আমার কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু হাসান ভাইয়ের কষ্ট কষ্ট, আমি বুঝতে পারি; এবং আমার তয় লাগতে থাকে একদিন আমারও এমন কষ্ট হবে। আমি দেখতে পাই আমাদের গ্রামের সবাই খুব কষ্টে আছে; বাবা কষ্টে আছেন, হাসান ভাই কষ্টে আছে, সিরাজের রফিকের বাবারা কষ্টে আছে, আমাদের চাকরটি আর বুড়ো চাকরটি কষ্টে আছে। হাসান ভাইয়ের সাথে আমার আবেরোনোর সাহস হয় না; বেরোলেই আমি হয়তো আরো ভয়ঙ্কর কথা শুনতে পাবো, তাতে আমারও কষ্ট হবে। শেফালির কথা শোনার পর থেকে আমিও যেনো কষ্ট পেতে শুরু করেছি, সে-রাতে ঘুমোতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

আমি বড়ো হ'তে থাকি, একের পর এক ঘটনা দেখতে পাই; ওই ঘটনাগুলো আমাকে প্রস্তুত করতে থাকে। আমি বুঝতে পারি জীবন স্তরে স্তরে সাজানো, আর ওই স্তরগুলোর মধ্যে বাইরের স্তরগুলো হচ্ছে প্রথাগত সত্য, ভেতরের স্তরগুলো আরো সত্য, যা আমরা স্বীকার করতে চাই না। আমাদের বাড়ির উত্তরে গভীর জঙ্গল, অনেক বড়ো বড়ো গাছ—আম, শিমুল, নিম, তেঁতুল, গাব, নারকেল, আর লম্বা ঘাস, তার পর ছিলো একটি মাঠ। ওই মাঠে অনেকেই গরু চরাতো, আমিয়াও সেখানে গরু চরাতো। যেয়েটা একেবারেই অন্য রকম ছিলো, ওর বাবার সাথে আমাদের বাড়ি কখনো দুধ কখনো চিংড়ি মাছ বেচতে আসতো। ওর বাবা ছিলো একেবারে বুড়ো, খালে চিংড়ি ধ'রে বেচতো, দুধও বেচতো; গরু চরানোর দায়িত্ব ছিলো আমিয়ার। কাউকে দেখলেই সে ফিকফিক ক'রে হাসতো, ঠিকমতো কথাও বলতে পারতো না। একটা ছেঁড়া কাপড় পরতো সে, তার বুক পিঠ সবই দেখা যেতো। আমার সমান বয়সই তার, আমার

বয়সের যেয়েদের বুক উঁচু হয়েছে সারা আম ত'রে, তারা যত্নের সাথে বুক ঢেকে রাখছে, কিন্তু আমিয়ার কোনো বুক ছিলো না; তাই ঢাকার কথাও সে ভাবে নি। তার মুখটা বাঁকা। তার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হতো না। এক দুপুরে আমি ওই মাঠে গেছি গিয়ে দেখি আমাদের প্রামের কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলে, যাদের আমি দাদা বলি, আমিয়াকে কোলে ক'রে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমিয়া চিংকার করছে না, গালি দিচ্ছে মাঝেমাঝে। তারা আমিয়াকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে চুকে গেলো। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, কোনো চিংকার শুনতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর ওই ছেলেরা আর আমিয়া জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। আমি ভেবেছিলাম সে কাঁদতে থাকবে, কিন্তু দেখি সে খলখল ক'রে হাসছে। আমাকে দেখে বললো, 'তুই আইলি না ক্যান, তুর ইচ্ছা অয না?' সে খলখল ক'রে হাসতে হাসতে তার গুরুটাকে নতুন জায়গায় গোছের দিতে দিতে বলে, 'কাইল তুইও আহিছ।'

মামুন ছিলো ছোটো খালার ছেলে, দেখতে আমারই মতো, আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোটো। মামুনকে আমি বুব তালোবাসতাম দেখতে আমার মতোই ছিলো ব'লে; ও আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলে আমার পেছনেই ক্ষেপ থাকতো সব সময়। মামুনের একটা বড়ো গৌরব ছিলো সে দেখতে আমার মতো। আমি এতোবার উনেছি যে মামুন দেখতে আমার মতো তাতে আমার ধীরণ হয়ে গিয়েছিলো যে দেখতে আমার মতো হওয়া গৌরবের বিষয়। বাবা মামুনকে আমার মতোই আদর করতেন। মামুন এলে আমরা দুজন এক বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ি, এক জঙ্গল থেকে আরেক মাঠে ছুটে বেড়াতাম। পথে পথে শুনতাম, ওরা কেতে একই রকম; যেনো এক মায়ের পেটের ভাই।

খালা বলতো, 'মামুন তাত্ত্ব আপন ভাই, তুই ওকে দেখে রাখবি।'

আমি বলতাম, 'আচ্ছা।'

এক বিকেলে মামুন আর আমি নদীর পারের কাশবনের ভেতর দৌড়ে দৌড়ি করছিলাম, তখন একটি বুড়ী আমাদের ডাকে। সে একটা বোৰা তার কাঁধ থেকে নামিয়ে বিশ্রাম করছিলো, এখন আর বোৰা কাঁধে তুলতে পারছে না, আমাদের সে ডাকে তার বোৰা কাঁধে তুলে দিতে। আমি আর মামুন তার বোৰা তুলে দেয়ার পর সে দেয়া করতে করতে আমাদের ভালোভাবে দেখে। বুড়ী 'বাইচ্ছা থাক' ব'লে আমাদের দোয়া করে, আমার ও মামুনের মুখে হাত বুলোয়, এবং জানতে চায় আমরা একই মায়ের পেটের ভাই কিনা। আমি তাকে বলি যে আমরা একই মায়ের পেটের ভাই নই, খালাতো ভাই। বুড়ী আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে পথে চলতে শুরু করে। তার বিড়বিড় ক'রে নিজের সাথে কথা বলার অভ্যাস ছিলো, যেমন থাকে প্রামের সব বুড়ীরই। 'আল্লার দুনিয়ায় কত দেহম', বুড়ী ঝুকে ঝুকে হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকে, 'খালাতো ভাইরা দ্যাকতে একরকম, তয় মাগী দুইজা অইলেও বাপ একটাই। কত দ্যাকলাম।' তনে আমি চমকে উঠি, মামুন কিছু বুঝতে পারে নি বলে চমকায় না। নদীর পারে কাশবনে আমি শুচ্ছশুচ্ছ অঙ্ককার দুলতে দেখতে থাকি, মামুনকে আমার অচেনা মনে হ'তে থাকে। মনে হয় আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না, নদীতে বাঁপিয়ে

পড়তে ইচ্ছে হয়। আমি ব'সে পড়ি, মাঘুন অবাক হয়ে আমার পাশে বসে। জোনাকিরা দেখা দিতে থাকে, সেগুলোকেও আমার কয়লার টুকরো মনে হয়।

রাতে ঘুমোতে আমার কষ্ট হয়, আমি ঘুমোতে পারি না। মাঘুন ঘুমিয়ে আছে, ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বড়ো হ'লে, বুরতে পারলেই কষ্ট বাড়ে। চারপাশে অনেক রাত, এক গাছ থেকে আরেক গাছে বাদুড় উড়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছি, আমি ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঢ়াই, পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকি, কোনো নতুন বউকে গোসল করতে দেখি না, বোৰা কাঁধে একটি বুংড়ীকে হেটে যেতে দেখি। তখন দেখতে পাই বাবার ঘর থেকে কে যেনো বেরোচ্ছে, অঙ্ককারে তাকে ছায়া ব'লে মনে হয়, কিন্তু তাকে আমি চিনতে পারি। তার শাড়ির আঁচল জড়ানোর ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি আমি চিনতে পারি। মনে হয় সুবে ভেঙে প'ড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। আমি চিৎকার ক'রে উঠতে পারতাম, কিন্তু তখন আমার কষ্টে কোনো শব্দ ছিলো না, শরীরে কোনো রক্ত ছিলো না। বাবার মুখ আমার মনে পড়ে, তখন আমার অন্য রকম তাবনা হয়। আগে আমার মনে হতো বাবার কোনা সাঁকো নেই, এখন মনে হ'তে থাকে বাবার একটি সাঁকো আছে, একথা ভেবে আমার ভুলো লাগতে থাকে। তখন আমার ঘুম পায়, আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আমার কোনো কষ্ট হয় না। তোরে উঠে আমি বাবাকে দেখি, ইচ্ছে ক'রেই খালাকে দেখি; দুজনকেই আমার খুব সুখী মনে হয়, যেমন সুখী মনে হয় সাঁকোর দু-পারকে। বাবাকে আমার খারাপ লাগে না, খালাকে আমার খারাপ লাগে না। তবে কয়েক দিন ধৰে ওই ঘটনাটি আমি ভাবি, আমার মনে হ'তে থাকে মানুষ এমনই; মনে হয় মনুষজ্ঞাইরে এক রকম, তার বাইরেরটা সত্য নয়; মানুষ ভেতরে অন্য রকম, তার চেতনাটাই সত্য; কিন্তু ভেতরেরটা কেউ দেখতে দেয় না। বাবার ভেতরেরটা কেউ জানে না, বাইরেরটা জানে না; তার বাইরেরটা দেবে কেউ তার সামনে কথা বলতে পারে না। ভেতরেরটা জেনে ফেললে কি সবাই বাবাকে ঘেন্না করবে, বিপদে ফেলবে? না, বাবার ভেতরেরটা আমি কাউকে জানতে দেবো না; বাবাও কখনো জানবেন না যে আমি তাঁর ভেতরেরটা জানি।

আমার দাদা খুন হয়েছিলেন, ছোটোবেলা থেকেই আমি তাঁর কথা শনে এসেছি। তিনি খুন হয়েছিলেন ব'লে তাঁকে আমার মহাপুরুষ মনে হতো; আমি মনে করতাম কেউ খুব বড়ো হয়ে গেলে ছোটোরা তাঁর বিকুঠকে চ'লে যায়, তাঁকে সহ্য করতে পারে না, তখন ছোটোরা তাঁকে খুন করে। খুন ক'রে ছোটোরা নিজেদের বড়ো ক'রে তোলে নিজেদের কাছে। দাদার যে-বর্ণনা বাবাবার আমি শনেছি তাতে তাঁকে মহাপুরুষ না ভাবার কোনো উপায়ই আমার ছিলো না। তিনি দেখতে বড়ো ছিলেন, চারপাঁচজন তাঁর সাথে জোরে পারতো না; তিনি অল্প বয়সেই ধানের ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা করেছিলেন, ওই টাকা দিয়ে বিলে কিনেছিলেন কানি কানি জমি আর দিঘি। তাঁর খুনের পর পঞ্চাশটা সিন্দুক ভেঙে পুলিশের লোকেরা মণের পর মণ রংপোর টাকা বের করেছিলো, ঘোড়ায় ক'রে সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলো। এক রাতে তিনি খুন হয়ে যান। সে-সম্বন্ধে তিনি খাওয়াদাওয়া ক'রে বাইরে যান, রাতে জঙ্গলের পাশের পথে খুনীরা তাঁকে খুন ক'রে ফেলে রাবে। তাঁর গলা থেকে শরীর আলাদা ক'রে দেয়। তবে তাঁকে

খুন করার জন্যে কেউ শান্তি পায় নি, কেউ খরা পড়ে নি। একদিন আমি একটা সিন্দুক খুলে কতকগুলো পুরোনো কাগজ পাই, মোটা মোটা মসৃণ ঘিয়ে রঙের কাগজ, তার তেতরে আরো কতকগুলো কাগজ। কাগজগুলো খুলে দেখি দাদার খুনের মামলার কাগজপত্র গুলো। আমি পড়তে তরু করি, একজায়গায় এসে আমি চৰ্বল হয়ে উঠি।

উকিল দাদীকে জিজ্ঞেস করছে, ‘আপনার স্বামী সেই সন্ধ্যায় কি খেয়েছিলেন?’

দাদী বলছেন, ‘মাছ, ভাত, দুধ, মধু।’

উকিল বলছে, ‘আপনার স্বামীর পেটে পিঠা পাওয়া গেছে, আপনি কি তাঁকে পিঠা খাইয়েছিলেন?’

দাদী বলছেন, ‘না।’

উকিল বলছে, ‘ধর্মাবতার, এই লোকের চরিত্র ভালো ছিলো না। এই লোক সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামেরই কোনায় তার উপপত্তির বাড়ি যায়। সইজুন্দিন জোলার বউ তার উপপত্তি ছিলো একথা গ্রামের সবাই জানে।

দাদার দুটি বউ ছিলো, এক দাদীকে আমিও দেখেছি—শেশ সুন্দর; তবু তিনি সইজুন্দিন জোলার বউয়ের কাছে যেতেন এটা আমাকে দেখান করে। সইজুন্দিন জোলার বউ বেঁচে আছে, তাকে আমি দেখেছি; কালো ঝুঁকুচে, ঘেনা হয়। দাদা তার কাছে যেতেন, কেনো যেতেন? সইজুন্দিন জোলার সুন্দর কী ছিলো যে দাদা দুটি বউকে রেখে তার কাছে যেতেন? দাদারও কি কোনো সাকো ছিলো না, তিনি তো দুটি সাকো বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একটিও খেঁচুতে পারেন নি? কোনো পুরুষই কি ঠিকমতো সাকো বাঁধতে পারে না? নাকি যাধা সাকো তাকে আর আকর্ষণ করে না? তখন দিকে ছুটতে থাকেন মামার সাথে খালার একটা সাকো আছে, মায়ের সাথে বাবার কোনো সাকো নেই: যায়ে জন্যে আমার মায়া হয়, মায়ের জন্যে আমার মায়া হয়। নবম শ্রেণীতে ঘঠার পুরুষকে আমি প্রায় সবই বুঝি, কিন্তু আমি কাউকে বুঝতে দিই নি যে আমি বুঝি; তাতে তারা বিব্রত বোধ করতো, তাদের গোপনে গ'ড়ে তোলা সাকোগুলো নড়োবড়ো হয়ে উঠতো। তখন থেকেই আমার এমন একটি বোধ জন্মে যে মানুষের কোনো স্বল্প দেবেই উন্নেজিত হওয়ার কোনো অর্থ হয় না, মানুষ এমন প্রাণী যা কোনো ছক অনুসারে চলতে পারে না। কিন্তু মানুষ ছকের কথা বলতে, আর ছক তৈরি করতে খুব পছন্দ করে।

সে-সন্ধ্যায় হাসান ভাইয়ের ঘরে না গেলে ভালো হতো, কিন্তু আমি যে গিয়েছিলাম এতে আমার কোনো অপরাধবোধ হয় নি; বরং মনে হয়েছে না গেলে আমি জীবনের একটি সোনালি খণ্ড হারাতাম। এমন সুন্দর একটি দৃশ্য কখনো দেখতে পেতাম না। সে-দিন ঈদের চাঁদ উঠেছিলো, আমার রক্তে ঝলক লেগেছিলো; চাঁদ ওঠার সন্ধ্যায় আমি বন্ধুদের সাথে বাড়ি বাড়ি বেড়ানোর অধিকার পেতাম। বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে সন্ধ্যার বেশ পরে ঘরে ফিরে দেখি বাবা নেই, যা তায়ে আছে, ঈদের সব আয়োজন করা হয়ে গেছে, এবং আমার কিছু করার নেই। তখন আমি হাসান ভাইদের দোতলায় যাই, সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠি, হাসান ভাইয়ের ঘরের দরোজা ঠেলে ঢুকি। আমি ঢুকতেই হাসান ভাই আর কদবান মেজে থেকে লাফিয়ে ওঠে। দুজন উলঙ্গ

মানুষকে লাফিয়ে উঠতে দেবে আমার খুব ভালো লেগেছিলো। হাসান ভাই তার লুঙ্গিটা ধ'রে খাটের ওপর উঠে দুটি বালিশ জড়িয়ে ধ'রে শয়ে পড়ে। আমি দাঢ়িয়ে থাকি। কদবান তার শাড়ি আর ব্লাউজ পরার চেষ্টা করে। তার নতুন লাল শাড়ি আর ব্লাউজ থেকে একটা অন্তর্ভুক্ত সুগন্ধি ভেসে আসতে থাকে আমার দিকে। কদবান শাড়ি পরতে গিয়ে বারবার ভুল করে, তার শাড়ি ব'সে প'ড়ে যেতে থাকে। তার বুকের সবুজ পেপে দুটি দেখে আমার চোখ মুক্ষ হয়, এই প্রথম আমি চোখের সামনে সম্পূর্ণ মুক্ষ বুকের পেপে দেখতে পাই। কদবান কিছুতেই ব্লাউজ প'রে উঠতে পারে না, পরার চেষ্টা করতেই তার সবুজ পেপের বাগান ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে ওঠে। কদবানের পেপের দিকে লক্ষ বছর ধ'রে আমার তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে হয়; কিন্তু আমি বেরিয়ে আসি।

আমি বিছানায় শয়ে শয়ে হাসান ভাইয়ের সুচিত্রা, শেফালি, নুরজাহান, বকুলের কথা ভাবতে থাকি। তারা কি সত্য হাসান ভাইয়ের জীবনে? শেফালিদির সাথে এক সন্ধ্যায় তার যা ঘটেছিলো, তা কি সত্য? তা কি সত্য নয়? শেফালিদিদের বাড়ি কি হাসান ভাই কখনো গেছে? আমার ঘন বলতে থাকে, হাসান ভাই কখনো ওই বাড়িতে থায় নি, শেফালি হাসান ভাইয়ের জন্যে কখনো কোনো সময় দাঢ়িয়ে থাকে নি, হাসান ভাই কখনো শেফালির শাড়ির ভেতর হাত দেয়নি। সত্য কি দেয় নি? আমি জানি না, আমি জানি না। এমন সময় হাসান ভাই আমার ঘরে ঢোকে। হাসান ভাই আমার দু-হাত তার দু-মুঠোতে ধ'রে মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে, কোনো কথা বলতে পারে না। আমি তার মুখের দিকে তাকুন্তে হাসান ভাইয়ের মুখ দেখে আমার কষ্ট হয়।

'কোনোদিন বলবো না', আমি বলি।

হাসান ভাই আমার হাত ধ'রে মাথা নিচু ক'রে ব'সে থাকে। তার মাথা নিচু থেকে আরো নিচুতে নামতে থাক; আমার ঘনে হয় নামতে হাসান ভাইয়ের মাথা আমার পায়ের কাছে নেমে যাবে। আমার খুব কষ্ট হ'তে থাকে, হাসান ভাইয়ের মাথা আমি এতো নিচুতে দেখতে চাই না।

'কোনোদিন বলবো না', আমি আবার বলি।

'আমি কদবানকে বিয়ে করবো', হাসান ভাই বলে। তার চোখের জলের ফোটা আমার হাতে লাগে।

'কেউ রাজি হবে না', আমি বলি।

একমাসও যায় নি তারপর, কদবান একদিন রাত্নাঘরের মেজের ওপর প'ড়ে যায়, বয়ি করতে থাকে। দু-দিন আমাদের বাড়িটা বেশ থমথম করে। তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি কদবান নেই। কিন্তু আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করি নি। কেউ কারো কাছে জানতে চায় নি কদবান কোথায়? কদবানের এক ভাই আমাদের বাড়িতে মাঝেমাঝে কাজ করতো, সেও কখনো কদবানের নাম উচ্চারণ করে নি। আমি কখনো কদবানের নাম বলি নি, বাবা কখনো কদবানের নাম বলেন নি। আমাদের বাড়িতে যারা আসতো, তারা কখনো কদবানের নাম বলে নি। যেনো কদবান পৃথিবীতে কখনো ছিলো না। মাঝেমাঝে আমার ঘনে প্রশ্ন জাগতো, কদবান কি পৃথিবীতে এখনো আছে? কদবানের

জন্যে শোকে আমার বুক ত'রে গিয়েছিলো, আমি তার বাকবাকে কালো রঙের সৌন্দর্য দেখে দেখে বেড়ে উঠেছিলাম, তার সবুজ পেপে আমার চোখে কপের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো। কদবানকে মনে হ'লৈ আজো আমার চোখের সামনে সবুজ পেপেতরা পেপে গাছ দূলে ওঠে।

যাকে দেখে প্রথম আমি সৌন্দর্যকে দেখি তার নাম তিনু আপা। তাঁর হাতপাখু ছিলো ঘন দুধ দিয়ে তৈরি, আমার তাই মনে হতো; এবং আমার মনে হতো তাঁর শরীরে কোনো হাড় ছিলো না। চাঁদের থেকেও ধৰ্মবে আর গোল ছিলো তাঁর মুখ। একটি খালের উত্তর পাশে ছিলো তাদের বাড়ি, শুপুরি আর নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা। তিনু আপা বিকেলে সুন্দর শাড়ি প'রে সামনের দিকে ফুলিয়ে চুল আঁচড়িয়ে মুখতরা মিষ্টি হাসি স্থির ক'রে রেখে তাদের ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে খাল ও খাল পেরিয়ে মাঠের দিকে তাবিয়ে থাকতেন। আমি কোনো কোনো বিকেলে তাদের বাড়ির তেতুরের পথ দিয়ে যেতাম, দেখতাম তিনু আপা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে মিষ্টি ক'রে হাসতেন তিনু আপা। আমি যাথা নিচু ক'রে মাটির দিকে তাকাতাম, দেখতাম তাঁর পায়ের পাতার আলোতে মাটি দুধের মতো হয়ে গেছে। তিনু আপা কখনো হাত উঁচু ক'রে ডালিম গাছের ডাল ধ'রে কথা বলতেন আমার সাথে, আমি দেখতাম তার লাল ব্লাউজ উপচে ঘন দুধ গ'লে পড়ছে। তিনু আপা একবার আমার হাত দেখতে চেয়েছিলেন, আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলুম। তার আঙুলগুলো আমার আঙুল আর মুঠোতে ঘন দুধের মতো জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আমি মনে মনে চাইছিলাম তিনু আপা যেনো আমার হাত কখনো না ছাড়েন। তিনু আপার সাথে আমি একাদোক্ষা বেলতাম কখনো কখনো, আমি মনপ্রাপ্তি দিয়ে বেলতাম, কিন্তু আমার খেলার থেকে তিনু আপার খেলা দেখতেই বেশি ভালো আপত্তি। তিনু আপা যেভাব চাড়া ছুড়তেন, তাঁর ডান হাত যেভাবে নিচু থেকে ওপরের দিকে উঠতো, চাড়া কোনো ঘরে পড়ার পর তাঁর ঠেট যেভাবে নড়তো, তাতে আমার নিশ্চাস থেমে যেতে চাইতো। সবচেয়ে সুন্দর ছিলো ঘর থেকে ঘরে তাঁর লাফিয়ে চলা। তিনি যখন ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে যেতেন, একটুও শব্দ হতো না; তার পা একবাশ শিউলিফুলের মতো মাটির ওপর ঝ'রে পড়তো, তিনু আপা মাটির ওপর শিউলি ঝরিয়ে ঝরিয়ে ঘর থেকে লাফিয়ে যেতেন। লাফানোর সময় তার শরীরটি ঢেউয়ের মতো দূলতো, আমি চোখের সামনে দুধসাগরের ক্ষীরসাগরের ঢেউ দেখতে পেতাম; বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ার পরও আমার চোখে দুধসাগর ক্ষীরসাগর দূলতে থাকতো। দুধের ঢেউয়ের মতো আমার চোখে ঘুম নামতো।

তিনু আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে— ব্বরটি আমি এক বিকেলে জানতে পাই, আমার বুক হঠাৎ কেঁপে ওঠে, আমি বুব কষ্ট বোধ করি। আমি ভেবেছিলাম তাঁকে ডালিম গাছের নিচে দেখতে পাবো, কিন্তু পাই না, তার বদলে ব্বরটি পাই; আমার বিকেলটি ঘোলা হয়ে উঠতে থাকে। মাঠে না গিয়ে আমি নদীর পারের দিকে চ'লে যাই, গাছপালা নদীর ঢেউয়ে আমি কোনো সৌন্দর্য দেখতে পাই না। আমি তিনু আপার ঠেট দেখতে পাই, মনে হ'তে থাকে নদীর আকাশে তিনু আপার ঠেট ঝিলিক দিয়ে

উঠছে; আমি তাঁর বাহু দেখতে পাই, নদীর টেক্কেয়ে তাঁর বাহু দূলে উঠতে দেবি; তার ধৰধৰে দুধের মতো দেহটি আমার সামনে ঘর থেকে ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে থাকে। আমি দেখতে পাই তিনি লাফিয়ে চলছেন আর তাঁর পেছনের দিকটি নদীর টেক্কেয়ের ওপর সোনাৰ কলসিৰ মতো দূলছে। সে-বাতে আমি একটি স্বপ্ন দেবি; দেখতে পাই তিনু আপাকে নিয়ে খুব দূৱে কোথাও চলে গেছি; তিনু আপা বলছেন, তুমি আমাকে নিয়ে খুব দূৱে কোথাও চলো, আমি তাঁকে নিয়ে দূৱে থেকে দূৱে চলে যাচ্ছি, দূৱে থেকে দূৱে চলে যাচ্ছি। তিনু আপা আৱ হাঁটতে পাৱছে না, আমার হাত ধৰে হাঁটছেন; শেষে আমার বুকেৰ ওপৰ লুটিয়ে পড়লেন।

সেই প্ৰথম আমি বিষণ্ণতা বোধ কৰি, এৱ আগে এমন কিছু আমি অনুভব কৰি নি। আগে আমি আনন্দ আৱ সুখ বোধ কৰেছি, শৱীৱে আৱ মনে কষ্টও পেয়েছি, কিন্তু কোনো কিছু ভালো না লাগাৰ অনুভূতি আমার হয়ে নি। তখন আমি সব কিছু অস্পষ্ট দেখতে থাকি, আমার চোখেৰ ওপৰ একটি কুয়াশায় পৰ্দা লেগে থাকে সব সময়, মনে হ'তে থাকে আমি কাউকে চিনি না, আমার কোনো বন্ধু নেই, আৰুৰীয় নেই। বড়ো একলা লাগতে থাকে। আমি নদীৰ পাৱে একা একা হাঁটতে থাকি, বই পড়তে পাৱি না, ঘুমোতে আমার কষ্ট হয়। আমার শৱীৱ ব্যথা কৰতে হৈ কৰে; তখন আমি আৱ তিনু আপাকে দেখতে পাই না, একটা অচেনা লোককে দেখতে পাই, দেবি লোকটি তিনু আপার পাশে তয়ে আছে। আমার খুব কষ্ট হ'তে থাকে, আমি ঘুমোতে চাই, ঘুমোতে পাৱি না; মনে হ'তে থাকে জীবনেও আৰম্ভ কৰনো ঘূৰ আসবে না। কিন্তু আমাকে ঘুমোতে হবে, নইলে আমি বাঁচবো না। আমি আমার শৱীৱেৰ ওপৰ হাত বুলোতে থাকি; মাথা, মুখ, বাহু, উকুতে হাত বুলোতে থাকি; এক সময় আমার হাত দু-পায়েৰ মাঝখানেৰ অঙ্গটিৰ ওপৰ গিয়ে পড়ে। আমার হাত ওটিৰ কঠিনতা বোধ কৰতে শুল্ক কৰে, এৱ আগে আমি ওটি ছুতে লজ্জা পেয়েছি, কিন্তু আজ ও কঠিনতা থেকে আমি স'ৱে আসতে পাৱি না, আমি ওকে বাৱবাৰ ছুতে থাকি, তিনু আপা একবাৰ যেমন ক'ৱে আমার আঙুল নেড়েছিলেন, আমি তেমনভাৱে নাড়তে থাকি, আমার ঘূৰ পেতে থাকে, নদীৰ টেক্কেয়ে আমি ভাসতে থাকি। আমার আকাশে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠতে থাকে, আমি ক্ষীৰসাগৰে সাতাৰ কাটতে থাকি, এক সময় আকাশপাতালসূর্যঠাদ ভেঙেচুৱে আমি কাঁপতে থাকি, আমার ভেতৰ থেকে সূর্যঠাদতাৱা গলগল ক'ৱে বেৰোতে থাকে। আমি কোমল আণন্দেৰ শিখাৰ ওপৰ ঘুমিয়ে পড়ি।

সেবাৰ আমি একলা বেড়াতে যাই বাজবাড়ি, মেজো বোনেৰ বাসায়। এৱ আগে দুৰ্বাৰ আমি ওই শহৰে গেছি, তাই একলা আমি যেতে পাৱবো এতে কেউ সন্দেহ কৰে না; আমারও ভালো লাগে যে আমি একলা যাচ্ছি। বাঘড়া থেকে আমি গাজি ইস্টিমাৱে উঠি, বাবা আমাকে ইস্টিমাৱে উঠিয়ে দিয়ে যান। আমি ওপৱেৰ ভেকে উঠে কোনো জায়গা পাই না, দিকে দিকে সবাই বিছানা পেতে তয়ে আছে, ব'সে আছে; কোথাও একটু জায়গা নেই। আমি সিডিৰ পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। একটি লোক আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। লোকটি দেখতে বেশ ভালো, মুখে অল্প দাঢ়ি আছে, মাথায় টুপি ও রয়েছে। বয়সে বাবাৰ মতোই হবে। লোকটিকে আমার ভালোই লাগে। আমি কেনো

দাঢ়িয়ে আছি সে জানতে চায়। সে আমাকে বলে তার বিছানার পাশে জায়গা আছে, আমি সেখানে গিয়ে বিছানা পেতে পারি। নানা দিক ঘুরে, অনেক মানুষ পেরিয়ে, সে ডেকের শেষ দিকে নিয়ে যায় আমাকে; সেখানে তার বেশ বড়ো বিছানাটি পাতা রয়েছে। বিছানার পাশে জায়গা রয়েছে। সে তার বিছানাটি কিছুটা ওচিয়ে আরো জায়গা ক'রে দেয়; আমি সেখানে আমার বিছানা পাতি। সে চা আনায়, আমি তাকে বলি যে আমি চা খাই না; কিন্তু কুকিজটি খেতে সে আমাকে বাধ্য করে। সে জাহাজের রেস্টুরেন্টের লোকটিকে বারবার ডেকে কুকিজ আনতে বলে, কুকিজটি সে আমার হাতে ওঁজে দেয়, সেটি না বেলে খুব খারাপ দেখায় বলে আমি সেটি খাই। কুকিজ খেতে অবশ্য আমার সব সময়ই ভালো লাগে। লোকটিকেও আমার খারাপ লাগে না। লোকটি বলে আমার সমান তারও একটি ছেলে রয়েছে, সেও টেনেই পড়ে। তখন বেশ রাত, ইস্টিমারের শব্দ আর ঘোনাটে আলোতে সব কিছু আমার অস্তুত লাগছে। লোকটি ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়, কিন্তু আমার শতে ইচ্ছে করছে না। দিকে দিকে লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের ঘুমোনোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় তা~~র~~^ম মুরাজীবনে ঘুমোয় নি, আজই প্রথম ইস্টিমারে উঠে ঘুমোনোর সূख পেয়েছে। আমিও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। একটু শীত লাগে, ঘুমের ঘোরে আমার মনে হয় কে যেজন আমার গায়ে চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে, তাতে আমার ঘুমিয়ে পড়তে আরো ভালো লাগে। ঘুমের ঘোরে আমি টের পাই একটি হাত আমার হাফপ্যান্টের সামনের দিকের বোতাম খুলছে, আমি হাত দিয়ে হাতটি সরিয়ে দিই; কিন্তু হাতটি আবার স্টুন্নের দিকে দিয়ে চুকে আমার অঙ্গটিকে নাড়তে থাকে। আমি হঠাৎ উঠে বসে আমার হাফপ্যান্টের সামনের দিকে হাত দিই, লোকটি দ্রুত হাত সরিয়ে নেয়। দেখি আমার হাফপ্যান্টের বোতামগুলো খোলা। আমি ঘুম থেকে উঠে বসে থাকি, বোকাট অন্য দিকে মুখ দিয়ে ঘুমোতে থাকে। তোর হ'লে সে অজু ক'রে নামাজ পড়ে আমার সাথে কোনো কথা বলে না।

আমার বোনের বাসা ছিলো রেলকলোনির পাশে। আমি তখন সাইকেল চালাতে শিখেছি। দুলাভাইয়ের একটি সাইকেল ছিলো, সেটি নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তাম; খুব ভালো লাগতো আমার রেলকলোনির পাশের ওঁড়োওঁড়ো কয়লাবিছানো পথে সাইকেল চালাতে। খুব মসৃণ ছিলো ওই পথ, একটুও ঝাকুনি লাগতো না। একদিন সাইকেলের চেইন পড়ে যায়, একটি লোক এসে আমাকে চেইন লাগাতে সাহায্য করে। তার সাহায্য আমি চাই নি, সে নিজেই আসে, চেইন লাগিয়ে দেয়, এবং আমাকে পাশের দোকানে নিয়ে চা খাওয়াতে চায়। লোকটির কথা শনে আমি বুঝতে পারি সে বিহারি, আমার ভয় লাগে, আর চা আমি খাইওনা, তাই তার সাথে আমি যাইনি। লোকটি বলে সে রেলে কাজ করে, আমি চাইলে সে আমাকে ট্রানিতে ক'রে বেরিয়ে আনতে পারে। ট্রানিতে চড়ার স্ব ছিলো আমার;- সাইকেল চালাতে চালাতে আমি দেখেছি রেলের লোকেরা ট্রানিতে ক'রে সাই সাই করে ইস্টিশনের দিকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। একদিন বিকেলে সে আমাকে ট্রানিতে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়; তার সাথে আমি কয়েকবার ইস্টিশনের দিকে যাই, আবার ফিরে আসি। তাকে আমার বেশ ভালো লাগে। পরের দিন দুপুরে দিন দুপুরে সে আমাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করে। ওই

কলোনির সব বাসাই ছিলো মুলিবাশের, আমাকে সে তার বাসাটি দেখিয়ে দেয়। পরের দিন দুপুরে আমি তার বাসায় যাই। আমি চুক্তেই সে ঠেলে দরোজা বন্ধ ক'রে দেয়, আমি অবাক হই; এবং সে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পাই, সে আমাকে নিয়ে মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে; আমি টের পাই সে তার একটি বিশাল শক্ত অঙ্গ আমার গায়ে লাগাতে চাচ্ছে। আমি তার অঙ্গটিকে ডান মুঠোতে শক্ত ক'রে ধ'রে ফেলি, নখ বিধিয়ে দিই; বাঁ হাত দিয়ে তার অও দুটিকে চেপে ধরি। গো গো ক'রে সে মেজের ওপর উল্টে পড়ে। আমি দরোজা বুলে বাইরে বেরোই, আন্তে আন্তে বাসার দিকে হাঁটতে থাকি।

আমার পনেরো বছর হ'তেই অনেক কিছুই ভেঙে পড়ে আমার চোখের সামনে, আমার মনের ভেতরে। আমি, সব সময়ই, চারপাশে অনেক ভালো ভালো কথা শুনতে পাই, শুনে আমার কেমন হাসি পায়, যদিও আমি হাসি না। বইয়েও আমি অনেক ভালো ভালো কথা পড়ি, প'ড়ে আমার হাসি পায়। আমার মনে হ'তে থাকে মানুষ ভালো ভালো কথা বলতে পছন্দ করে, এটা মানুষের প্রভাব; কিন্তু মানুষ দুর্বল প্রাণী। আমাদের বাড়ি থেকে তাকালে উত্তর দিকে একটো অন্ত দেখা যেতো, আমার মনে হতো ঘঠটি এখনই ভেঙে পড়বে; একবার আমি একটি অসজিদের শিরনি দিতে গিয়েছিলাম, মৌলভির হাতে গামলাটি দিয়েই আমি সৌভে বেরিয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিলো ওই পুরোনো দালানটি এখনই ভেঙে পারবে। ওই দুটির কোনোটিই হয়তো এখনো ভেঙে পড়ে নি, হয়তো পড়েছে অন্তর্ক দিন ওগুলোর কথা আমার মনে পড়ে নি।

আমার ভেতর একটি লাল ঝুঁক জেগে উঠছে, তার সাথে পেরে উঠছি না আমি, টের পাছি আমি ভাঙছি; আমার ভেতরে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে, আমি তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওই ভাঙ্গনের শব্দ অঙ্গস্ত মধুর, আমি সারাক্ষণ ব্যাকুল হয়ে থাকছি ওই ভাঙ্গনের শব্দ শোনার জন্য। সব কিছু আমার অন্য রকম লাগতে শুরু হয়েছে। যা সব সময় শুয়ে থাকে, যখনই ঘর থেকে বেরোই দেখি শুয়ে আছে, যখন ফিরি দেখি শুয়ে আছে। যা খুব ক্লান্ত, যা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। যা অনেক সময় মেজেতে শুয়ে থাকছে, রান্নাঘরের খাটালেও শুয়ে থাকছে কখনো। অথচ যার জন্যে আমার ঘায়া হচ্ছে না; আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি আসছি, তাকে ডাকতেও ইচ্ছে করছে না। যাও আমাকে বেশি ডাকছে না আজকাল, যা খুব ক্লান্ত। বাবাকে বাড়িতে দেখি না, বাবাও ভেঙে গেছেন আরো; তারা ভেঙে গেছেন, এবং আমি ভাঙছি। আমার ভাঙ্গন তাঁদের ভাঙ্গনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি রক্তে কাপন বোধ করছি, আমার রক্ত উলঙ্ঘ পাগল হয়ে গেছে, আমি তার কলকল প্রবাহের শব্দ শুনছি; রক্তের ঘর্ষণে আমার গায়ের ত্বক অ্যালিউমিনিআমের মতো উত্পন্ন হয়ে উঠছে। আমি যেখান দিয়ে যাই, আমার মনে হয় সেখানকার বাতাস উত্পন্ন হয়ে উঠছে আমারই রক্তের মতো; পুকুরে নামনে মনে হয় পুকুর হঠাতে উত্পন্ন হয়ে উঠলো, পুকুরের পানি গর্জন ক'রে উঠলো আমার রক্তের মতো।

আমি নিজে নিজে সুখ পেতে শুরু করেছি; নিজের শরীরের ভেতরে যে এতো শিশুল বন ছিলো, সেখানে মধুর চাক ছিলো, তাতে এতো মধু ছিলো, সে-মধুর চাক

ভাঙতে যে এতো সুখ, তা আমার জানা ছিলো না। জানার পর আমি আমার তেতরের মধুর চাক ভাঙতে শুরু করি, তেতর থেকে জ্যাট মধু বের হয়ে আসতে থাকে। বোশেথের রোদে হেঁটে হেঁটে একবার আমি বিলের ভিটায় যাই, চারপাশে গলানো পারদের মতো রোদ, ভিটায় একটি বড়ো কাঠবাদামের গাছ, তার পাশে একটি ঝোপ, আর ঝোপের পাশে সবুজ ছায়ার অঙ্ককার। আমি সে-ছায়ায় ব'সে রোদ পান করতে থাকি, আমি রোদের ত্তরের ওপর রোদের ত্তর দেখতে থাকি, রোদ রসের মতো লোমকুপের ছিদ্র দিয়ে আমার তেতরে চুকতে থাকে। দূরে অনেকগুলো গুরু চৰঙ্গে, কোনো রাখাল দেখা যাচ্ছে না, বোরোধানের বেতের তেতরে সবুজ আগুন জুলচ্ছে। আমার তেতরে আগুন লেগে যায়। আমি আমার মধুর চাকে হাত দিই, বিলকিসকে মনে পড়ে, যাকে আমি দু-দিন আগে পুরুরে গোসল করতে দেখেছি, কদবানের পেপে দুটিকে আমার সবুজ মনে হতো, বিলকিসের দুটিকে আমার সবুজ মনে হয় নি, পেপে মনে হয় নি, শ্রাবণের আকাশের ভেজা টাঁদ মনে হয়েছে, আমার তেতর থেকে গলগল ক'রে মধু বেরিয়ে আসতে থাকে। কাঠবাদাম গাছের পাশের ঝোপে আমি মধুর প্লাবনে ডুবে যাই।

আমার রক্তের মধু প্রাণ ত'রে পান করেছি আমি, আমার রক্তমাংস আবাঢ়ের আকাশের মতো বজ্জ্বল ও বিদ্যুতে খানখান ফালাফেল হয়ে গেছে, আমার তেতর থেকে নালি বেয়ে বেয়ে মধু ঝরেছে। একটি ধর্মের ঘষ্ট তখন হাতে আসে আমার, তাতে আমি পড়ি ওইভাবে চাক ভেঙে মধু বের করা প্রচ্ছন্ন, তখন আমার তয় লাগতে থাকে, দোজগের আগুন দেখতে পাই, কেন্দ্ৰ বিহুটি ত'রেই জুলছিলো দোজগের আগুন। কিন্তু পাপ আর দোজগের আগুন ওই মধুর প্লাবনে বারবার নিভে যেতে থাকে। সুন্দরের মধ্যে গেলেই আমার ইচ্ছে হতো চাক ভাঙতে। একবার দুপুরে আমার ডাব বেতে ইচ্ছে হয়; আমি আমাদের সারকেল বাগানে যাই। একটি নারকেল গাছ বেয়ে বেয়ে আমি উঠতে থাকি। গাছটিকে জড়িয়ে ধরতেই আমার কেমন যেনো লাগে, একটু ওপরে উঠতেই আমার ভালো লাগতে থাকে গাছটিকে জড়িয়ে ধ'রে থাকতে, আমি বুব কোমলভাবে গাছটিকে জড়িয়ে ধরি, কোমলভাবে একটু একটু ক'রে ওপরের দিকে উঠি, গাছটিকে আমার আর গাছ মনে হয় না, বিলকিস মনে হয় কদবান মনে হয় তিনু আপা মনে হয়, আমি চোখে জুলজুলে অঙ্ককার দেখতে থাকি, আমার সমগ্র জগত অঙ্ককার হয়ে ওঠে, আমার তীব্র আলিঙ্গনে গাছটি যাটিতে নুটিয়ে পড়ে, আমি গাছটিকে জড়িয়ে ধ'রে গাছের গায়েই যেনো ঘূমিয়ে পড়ি। একবার পদ্মার পারে বিকেলবেলা গিয়ে দাঁড়াই আমি। আমার পেছনে নারকেল গাছের সারি, আমার পায়ের নিচে কোমল বেলেমাটি, দূরে নদীতে ছোটো ছোটো নৌকো ভাসছে-জেলেরা ইলিশ ধরছে। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি পদ্মার জন গলানো সিদুরের মতো হয়ে গেছে, পশ্চিমের আকাশ ছুয়ে সিদুরের ঢেউ উঠছে; সেই সিদুরগোলানো পানির ঢেউ লেগে পশ্চিমের আকাশ ভিজে গেছে, আমি ভেজা আকাশের দিকে তাকিয়ে কেপে উঠি। আমার লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় পশ্চিমের আকাশের পানিতে, ওই পানির সমস্ত সৌন্দর্য মাংস দিয়ে অনুভব করার তীব্রতা বোধ করি আমি, কিন্তু বুঝতে পারি কোনো কিছুই চৰমভাবে অনুভব

করার শক্তি আমার শরীরের নেই, তখন আমি নারকেল গাছের শেকড়ের ওপর ব'সে
পড়ি; পদ্মার পশ্চিম পারের মতো রঞ্জিন মধু ঝরতে থাকে আমার রক্ত আর মাংস
থেকে।

'সোনামতির প্যাট অইছে', খবরটা মাকে দিছিলো কালার মা; আমি পাশের ঘর
থেকে উন্ছিলাম।

'তুমি উন্না কার কাছে?' মা জিজ্ঞেস করলো।

'চৈক্ষণ্যাধৈর কে না জানে', কালার মা বলিলো, 'বাইরে ত এই কিছায় কান
পাতল যায় না।'

'কে এই কাম করল?' মা জিজ্ঞেস করে।

'কে আর করব, ইদ্রিসসা জোয়াইনকাই করছে', কালার মা বলে, 'অই ভাদাইম্যা
ছাড়া আর কে করব।'

কালার মা খুব চক্ষু হয়ে উঠেছে; পাড়া থেকে পাড়ায় ছড়ানোর মতো একটি
ঘটনা সে পেয়ে গেছে, পেয়ে খুব ত্বকি পাচ্ছে; কিন্তু আমি কেন্দ্র চক্ষুলতা বোধ করছি
না, শুধু সোনামতি আপার মুখটা আমার মনে পড়ছে, সাকে আমি মুখোমুখি আপাই
বলি, আর মনে পড়ছে ইদ্রিসদার মুখটাও। তারা দুজনে মিলে একটা খুব খারাপ কাজ
ক'রে ফেলেছে, আমি বুঝতে পারি, বিয়ে না ক'রে এমন কাজ করা তাদের ঠিক হয়
নি। সোনামতি আপাদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে,
কলাণ্ডপুরিনারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা, আরপ্পত্তির পাশেই, একটি ছোটো খালের পাড়ে,
ইদ্রিসদাদের বাড়ি, সেটিও ঘেরা কলাণ্ডপুরিনারকেল গাছ দিয়ে। অনেক দিন তাদের
বাড়ি আমি যাই নি, আজ বিকেলে ত্রৈকবার যাবো। সোনামতি আপা আর ইদ্রিসদা
একটা খুব খারাপ কাজ করেছে 'খুব খারাপ কাজ করেছে তারা?', আমার মনে এমন
একটি প্রশ্ন আসছে, অনেকস্কন্দ ধ'রে প্রশ্নটিকে আমি তাড়াতে পারছি না। আমাদের
গ্রামের কে কে এমন খারাপ কাজ করতে রাজি নয়? সোনামতি আপা রাজি হ'লে কে
কে এমন কাজ করতো না? তারপর পালিয়ে যেতো না? বিকেলে আমি সোনামতি
আপাদের বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি দক্ষিণের ঘরে তাঁর মাঘের পাশে ব'সে আছেন। তাঁর
মা খুব অসুস্থ, বাঁচবে না। আমাকে দেখে বিষণ্ণভাবে হাসলেন সোনামতি আপা; আমার
চোখে পড়লো বেশ বড়ো পেট হয়েছে তাঁর। দাঁড়াতে তাঁর কষ্টই হচ্ছিলো। তখন
ইদ্রিসদা এলেন। আমাকে তিনি দেখতেও পেলেন না যেনো, পাগলের মতো লাগছিলো
তাকে; তিনি চিৎকার করছিলেন, 'গ্রামের যেই শালারপোই যেই কথা কইক না ক্যান,
আমি সোনামতিরে বিয়া করুমই।' ইদ্রিসদা পালিয়ে যায় নি দেখে তালো লাগলো
আমার।

বিচার হবে সোনামতি আপা আর ইদ্রিসদার;- বিচার আমি দেখতে পাবো না,
ছোটোদের ওই বিচারে থাকতে দেয়া হবে না। আমার খুব ইচ্ছে বিচার দেখার; মকবুল
আর হান্নানেরও খুব ইচ্ছে। ওরাই আমার কাছে প্রস্তাবটি নিয়ে আসে। বিচার হবে
সোনামতি আপাদের উঠোনে, সন্ধ্যার পর; উঠোনের পাশে রয়েছে রান্নাঘর, আমরা চুপ
ক'রে রান্নাঘরের বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে বিচার দেখতে পারবো। কোনো শব্দ না

করলেই চলবে, বড়োরা আমাদের খেয়ালও করবে না, তারা ব্যন্ত থাকবে বিচার নিয়ে। বিচার পেলে বড়োদের আর কোনোদিকে খেয়াল থাকে না। ওই বড়োদের অনেককেই আমরা তখনই বড়ো ব'লে বিশেষ মান্যগণ্য করছি না; তাদের দেখলে যদি সালাম দিই, আড়ালে অনেককে ছাগল, পাগল, মুরগিচোরা, টাউট বলতে শুরু করেছি। যেমন তোতাখা আর কফিল মাতবরকে বছরখানেক ধ'রে আমরা সালাম দিই না, পথে পথে দেখা হ'লে মাথা নিচু ক'রে অন্য দিকে চ'লে যাই। কিন্তু তোতাখা আর কফিল মাতবর মাঝেমাঝে আমাদের ডাকে।

‘কি মিয়ারা, সিয়ানা অইয়া গ্যাছ বুঝি’, তারা বলে, ‘আইজকাইল আর সেলামআদাব দেও না।’

‘সালামাইকুম’, ব'লে আমরা কেটে পড়ি।

তারা থাকবে বিচারে, তারা বিচার করবে। বাবাও থাকবেন, মকবুল আর হান্নানের বাবাও থাকবেন। কিন্তু আমাদের বিচারে দেখতে হবে।

‘বিচারটা দেখতেই হবে, কোনোদিন তো আমাদের নিয়েও এমন বিচার হ'তে পারে’, মকবুল বলে।

আমি মকবুলের কথা শুনে তয় পাই, আমাকে নিয়ে এমন বিচার হচ্ছে ভাবতে পারি না।

‘তুই কার পক্ষে?’ মকবুল আর হান্নান আমাকে জিজ্ঞেস করে।

‘এতে আবার পক্ষ নিতে হবে না বিকল্প’ আমি জিজ্ঞেস করি।

‘যদি হয়?’ ওরা জানতে চায়।

‘আমি সোনামতি আপা জ্ঞান ইন্দ্রিসদার পক্ষেই’, আমি বলি।

‘হ, আমরা সোনামতি আপা আর ইন্দ্রিসদার পক্ষেই’, ওরা বলে। মকবুল একটু বেশি ক'রেই জোর দেয় কানাতের ওপর, এবং একটি সিগারেট ধরায়, আমি অবাক হই।

‘বাবার পকেট থেকে চুরি করেছি’, মকবুল হাসতে হাসতে বলে।

সোনামতি আপাদের রান্নাঘরের বেড়ার আড়ালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে আমরা বিচার শুনছি, দেখতে পাচ্ছি না বেশি; তবে তাদের সবার গলাই চেনা আমাদের, কে কথা বলছে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। আবুল হাশেমের গলাটাই শোনা যাচ্ছে বেশি। বুড়োরা অত্যন্ত অশ্রীল কথা বলতে পারে, তারা তা অবলীলায় ব'লে যাচ্ছে। ‘খানকি’ শব্দটি তাদের বেশ প্রিয়, বারবারই বলছে। হাশেম জোরে চিংকার ক'রে বলছে তার চোখেই প্রথম ঘটনাটি ধরা পড়ে;- একরাতে সে দেখতে পায় সোনামতি আর সোনামতির মা যে-ঘরে থাকে, ইঞ্জিস সে-ঘরের দরোজায় এসে আস্তে হাঁটু দিয়ে তিনবার টু দেয়। তখন ওই ঘরের দরোজা খুলে যায়। আবুল হাশেম ঘটনাটি পরীক্ষা ক'রেও দেবে। একরাতে সে নিজে সোনামতির মায়ের ঘরে গিয়ে তিনবার হাঁটু দিয়ে টু দেয়, তখন সোনামতি দরোজা খুলে দেয়; তাকে দেখে সোনামতি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সে সোনামতিকে জিজ্ঞেস করে সোনামতি কেনো দরোজা খুলেছে, সোনামতি মিথ্যা কথা বলে যে বাইরে যাওয়ার জন্যে সে দরোজা খুলেছে। আবুল হাশেমের সাথে আরো

তিনচারজন চিৎকার করতে থাকে। সোনামতি আর তার মা যে-ঘরে থাকে, হাশেম সে-ঘরটির বিস্তৃত বর্ণনা দেয়। সে বলে ঘরটিতে কোনো খাট নেই চৌকি নেই, মাটিতে দুটি বিছানা রয়েছে; একটিতে থাকে সোনামতির আধমরা মা, যার মরার বেশি বাকি নেই, যার হুশ নেই; অন্যটিতে থাকে সোনামতি। হাশেম চিৎকার ক'রে বলে যে ইদিস আর সোনামতি মায়ের পাশে শয়ে কবিরা শুনা করেছে, তাদের লাজলজ্জার বালাই নেই; আর সোনামতির মায়েরও লাজলজ্জা নেই, নিজের পাশে শয়ে সে নিজের মেয়েকে জিনা করতে দিয়েছে। সোনামতির মাকে ডাকা হয়, কিন্তু তার কোনো হুশ নেই; হাশেম বারবার জিজ্ঞেস করে, সে যা বলেছে তা সত্য কিনা; সোনামতির মা কোনো কথা বলে না, হয়তো সে কিছু শুনতে পায় নি। তোতাখা চিৎকার ক'রে বলে যে খানকির ঘরে তো খানকিই হবে, সোনামতির বাপ বছরের পর বছর জাহাজে কাজ করেছে, আর খানকিটা বছরের পর বছর যাবেতারে দিয়ে পেট বানিয়েছে; তার মেয়ে তো খানকিই হবে। এবার মনে হলো সোনামতি আপার মা শুনতে পাচ্ছে, সে আস্তে আস্তে উত্তর দিতে চেষ্টা করছে; সে বলছে, আমি জুদি বছর সোনামতির বাপ ছাড়া অন্যের লগে পেড বানাইয়া থাকি, তব ত আমি স্মিলিংথিকা মরদ ভাড়া কইব্যা আনি নাই, আপনাগো কারো লগেই পেড বানাইছি। এক্ষেত্রে প'ড়ে যায় চারপাশে, সোনামতির মা আর কথা বলে না। বিচার তেজে দুনিয়ার উপক্রম হয়। ইদিসদা চিৎকার ক'রে ওঠেন, ‘জিনা আমি বুঝি না সোনামতির লগে আমার ভাব হয়েছে, আমি তারে বিয়া করুম। সোনামতির পেটের পেটের আমার।’ তার দু-দিন পর দু-বাড়িতে সারাদিন ধ'রে কোরান পড়া হলো। সোনামতি আপার আর ইদিসদার বিয়ে হয়ে গেলো।

মকবুল অনেক ব্ববর করে, প্রত্যেক ঘরের ব্ববর তার মুঠোর ভেতরে। একদিন সে বললো, আমাদের গ্রামে কমপক্ষে দশটা জারজ আছে। শনে আমার ভয় লাগলো না, ব্ববৎ মনে হলো ভাগ্য ভালো জারজ দেখে চেনা যায় না; চেনা গেলে খুব তয়ক্ষর হতো। তার মতো বুড়োগুলো কি কম শয়তান, এখন একেকটা দাঢ়ি রেখে মুরব্বি সেজেছে টুপি মাথায় দিয়ে নামাজ প'ড়ে কপালের চাপড়া তুলে ফেলছে, কিন্তু সেগুলো কি কম শয়তান ছিলো? সুবিধা পেলে এখনো কি কম শয়তানি করে? যাত্রার সময় তারা কী করে, আমরা জানি না? মকবুল একটি একটি ক'রে জারজের নাম শোনাতে থাকে-আবুল হাশেম, ইসমাইল মোল্লা...। নামগুলো সে তার দাদীর কাছে শনেছে, তার দাদী গ্রামে কার সাথে কে শয়েছে তার পঞ্চাশ বছরের সব খ্ববর রাখে। মকবুল বলতে থাকে, ওই যে জাহাজে যারা কাজ করে, যারা আসাম আর দিনাজপুর থাকে, বছর বছর বাড়ি আসে না, তাদের বউদের ছেলেমেয়ে হয় কেমনে? যারা সারারাত ইলিশ ধরে পদ্ধায়; তাদের বউগুলো কি একলা থাকে? আমি শনি আর চোখের সামনে তেজে পড়া দেখতে থাকি; পদ্ধার পার যেমন ক'রে ভাঙ্গে তেমন ক'রে তেজে পড়তে থাকে-কী যেনো তেজে পড়তে থাকে, কী সব যেনো তেজে পড়তে থাকে, আমি বুঝে উঠতে পারি না; ভাঙ্গের দৃশ্যে আমার চোখ ভ'রে যায়।

রওশনদের বাড়ি আমি অনেক বছর যাই নি, যার সাথে গ্রামীণ বিদ্যালয়ে পড়তাম; তারপর সে শহরে চলে গিয়েছিলো শহরের ইঙ্কুলে বেশি ভালো করে পড়বে বলে, আবার ফিরে এসেছে; ফেরার পর আর দেখা হয় নি। রওশনের উচ্চশিক্ষা কি শেষ হয়ে গেলো? দূর থেকে রওশনকে মাঝেমাঝে দেখি আমি, যখন ইঙ্কুলে বা খেলার মাঠে যাই, দেখি রওশন নারকেল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মাঠ দেখছে বা দেখছে আঘাতে, বা পুরুরের পানি দেখছে, বা আকাশ দেখছে বা কিছুই দেখছে না, তখুন আমি দেখছি তাকে। রওশন কী দেখতে পছন্দ করে, তা আমি জানি না; তবে দূর থেকে তাকে দেখে আমরা ধন্য হচ্ছি। গ্রামে রওশন ভিন্ন ছিলো; আমাদের বয়সের একমাত্র সে-ই তখুন শহরে গেছে, আর ফিরে এসেছে শহর থেকে, এবং সে সালোয়ারকামিজ পরে, গলায় দোপাটা ঝুলিয়ে রাখে, শাড়ি পরে না। আর সে সুন্দর। তাকে দেখার জন্যে মকবুল মাঝেমাঝে এমনভাবে ঘুড়ির সুতো ছিড়ছে, যাতে ঘুড়িটি গিয়ে ওদের নারকেল গাছে আটকায়। মকবুলের ঘুড়ি মকবুলের কথা তন্হে চমৎকারতাবে, উড়ে গিয়ে আটকে যাচ্ছে রওশনদের নারকেল বা আমগাছে; মকবুল ঘুড়ি আনতে গিয়ে কখনো দেখতে পাচ্ছে রওশনকে, আর যতোক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না ততোক্ষণ সে কিছুতেই ঘুড়ি ছাড়াতে পারছে না। আমি ওদের বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবছি না; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি ইঙ্কুলে যাওয়ার সময় রওশন আকাশ দেখার জন্যে এসে উপস্থিত হচ্ছে নারকেল গাছের গোড়ায়, ফেরার সময় সে পুরুরের জলে টেউ আর হাঁসের সাঁতার দেখার জন্যে এসে দোড়াচ্ছে বাঁধান্তে যাচ্ছে। ওই সময় আকাশ আর পুরুরের টেউ আর হাঁস ওর নিচয়ই সুন্দর লাগছে সারাদিনের আকাশ আর জলের টেউ আর হাঁসের সাঁতার থেকে। কিন্তু ওকে দেখার পর আমি আর হাঁটতে পারি না; কয়েক দিন আমি অনেক পথ ঘুরে ইঙ্কুলে গেছি, ঘুরে ফিরেছি, আর মাঠে যাই নি। তারপর খুব শূন্য লাগছে। শূন্য লাগার থেকে অনেক ভালো সোজা পথে ইঙ্কুলে যাওয়া, ঠিক সময়ে মাঠে যাওয়া আর কারো আকাশ আর পুরুরের জলের টেউ দেখাকে বিষাক্ত না করা।

শওকত এখন কোথায় কেমন কী করে জানি না, কিন্তু ওকে আমার মনে পড়ে; ও-ই আমাকে স্বপ্নের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলো। একটি অস্তুত ব্যাপার ঘটে আমার;— সাধারণত স্বপ্ন দেখি না আমি, কিন্তু দেখলে রওশনকেই দেখি। আমার অন্য কোনো স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু অন্য কিছুই আমি দেখি না, কয়েক মাস পর হঠাৎ স্বপ্ন দেখি, দেখি রওশন, এবং সে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে; আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি নারকেল গাছের নিচে, অগ্নিগিরির জ্বালামুখের ওপর, একলা পড়ে থাকি। শওকত, রওশনের ছোটোভাই, এক বিকেলে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যায়, আমি যেতে চাই নি আর না গিয়েও পারি নি; আমরা বসার ঘরে ক্যারোয় খেলতে থাকি। শরৎ শেষ হয়ে আসছে, হেমন্ত দেখা দিচ্ছে, বিকেলটি কোমলতায় তরে গেছে, পৃথিবীতে এতে কোমল বিকেল হয়তো আর আসে নি; আমি এক সময় অনুভব করি পেছনের জানালা দিয়ে একটি হাত তার পাঁচটি কোমল আঙুল আমার চুলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ওই অনিব্যবস্থায় আঙুলগুলো তারপর স্থির হয়ে থাকে আমার মাথার মাঝাখানে, আমার শরীর জুড়ে কোমলতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর আমি খুব ধীরে আমার বাঁ হাত উঠিয়ে

আমার পাঁচটি আঙ্গুল রাখি ওই অঙ্গুলিমালার ওপর, এবং পেছনের দিকে ফিরে তাকাই।
রওশন হাত সরিয়ে নিয়ে শরতের চাঁদের মতো হাসে। এতো কাছে থেকে আগে
কখনো আমি চাঁদ দেখি নি, আমার জানালার এতো কাছে এর আগে কখনো চাঁদ ওঠে
নি। রওশন একটু পর ঘরে এসে ঢেকে; শওকত আর খেলবে না, রওশন আর আমি
খেলতে থাকি। রওশন যখন স্ট্রাইক করে তার চুল ছড়িয়ে পড়ে, মাঝখানে একটি চাঁদ
ভাসতে থাকে; রওশন যখন স্ট্রাইক করে, তার আঙ্গুল ফুলের মতো দল মেলে।
স্ট্রাইকের ফেরত নেয়ার সময় আমার আঙ্গুলে লাগে রওশনের আঙ্গুল, আর রওশনের
আঙ্গুলে লাগে আমার আঙ্গুল; আমরা মুখে কথা না বলে আঙ্গুল দিয়ে কথা বলতে থাকি।
রওশনের প্রতিটি আঙ্গুলের নিজস্ব কঠিন রয়েছে, তাদের গলা থেকে গলগল করে
সোনা ঝরতে থাকে, আমি সেই সব স্বর শুনতে পাই; এর আগে আমি কখনো স্পর্শের
স্বর শুনি নি। আমার মনে হতে থাকে এর আগে আমাকে কেউ ছোয় নি, আর আমিও
কখনো কিছু ছুই নি, কাউকে ছুই নি।

আঙ্গুল, আঙ্গুলের রূপ, আঙ্গুলের স্বর, আমার সম্ব্যামিক এক কোটি দশ লাখ
সুরে ভরে দেয়; আমি যখন বেরিয়ে আসি চারপাশে মহাজগত ভরে কুয়াশায় গাছের
পাতায় পাখির ডানায় আমি পাঁচটি আঙ্গুলের স্বর শুনতে পাই। আমার রক্তে ওই স্বর
চুকে যায়, চারপাশের বাতাসকে আশ্র্যরকম মনুণ পরিস্রষ্ট মনে হয়, নিজেকে এতো
হাঙ্কা লাগে যে আমি হেঁটে বাড়ি না ফিরে মেঘদোকের ওপর দিয়ে নক্ষত্র ছুয়ে ছুয়ে
বাড়ি ফিরি; তার আগে একবার নদীর দিকে যাই, মনে হ'তে থাকে পাঁচটি আঙ্গুল নদী
হয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর জড়িয়ে আছে আমার পাঁচটি আঙ্গুলের সাথে, মনে হ'তে থাকে
পাঁচটি আঙ্গুল এখনো আমার চুলের তেতুর পাঁচটি স্রোতের মতো চুকছে, চুকে স্থির হয়ে
আছে, সেখান থেকে কোম্লতা ঝাড়িয়ে পড়ছে আমার মাংসের তেতুর রক্তের তেতুর
নদীর তেতুর গাছপালার তেতুর কুয়াশার তেতুর। আমার আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকাই
আমি, বারবার, দেখে মনে হয় ওগুলো অন্য রকম হয়ে গেছে, জন্মান্তর ঘটে গেছে
ওগুলোর, সোনা হয়ে গেছে, ওগুলোর গায় কখনো আর ময়লা লাগবে না। ওইটুকু
স্পর্শ নিয়েই আমি বিভোর হয়ে ছিলাম, আর কোনো স্পর্শ আমার জীবনে দরকার
পড়বে বলে মনে হয় নি; যতোদিন বাঁচবো ততোদিন ওই স্পর্শ আমি আমার আঙ্গুলে
আমার রক্তে বয়ে বেড়াতে পারবো। তাই আমি মেঘের ওপর মেঘে বেড়াতে থাকি,
একদিন দু-দিন তিনদিন চারদিন; রওশনের মুখ আমি ভুলে যাই, আঙ্গুলগুলোকে ভুলে
যাই, শুধু তার স্পর্শ বয়ে বেড়াতে থাকি। রওশনদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে
যাওয়ার সময় আমার চোখ অস্ত হয়ে আসতে থাকে, কিছু দেখতে পাই না আমি, শুধু
স্পর্শ দেখতে পাই; এবং একদিন বিকেলে যখন আবার চোখে দেখতে পাই দেখি
রওশন হাত তুলে ডাকছে আমাকে।

অনেক বছর ধরে যেনো আমি দুর্গম পথ হাঁটছি বা এখনো হাঁটতে শিখি নি,
এমন করে আমি হাঁটতে থাকি রওশনদের সড়ক ধরে, রওশনদের বাড়িতে ঢোকার
পথের নারকেল গাছগুলোকে নতুন করে দেখি; রওশনদের বসার ঘরের পাশে একটি
বাঁধানো কবর আছে, সেটিকে দেখি অনেকক্ষণ ধরে, এই প্রথম দেখছি বলে মনে হয়,

এবং দেখতে পাই রওশন দাঁড়িয়ে আছে। রওশনের সাথে বসার ঘরে ঢুকি আমি,
আমাকে বসতে বলে রওশন বেরিয়ে যায়; আমি জানালার পাশের চেয়ারটিতে বসে
লক্ষ লক্ষ বছর কাটাতে থাকি, একসময় দেখি রওশন আমার পাশে দাঁড়ানো, এবং
আমার বাঁ হাতটি তার ডান হাতের মুঠোর ভেতর। আমি রওশনের মুখের দিকে
তাকাই, জ্যোৎস্নায় আমার চোখমুখ শীতল হয়ে ওঠে; এতো জ্যোৎস্না আমার মুখের
ওপর আগে আর কখনো ব'রে পড়ে নি। আমি যদি অনেক আগেই অঙ্ক না হয়ে
যেতাম তাহলে ওই জ্যোৎস্নায় আমার দু-চোখ সম্পূর্ণ অঙ্ক হয়ে যেতো। কিন্তু
জ্যোৎস্নার থেকে আরো অসামান্য ঘটনা রওশনের মুঠোতে আমার বাঁ হাত;—আমি বুঝে
উঠছি না আমার হাত নিয়ে আমি কী করবো, সেটিকে কি আমি অনন্তকাল ওই
মুঠোতেই রেখে দেবো, ওই মুঠোতে থাকলেই কি সেটি সবচেয়ে শান্তি পাবে? কিছুই
বুঝে উঠতে পারছি না আমি। রওশন আমাকে ধরেছে, রওশন আমাকে ছুঁয়েছে; আমি
এখনো ছুই নি। রওশন আন্তে বললো, ‘আমাকেও ধরো।’ আমি তার মুখের দিকে
তাকালাম, রওশন তাকালো আমার মুখের দিকে; আমার অঙ্গেগুলো সজীব হয়ে
উঠলো একটু একটু করে, অমনি কী যেনো রওশনের আঙুল থেকে আমার আঙুলে আর
আমার আঙুল থেকে রওশনের আঙুলে বইতে শুরু করলো— তা বিদ্যুৎ নয়, বিদ্যুতের
থেকে তীব্র ও আলোকময়; তা কার্তিকের কুয়াশা নয়, কার্তিকের কুয়াশার থেকে অনেক
কোমল অনেক কাতর। আমরা সারা বিকেল হাত রেখে জীবন যাপন করলাম,
আমাদের মনে হলো আমাদের হাত দুটি পুঁজি পরের মুঠোতে থাকলেই শুধু বেঁচে
থাকে। রওশন শুধু মাঝেমাঝে বাইরে চাকিয়ে দেখছিলো কেউ আসে কিনা কেউ উকি
দেয় কিনা। সেই বিকেলে আমরা দুজন বদলে গেলাম, আমরা দুজন আবার জন্ম
নিলাম।

আমি যখন চলে আসিতখনো মনে হচ্ছিলো রওশন আমার হাত ধ'রে আছে,
আমি রওশনের হাত ধ'রে আছি; কিন্তু লেবুঝোপের পাশে এসেই আমার হাত আর বুক
খুব শূন্য লাগতে শুরু করে, রওশনের হাত আরেকবার ধরার পিপাসা বুকে বোশেবের
রোদের মতো কাপতে থাকে। রওশনের হাত একবার ধরার পর তারপর না ধ'রে থাকা
কী কঠিন কী কষ্টকর তা আমি লেবুঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ঘর্ঘর্ঘর্ঘ অনুভব করি।
আবার ফিরে যাবো, গিয়ে আরেকবার রওশনের হাত ধরবো? কেউ কি দেখে ফেলবে
না? রওশন কি কিছু ভাববে? না, আমাকে ফিরে যেতে হবে, ওই হাত আরেকবার
ছুঁতেই হবে, নহিলে আমি বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে পাবো না। সঞ্চ্যা নেমে গেছে, আমি
আবার রওশনদের বসার ঘরের দিকে পা বাড়াই; রওশন দাঁড়িয়ে আছে বাঁধানো
কবরের পাশে ডালিম গাছের নিচে। রওশনের হাতও কি রওশনকে দৌড় করিয়ে
রেখেছে ডালিম গাছের নিচে? আমি কাছে যেতেই আমাদের হাত কখন যে পরম্পরাকে
ধ'রে ফেলে, তা আমরা কেউ জানতে পারি না। কোনো কথা বলি না আমরা, আমাদের
কোনো কথা নেই, কথা আছে আমাদের হাতদের, তারা কথা বলতে থাকে, তাদের
গলা থেকে সোনা বারতে থাকে। আমাদের হাতদের কথা অচ সময়ের মধ্যেই শেষ
হয়, আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করি। এক দুই তিন চার, কয়েক সপ্তাহ ধ'রে আমি

আর রওশন গৌণ হয়ে যাই, আমরা কেউ নই, আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই; অস্তিত্ব আছে শুধু দূজনের হাতের, রওশনের ডান হাতের আর আমার বাঁ হাতকে মুঠোতে তুলে নেয়, আমার ডান হাত রওশনের বাঁ হাতকে মুঠোতে তুলে নেয়; আমরা চুপ ক'রে থাকি, হাতেরা কথা বলে। হাতদের কথা বলায় আমরা কোনো বাধা দিই না, আমরা কথা ব'লে হাতদের কথা বলায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করি না; আমরা শুধু চাই ওরা ঘোপের আড়ালে ব'সে নিজেদের অতরঙ্গতম কথাগুলো বলুক; আর চাই তাতে যেনো আর কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। আমরা দুজন প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে থাকি;— আমি জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি কেউ আসে কিনা, তাকায় কিনা; রওশন দরোজা দিয়ে তাকিয়ে দেখে কেউ আসে কিনা, কেউ তাকায় কিনা। হাতেরা যখন একে অন্যের সাথে কথা বলে তখন তারা বাইরের কিছু দেখতে পায় না, তাদের হয়ে দেখি আমি আর রওশন, আমাদের হাতেরা কথা বলে একে অন্যের সাথে।

পাহারা দেয়া, বুঝতে পারি আমরা, শুব কঠিন কাজ; পাহারা দিতে শিয়ে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রথর হয়ে ওঠে, ধারালো হয়ে ওঠে ~~শুন~~ দেয়া ছুরিকার মতো; দূরে কোথাও পাতা ব'সে পড়লে শনতে পাই, ছায়া কেঁপে উঠলে দেখতে পাই,— অমনি আমাদের হাত স'রে যায় পরস্পরের খেকে; যখন ~~শুনতে~~ পারি ওটি পাতা খসার শব্দ ওটি ছায়া কাঁপার দৃশ্য, তখন আমাদের হাত আবার পরস্পরকে বুকে তুলে নেয়। রওশনের আবরা মাঝেমাঝেই এদিক দিয়ে বাইরে যান, আবার ফিরে আসেন, তখন আমাদের হাত শুব দূরে স'রে যায়; রওশনের আমা কখনো উঠোনে আসেন, পুরুরের দিকে যান, তখন আমাদের হাত স'রে যায়; আর আছে শওকত, তার কাজ আসাযাওয়া, এই ঘরে চুকচে স্বাক্ষর বৈরিয়ে যাচ্ছে, তাই আমাদের হাত এই ছুচ্ছে পরস্পরকে আবার দূরে স'বে বাচ্ছে একে অন্যের খেকে। দূরত্ব সম্পর্কে একটি অনুভূতি হয় আমাদের; আপ্সরা বুঝতে পারি দু-ইঞ্জি দূরত্ব আর দু-কোটি মাইল দূরত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; আমাদের হাত যদি পরস্পরকে না ধরে থাকে তখন এক ইঞ্জি দূরত্ব আর এক কোটি মাইল দূরত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যখন আমরা না ছুয়ে থাকি তখন আমরা অনন্তের খেকেও বেশি দূরে। আমাদের চোখেরাও তখন সুন্দর ছাড়া আর কিছু দেখতে তুলে গেছে, আমি রওশনের দিকে তাকাই, দেখি সুন্দর; রওশন আমার দিকে তাকায়, সেও দেখে সুন্দর; যদি সে সুন্দর না দেখতো তাহলে অমন ক'রে এতোক্ষণ ধ'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো না। এর আগে সবচেয়ে বেশি সময় ধ'রে আমি তাকিয়েছিলাম একটি ফুলের দিকে, দীর্ঘ কয়েক মিনিট তাকিয়ে ছিলাম, অতো সময় ধ'রে আর কোনো কিছুর দিকে আমি তাকাই নি; অতো সুন্দর ফুলের দিকেও কয়েক মিনিটের বেশি আমি তাকিয়ে থাকতে পারি নি; কিন্তু রওশনের দিকে মুখের দিকে আমি সারা বিকেল তাকিয়ে থাকতাম, যেমন রওশন তাকিয়ে থাকতো আমার মুখের দিকে। রওশন তাকিয়ে থাকতো ব'লে আমার মুখটি তখন সুন্দর হয়ে উঠেছিলো।

সক্ষ্যা হ'লে চ'লে আসতাম আমি। সক্ষ্যার পর বাইরে থাকা নিষেধ ছিলো আমার; তবে কোনো কোনো দিন, প্রায় প্রত্যেক দিন, শওকত আর রওশন দূজনেই

আমাকে থাকতে বলতো আরো কিছুক্ষণের জন্য, ওদের সাথে পড়ার জন্য, এবং আমি নিষেধ সত্ত্বেও ওদের সাথে, সগোহে দু-এক দিন- বিশেষ ক'রে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, না থেকে পারতাম না। টেবিলে মুখোমুখি বসতাম রওশন ও আমি, ডান দিকে বসতো শওকত; তখন আমরা বেশ দূরে, আমাদের হাত ধরতে পারতো না পরস্পরকে, আমাদের মনে হতো আমরা দুই গ্রহে রয়েছি। রওশন এক বিশ্বয়কর আবিকারক, রওশনই তখন স্পর্শের নতুন রীতিটি বের করে। প্রথম সন্ধ্যায়ই, যখন আমি রওশনের থেকে লাখ লাখ আলোকবর্ষের দূরত্বে থাকার কষ্টে কাতর হয়ে উঠছি আর রওশন তা বুঝতে পেরে আরো কাতর হয়ে উঠছে, তখন আমার ডান পায়ের পাতার ওপর আমি অনুভব করি একস্তুপ কোমলতার লঘুতা, এবং সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি রওশনের চোখ দুটি কথা বলছে। আমার চোখ তার চোখের কথা সাথে সাথেই বুঝে ফেলে, আমি তখন আমার বাঁ পা রাখি রওশনের ডান পায়ের পাতার একরাশ কোমল মসৃণতার ওপর। আমাদের পা কথা বলতে থাকে। এর পর যে-সন্ধ্যায়ই আমি ওদের সাথে থেকেছি, আমার ডান পায়ের পাতার ওপর রওশন রাখতো তার বাঁ পা, আর রওশনের ডান পায়ের পাতার ওপর আমি রাখতাম আমার বাঁ পা। কথা বলতো আমাদের পায়েরা। পায়েরাও চমৎকার কথা বলতে পারে, পায়েরাও কোমল হতে হতে গন্ধরাজ হয়ে উঠতে পারে, আমাদের পা গন্ধরাজ হয়ে টেবিলের তলদেশকে সুগম্বে তরে দিতে থাকে। আমাদের শুজনের পায়ের পাতা থেকে সুগম্ব উঠছে, আমরা তাতে বিভোর হয়ে আছি। প্রচুর গন্ধে আমাদের রক্ত পাগল হয়ে উঠছে মাতাল হয়ে উঠছে বুলবুলি হয়ে উঠছে শুজাপতি হয়ে উঠছে পদ্ম হয়ে উঠছে চাঁদ হয়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠছে। শওকত একদিন আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে টেবিলের নিচে অকারণে উকি দিতে পারে না! তাকে একটি যুক্তিসংত কারণ বের করতে হয় টেবিলের নিচে উকি দেয়ার জন্য;— সে তার হাতের পেসিলটি নিচে ফেলে দিয়ে হ্যারিকেন নিয়ে টেবিলের নিচে পেসিল ঝুঁজতে থাকে, আমাদের পায়ের পাতা দূরে স'রে যায়; আর তখন টেবিলের ওপরের অঙ্ককারে আমাদের হাত খুঁজে পায় একে অন্যকে, শান্তিতে ভ'রে যায় তাদের প্রতিটি আঙ্গুল, আঙ্গুলের মাংস, নখ, আঙ্গুলের হৃদয়। শওকত হঠাৎ মাথা তোলে টেবিলের নিচের থেকে, আর অমনি আমাদের হাতেরা দূরে স'রে যায়, যেনো তারা কখনো কাছাকাছি আসে নি, আসার সাধ নেই তাদের; এবং তখন টেবিলের নিচে আমার ডান পায়ের ওপর এসে পড়ে একস্তুপ কোমলতার লঘুতা, আর আমার বাঁ পায়ের পাতা গিয়ে পড়ে একস্তুপ কোমল মসৃণতার ওপর। শওকত বারবার পেসিল ফেলতে ফেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর আমাদের পায়েরা একে অন্যের ওপর ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে।

রওশন আর আমি বোবা নই, আমরা যে কোনো কথা বলি নি, তা নয়; অনেক কথাই আমরা বলেছি, কিন্তু আমাদের কোনো কথাই যেনো কোনো অর্থ প্রকাশ করতো না যতোক্ষণ আমাদের হাত ধরতে পারতো না পরস্পরকে, আমাদের পায়ের পাতা স্পর্শ করতো না একে অন্যকে। রওশন আর আমি তখন তুক আর মাংসের অবণনীয় সুরের ভেতরে বাস করছি। রওশনের আঙ্গুলগুলো ছিলো দীর্ঘ আর কোমল, যে-

কোমলতা মেঘের নয় পালকের নয় রেশমের নয় গোলাপের নয় বাতাসের নয় জলের নয়, যা শুধু রওশনের; তার হাতের তালুতে কোমল মাংস, আমার আঙ্গুল ওই দুঃখফেনার ভেতর ডুবে যায়; তার ঢুক কচুরি ফুলের পাপড়ির মতো মসৃণ; ওই কোমল মসৃণতা পেরিয়ে রওশনের হাত থেকে আরেক কোমলতা সঞ্চারিত হয় আমার হাতে, যার কোনো পরিচয় আমি জানি না; হাত বেয়ে তুকের ওপর দিয়ে রক্তের ভেতর দিয়ে মাংসের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে, আর আমার শরীর অলৌকিক হয়ে ওঠে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার, মনে হয় টাঁদ পাঁড়োপাঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আমার রক্তে; রওশনের মুখের দিকে তাকিয়েও তার চোখ ভরে মুখ ভরে ভুরুর ওপরে ঠোটের মাঝখানে ঘুমের ঘোলাটে জ্যোৎস্না ছড়ানো দেখতে পাই।

'তুমি কেমন আছো?' আমি জানতে চাই, বা আমি জানতে চাই না, আমি শুধু জেগে থাকতে চাই। অবাক হয়ে আমি লক্ষ্য করি রওশনকে আমি 'তুমি' বলছি, আমরা তো 'তুই' বলতাম একে অন্যকে।

'তা-লো', রওশন বলে, 'কী যে সুখ লাগে তোমাকে ছালে!' সেও প্রাণপনে চেষ্টা করে জেগে থাকার, বলে 'তোমার লাগে না?' রওশনও 'তুমি' বলছে আমাকে। আমরা 'তুই' থেকে 'তুমি' হয়ে উঠি।

'ঘুম পায় আমার এতো ভালো লাগে', আমি বলি।

'চিরকাল ছুয়ে থাকবো আমরা, তুমি সার্বিক রওশন বলে।

'তারচেয়েও বেশি', আমি বলি, 'তুরচেয়েও অনেক বেশি।'

'তুমি সুন্দর', রওশন বলে। আমি তার বিব্রত বোধ করি, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে আমি সুন্দর, রওশন যা বলে তা কবনো মিথ্যা হ'তে পারে না।

'না, তুমি সুন্দর' আমি বলি।

'না, তুমি সুন্দর', বলে আবার বলে; গানের মতো বলে রওশন, বলতে থাকে রওশন, 'তুমি সুন্দর, এতো সুন্দর, কী যে সুন্দর।'

রওশনের কথা উনে আমার মেঘের ওপর ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, আমি ঘুমিয়েই পড়ি, বলি, 'না, তুমি সুন্দর, রওশন, শুধু তুমিই সুন্দর পৃথিবীতে।'

আরো সুন্দর হয়ে ওঠে রওশন,—আমার ওঠ থেকেও তাহলে উচ্চারিত হচ্ছে চরম সত্য, রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও অধিকার পেয়েছি চরম সত্য বলার;—রওশনের মুঠো আরো কোমল হয়ে ওঠে, ওই কোমল মুঠোর ভেতর আমার আঙ্গুলগুলো আমার হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপতে থাকে। রওশনের মুখের দিকে তাকাই আমি, জ্যোৎস্নায় তেসে যেতে থাকে আমার মুখমণ্ডল। মনে হয় শরতের পূর্ণিমা টাঁদের নিচে আমি নৌকো বেয়ে চলছি, বৈঠার শব্দ উঠছে; মনে হয় হেমতের পূর্ণ টাঁদের নিচে পাকা আমন ধানের খেতের পাশে আমি নৌকো লাগিয়ে বসে আছি, শাদা কুয়াশা নেমে আসছে, আমার চুলে শিশির জমছে, কাশবন দুলছে, বাঁশির শব্দ তেসে আসছে, আর বহুরে আড়িয়ল বিলের উত্তরে জুলছে একটি আকাশপ্রদীপ। রওশনের শরীর থেকে জ্যোৎস্নার গন্ধ এসে লাগতে থাকে আমার নাকে, কুয়াশার গন্ধ এসে লাগতে

থাকে আমার নাকে, ধানের গন্ধ এসে লাগতে থাকে নাকে; আমার শরীরের কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধানবেতের ওপর, আখবেতের ওপর, কাশবনে, নারকেল গাছের পাতায়, দূরে উচু উচু তালগাছগুলোর পাতায়। রওশন ঝুকে পড়ে আমার গ্রীবার ওপর, তার নাক লাগে আমার গ্রীবায়, তার গাল লাগে আমার গালে; আবার সোজা হয়ে দাঢ়িয়ে সে হাসে। আমি তখন আর কিছু দেখতে পাই না, চোখ বন্ধ করে ফেলি, এবং বন্ধ আর অঙ্ক চোখে দেখতে পাই আকাশজোড়া লাল রঙ।

আমি আর নিজের শরীরের মধু আহরণ করি না, নিজের শরীরের চাক ভাঙি না, ভাঙতে ইচ্ছ করে না; বিশ্বিত হই আমি—রওশনের হাতে হাত রাখার আগে নিজের শরীরের মধুর স্বাদ আমি প্রাণভরে পান করেছি, কিন্তু এখন ইচ্ছ করে না, ঘেন্না লাগে, ওই কথা মনেই পড়ে না। আমি রওশনের হাতের মধু পান করেছি, অন্য কোনো মধু আর আমার কাছে মধুর লাগে না, একমাত্র মধু হচ্ছে রওশনের আঙুলের ছোয়া, রওশনের পায়ের পাতায় আমার পায়ের পাতার স্পর্শ, যা আমাকে যেখের ওপরে উড়ালের সুখ দেয়। একদিন আমাদের বিয়ে হবে, এমন ক্ষণটা আসে আমার মনে, তখন আমরা কী করবো? আমি ভাবতে চেষ্টা করি—তখন আমরা হাতে হাত রেখে সারাদিন ব'সে থাকবো, তখন আমরা হাতে হাত রেখে সারারাত জোগে থাকবো, রওশনের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে থাকবো, বিশ্বন তাকিয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে। আমরা আর কিছু করবো না। রওশনের শাড়ি থেকে আমার নাকে এসে গন্ধ লাগবে, আমরা হাটতে বেরোবো, তখন রওশনের শাড়ির পাড় বাতাসে উড়বে, আমার মুখে এসে পড়বে। আমরা পাশাপাশি জুর থাকবো, রওশনের শরীরের ছোয়া লাগবে আমার শরীরে, রওশনের গালে আমি আমার আঙুল বুলোবো, রওশন আমার নাকের ওপর তার আঙুল রাখবে, আমি আমরা সারারাত কথা বলবো, আমরা কি আর কিছু করবো? রওশন তখন ব্লাউজ পরবে, লাল ব্লাউজ পরবে, ব্লাউজের ওপর দিয়ে তার গলা দেখা যাবে, তার গ্রীবা দেখা যাবে। আমি কি কখনো তার ব্লাউজ খুলবো? না, না, না; আমি কখনো তার ব্লাউজ খুলবো না, রওশন কী মনে করবে, রওশন আমাকে খুব খারাপ মনে করবে; আমরা অতো খারাপ হবো না। বিয়ে হলে লোকেরা ন্যাঃটো হয়ে শোয়, তারা খুব খারাপ কাজ করে, রওশন আর আমি কখনো ন্যাঃটো হবো না, কোনো খারাপ কাজ করবো না; আমরা চুমো খাবো—রওশন আস্তে আমার গালে ঠোট ছোয়াবে, আমি আস্তে রওশনের গালে ঠোট ছোয়াবো, তাতেই আমাদের ঘূর এসে যাবে, আমরা পাশাপাশি পড়বো, জোগে উঠে দেখবো আমরা পাশাপাশি শয়ে আছি, আমাদের একজনের হাতে আরেকজনের হাত। রওশন যদি কখনো ব্লাউজ পরতে গিয়ে পরতে না পারে, যদি আমার চোখের সামনে তার দুধ দুলে ওঠে? আমি চোখ বন্ধ করে ফেলবো, আমি অতো অসভ্য হতে পারবো না, আমরা কোনো অসভ্য কাজ করবো না, আমরা শুধু হাত ছুয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবো, আমরা শুধু ভালোবাসবো।

রওশন একটি চিঠি লিখেছে আমাকে, প্রথমে আমি বুঝতেই পারি নি ওটি কী; আমাকে সে চোখ বন্ধ করতে বলে, আমি চোখ বন্ধ করি, অমন সময় শওকত এসে ঢোকে, আর রওশন ব'লে ওঠে, ‘চোখ খোলো, খোলো’; আমি চোখ খুলে শওকতকে

দেখে একটু বিব্রত হই, কিন্তু রওশন বলে, 'আমরা আজ চোখ খোলা চোখ বন্ধ করা খেলছি।' শওকতও চায় চোখ খোলা চোখ বন্ধ করা খেলতে। রওশন শওকত ও আমাকে চোখ বন্ধ করতে বলে, আমরা চোখ বন্ধ করি; আমি টের পাই রওশনের হাত ঢুকছে আমার বাঁ পকেটে, রওশন কী যেনো রাখছে। শওকত চোখ বন্ধ রেখে অঙ্গীর হয়ে ওঠে, বলতে থাকে, 'চোখ তো বন্ধ করেছি, কিন্তু খেলা তো হচ্ছে না।'

যে-খেলাকে আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলা, যা খেলার জন্যে আমি সারাজীবন চোখ বন্ধ করে রাখতে পারি, তা খেলাই মনে হচ্ছে না শওকতের! রওশন আমার পকেট থেকে হাত বের করে বলে, 'এবার বলো টেবিলের ওপর কী রেখেছি।' শওকত বলে, পেসিল; আমি বলি, চাদ; তখন রওশন একবার আমার হাত ধরে, তার হাত থেকে আমার হাতে অলৌকিক শিখা সঞ্চারিত হয়, রওশন হাত ছেড়ে দিয়ে আমাদের চোখ খুলতে বলে। টেবিলে পেসিল দেখে খুব খুশি হয় শওকত, এবং পেসিল নিয়ে বেরিয়ে যায়। রওশন আমার হাত ধরে বলে, 'বাড়ি গিয়ে দেখবে কী আছে, এখন কিন্তু দেখবে না।' না, আমি দেখবো না; আমার পকেটে এখন রয়েছে চিরকালের চরম বিশ্বয়, কোনো অস্তুব শূন্যোদ্যান বা শিয়ামিড বা তাজমহল; সবচেয়ে দামি মাণিক্য, পরশপাথর, যার ছোয়ায় আমার পকেট খেলা হয়ে যাচ্ছে, মাণিক্য হয়ে যাচ্ছে, তা দেখার জন্যে আমি যুগ্ম অপেক্ষা করতে পারি। একটি অস্তুত কাজ করে রওশন আজ; সে তার দু-মুঠোতে আমার হাতক পুজোর ফুলের মতো ধরে ওপরে উঠোতে থাকে, আমার হাত বিবশ হয়ে থাক্য, অজনিতে আমার হাত নিয়ে রওশন তার ঠোটে ছোয়ায়, ধীরেধীরে তার বুকের মাঝখানে কোমলতাবে ধরে রাখে। কোমলতা, কোমলতা, কোমলতা; আমার জগৎ কোমলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, আমি বোধ করতে থাকি দুটি কোমল গোলাকার ঝগড়ার গাঢ়মের মাঝখানে স্থাপিত রয়েছে আমার হাত, স্থাপিত রয়েছি আমি; আমার সঙ্গে ওই কোমলতা সহ্য করা অস্তুব হয়ে ওঠে, আমি ফেটে পড়তে থাকি, তেওঁ টুকরো টুকরো হয়ে যাই, আমি গলে যাই, আমি ঝরনা হয়ে বইতে থাকি। রওশন আমার হাত ছেড়ে দিলে আমি টেবিলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে আবার আমি হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকি।

আমার বয়স পনেরো, রওশনেরও পনেরো; পাঠ্যবইয়ের বাইরে আমি বেশি কিছু পড়তে পাই নি; বৰীন্দ্ৰনাথের অনেক কবিতা পড়েছি চয়নিকায়, তাঁৰ গল্পও পড়েছি; শৱৎচন্দ্ৰের চারপাঁচটি উপন্যাস পড়েছি; ওগুলো পড়ে আমার বুক সুখে ভরে গিয়েছিলো; রওশনের চিঠি পড়ার পর মনে হতে থাকে এ-পৰ্যন্ত আমি যা কিছু পড়েছি তা খুবই তুচ্ছ, খুবই বানানো; রওশনের মতো কখনো কেউ কিছু লিখতে পারে নি। রওশনের প্রতিটি শব্দ নতুন মনে হয় আমার, ওই সমস্ত শব্দ এর আগে কেউ কখনো ব্যবহার করে নি, রওশন আমার জন্যে নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছে, এবং প্রতিটি শব্দকে মধু মেঘ অমৃত চাদ শিশির পাথির পালক ঘুঘুর ডাক কোকিলের গান রজনীগঙ্গা শিউলি জ্যোৎস্না জলের শব্দে ভরে দিয়েছে। আমি রওশনের চিঠি পড়তে শুক করি, একনিশ্চাসে প'ড়ে ফেলি; লাল লাইন টানা কাগজে মাত্র একপাতা লিখেছে রওশন, হাজার পাতা লিখলেও আমার পড়তে একনিশ্চাসের বেশি লাগতো না। বারবার আমি

তার চিঠি পড়ি, একটু পরই আমার মুখস্থ হয়ে যায়; মাঝের ডাক শব্দে আমি রওশনের চিঠির ভাষা বুকের ভেতরে আবৃত্তি করতে করতে তাত বেতে নিচে নামি, খাওয়ার সময়ও বুকের ভেতর তার চিঠি আবৃত্তি করতে থাকি, আমার তয় করতে থাকে মা হয়তো আমার বুকের আবৃত্তি শব্দ শব্দে ফেলবে, খাওয়া শেষ করে টেবিলে ফিরে এসে আবার তার চিঠি মুখস্থ করি। আমি কোনো পরিগ্রহের পাতা পড়ছি, যেনো এইমাত্র একটি নতুন পরিগ্রহের পাতা আকাশ থেকে পড়েছে, এমন মনে হয় আমার; তার একটি অঙ্করও তুল পড়া যাবে না, একটি শব্দও তুল করা যাবে না, তাকে বুকের ভেতর এমনভাবে ধারণ করতে হবে যাতে জন্মেজন্মে অসংখ্য মৃত্যুর পরও কোনো তুল না হয়। আমার হৃৎপিণ্ড রওশনের চিঠি মুখস্থ করে, আমার রক্তকণিকারা রওশনের চিঠি মুখস্থ করে, আমার ওষ্ঠজিত রওশনের চিঠি মুখস্থ করে, আমার মাংস রওশনের চিঠি মুখস্থ করে; এবং তারা সবাই সম্মিলিতভাবে আমাকে ঘিরে শুই অলৌকিক শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকে; শুই অলৌকিক ধনিপুঞ্জে আমার সত্তা মুৰ হয়ে ওঠে।

কয়েক মাসে আমরা কয়েক শো চিঠি লিখি, হয়তো চার শো বা পাঁচ শো হবে, বেশিও হতে পারে। প্রথম আমরা প্রতিদিন একটি করেই চিঠি লিখি, কিন্তু তিনিটা দিন পর মনে হয় একটি চিঠিতে আমাদের প্রকাশ করা চাবে। এটা রওশনই প্রথম বোধ করে। আমি বিকেলে যাই রওশনদের বাড়ি, গিয়ে আমার চেয়ারটিতে বসি; শওকত ঘর থেকে বেরোলেই রওশন কোমর থেকে চিঠি ভরে করে আমাকে দেয়, আমি পকেটে রাখি; আর আমি পকেট থেকে বের করে রওশনকে দিই, সে তার কোমরে রেখে দেয়। একদিন ফিরে এসে দেখি রওশন তিনটি চিঠি লিখেছে। প্রথম চিঠিটি সে লেখে সকালবেলা, দুপুরেই তার বুকে অঙ্কে কথা জামে যায়, সকাল থেকে দুপুরকে এক বছরের থেকে বেশি দীর্ঘ মনে হয়, তাই দুপুরে দ্বিতীয় চিঠিটি লেখে, এবং বিকেল হ'তে না হ'তেই আরেকটি চিঠি লেখে, কেননা দুপুর থেকে বিকেল আরেক বছরের থেকে বেশি দীর্ঘ। তখন থেকে আমরা দিনে দুটি তিনটি চিঠি লিখতে থাকি, লিখতে লিখতে আমাদের হাতের লেখা খুব সুন্দর হয়ে ওঠে। সম্মোধনের একটি অন্তরঙ্গ সূত্র বের করি আমরা, যা আমাদের কোনো ব্যাকরণ বইতে নেই। রওশন আর আমি যখন একা, তখন আমরা বলি 'তুমি', যখন আমাদের পাশে কেউ থাকে, তখন বলি 'তুই', আর আমাদের চিঠিতে 'তুমি', ফিরে ফিরে আসে গানের মতো। প্রথম দিকে আমাদের চিঠি ছিলো হৃদয়ের, আমাদের হৃদয় গান গাইতে হাহাকার করতো চিঠি ভরে শ্বন্দ দেখতো অঙ্করে অঙ্করে; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের মাংস কথা বলতে শুরু করে। প্রথম কয়েক দিন আমি আমার শরীরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম সম্পূর্ণ আঘাত বা হৃদয়, আমার যে একটি শরীর আছে এটাই ছিলো আমার কাছে বিব্রতকর; কিন্তু রওশনই মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের দুজনেরই শারীর আছে। শুরু করে রওশনই, একটি চিঠির শেষে রওশন লেখে, 'তুমিই পান করবে আমার যৌবন সুধা।' আমি একথা প'ড়ে ভূমিকঙ্গের মতো কেপে উঠি; এর একটি শব্দও বুঝতে পারি না; তুমি, পান, আমার, যৌবন সুধা— প্রত্যেকটি শব্দকে আমার অচেনা মনে হয়, শব্দগুলো আমাকে মথিত করতে থাকে; আমি বুঝতে পারি না কাকে বলে পান করা,

আর কাকে বলে যৌবন সুধা; আমি শুধু রক্তে পদ্মার গর্জন শুনতে পাই। হঠাৎ আমার চোখের সামনে রওশনের শরীরটি তেসে ওঠে, তার শরীরটিকে একটি ধৰধৰে পানপাত্র বলে মনে হয়, আমি আর ভাবতে পারি না; আবার আমার চোখের সামনে তেসে ওঠে ধৰধৰে পানপাত্র ও রওশনের শরীর, ওই পানপাত্র আর ওই শরীর পরিপূর্ণ হয়ে আছে সুধায়, যৌবন সুধায়, আমি দু-হাতে ধ'রে ওই ধৰধৰে পাত্র থেকে সুধা পান করছি— ভাবতেই আমার সমস্ত শরীর জুড়ে রাশিরাশি বজ্রপাত হ'তে থাকে : আমি একবলকে রওশনকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখতে পাই ।

তবে আমি অমন অসভ্য হবো না, আমরা অমন অসভ্য হবো না; আমরা শুধু হাতে হাত রাখার বেশি কখনো কাউকে ছোবো না। অসভ্যরাই অমন করে। বিয়ে ক'রে অসভ্য মানুষেরা কী করে? একটি বই পড়েছি আমি, শুব নোংরা বই, না অমন নোংরা কাজ আমরা কখনো করবো না। আমরা যখন বিয়ে করবো তখন কি রওশন তোরবেলা গোসল করবে? রওশন যদি চায়, তাহলে তোরবেলা গোসল করবে, আমিও করবো'; দুজনে ঘুম থেকে উঠে একসাথে ঘাটে গিয়ে গোসল করবে~~স্মিতার~~ দিয়ে আমরা মাঝপুরুরে চ'লে যাবো, শাড়িতে জড়িয়ে গেলে আমি বলবলকে জড়িয়ে ধ'রে সাঁতরে ঘাটে নিয়ে আসবো, আমাদের শরীর থেকে কুয়াশা~~স্মিতা~~ থাকবে, সাবানের গন্ধ বেরোবে শরীর থেকে, রওশন তার শাড়িটা ঘাটে ফেল স্তুপ ক'রে রেখে আসবে, দূর থেকে ওটি দেখে আমার ভালো লাগবে; তার নাম পেড়ে শাড়ি যখন ডালিম গাছের নিচের তারে বাতাসে দুলবে, দেখে সুবে অস্ত্রার বুক ত'রে যাবে। কিন্তু আমরা তোরবেলা গোসল করবো কেনো? সরবরাত জেগে জেগে কথা বলতে বলতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বো বলে? নাকি নিয়ে~~ক্লান্ত~~ তোরবেলা গোসল করতে হয় ব'লে? না, ওই বইটায় যে-কথা লিখেছে~~সেজন্যে~~? আমরা অমন কাজ কখনো করবো না। কিন্তু রওশন যদি চায়? রওশন কি আতো খারাপ হবে? রওশনের সামনে আমি কখনো কাপড় বুলতেই পারবো না, আমার ভীষণ লজ্জা লাগবে; আমি কখনো রওশনকে উলঙ্গ দেখতে পারবো না। কিন্তু রওশন যে লিখেছে, 'তুমিই পান করবে আমার যৌবন সুধা', তা আমি পান করবো কীভাবে? কীভাবে রওশন আমাকে পান করতে দেবে তার যৌবন সুধা? যৌবন তো আসবে আমাদের দুজনেরই, এসে যাচ্ছে দুজনেরই, কিন্তু কোথায় জমছে কোথায় জমবে সুধা? রওশনের সুধা কোথায় জমবে? আমার হাতে আমি দুটি কোমল গন্ধমের ভয়কর কোমলতা অনুভব করি, যেখানে একদিন রওশন স্থাপন করেছিলো আমার হাত, সুধা কি জমবে সেখানে? তাহলে তো রওশনের অনেক সুধা জ'মে গেছে, সুধা তার বুক হয়ে ফুলে উঠেছে। আমি কি পান করবো ওই সুধা, ওই সুধা পান করবো আমি? আমি আর ভাবতে পারি না, আমার রক্ত এলোমেলো হয়ে যায় ।

কাদির ভাই আমাকে পছন্দ করছে না আজকাল, আমাকে দেখলে বিব্রত বোধ করছে, আমাকেও একটু বিব্রত করতে চাইছে। আগে আমাকে দেখলেই দাঁড়িয়ে কথা বলতো, আমি যে প্রবেশিকায় ইস্কুলের জন্যে গৌরব নিয়ে আসবো, যা আমাদের ইস্কুল কখনো পায় নি, তা আমি এনে দেবো, এমন কথা বলতো; এখন কাদির ভাই আমার

সাথে কথাই বলতে চায় না। বেশ মজা লাগছে আমার, তবে কাদির ভাইয়ের মজা লাগছে না, আমি বুঝতে পারি; তার চামড়া আর চামড়ার নিচের মাংস জুলছে ব'লেই মনে হচ্ছে। কাদির ভাই দু-বার আইএ ফেল ক'রে আমাদের পাশের ইঙ্গুলে পড়ায়; বিকেলে বাড়ি এসে পড়ায় রওশন আর শওকতকে। রওশনকে পড়ায় ব'লে সে গৌরব বোধ করে; আমাদের সাথে আগে যখন রওশনের কথা বলতো একটু গবই বোধ করতো, একটু কেঁপেও উঠতো। আমি যে আজকাল রওশনদের বাড়ি প্রত্যেক বিকেলে যাচ্ছি, এটা তার ভালো লাগছে না। সে জানে না এটা আমার আর রওশনের খুব ভালো লাগছে; আর এটা যে আমাদের খুব ভালো লাগছে জানলে তার আরো খারাপ লাগতো। আগে চারটাৰ মধ্যেই তার পড়ানো শেষ হয়ে যেতো, এখন সাড়ে চারটা বাজলেও শেষ হ'তে চাচ্ছে না, কোনো কোনো দিন পাঁচটা বেজে যাচ্ছে।

আমি একদিন সাড়ে চারটাৰ সময় পড়াৰ ঘৰে গিয়ে ঢুকতেই রওশন চেয়াৰ থেকে লাফিয়ে ওঠে, 'স্যার, সাড়ে চারটা বাজে, মাহবুব এসেছে, আৱ পড়বো না।' শওকতও তাই বলে।

'তোমার আৱো অনেক পড়া বাকি আছে', কাদির ভাই একটি খাতা দেখতে দেখতে বলে।

'না, এখনো সব দেখা হয় নি', কাদির ভাই মন দিয়ে খাতা দেখতে থাকে, এবং আমাকে বলে, 'মাহবুব, তুমি আজকাল পড়াশোনা কৱো না মনে হয়।'

আমি কোনো উত্তৰ দিই না, উত্তৰ দেয় রওশন; বলে, 'মাহবুবেৰ পড়াৰ আৱ কিছুই নেই, সব তো মাহবুবেৰ যথস্থী'।

'তুমি মাহবুবেৰ খবৰ কৈ ক'রে?' কাদির ভাই বলে।

'আমি মাহবুবেৰ সহিতেৰ রাখি', রওশন বলে, 'আপনি জিজ্ঞেস ক'রে দেবুন না, সব খবৰ ব'লে দেবো।' ব'লে রওশন আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আমিও হাসি।

তবু কাদির ভাইয়েৰ খাতা দেখা শেষ কৱাৰ কোনো লক্ষণ দেবা যায় না; সম্ভা হয়ে গেলেও খাতা দেখতে থাকবে মনে হয়। রওশন আমার দিকে তাকিয়ে হাসে, এবং বলে, 'স্যার, সেদিন আপনি দুটি অংশ তুল কৱিছিলেন।'

কাদির ভাই চমকে ওঠে, রওশন একটি খাতা বেৰ কৱে।

'স্যার, এ অংক দুটি তুল হয়েছে। মাহবুব নিচে শুক ক'রে দিয়েছে।' রওশন একবার আমার দিকে তাকিয়ে খাতাটি কাদির ভাইয়েৰ সামনে খুলে ধৰে। কাদির ভাই খাতাটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেৰ কৱা অংক দুটি পড়তে থাকে, পড়তে গিয়ে তুল কৱে, আবাৰ পড়াৰ চেষ্টা কৱে, নিচে আমার কৱা অংক দুটি পড়তে থাকে, শেষে নিজেৰ কৱা অংকেৰ তুল ধৰতে পেৰে বলতে থাকে, 'আইছা, ক্যামনে এই তুলটা হইল, আইছা ক্যামনে এই তুলটা হইল'-বলতে বলতে চেয়াৰ থেকে উঠে পড়ে। খুব বিপৰ্যস্ত হয়ে পড়েছে কাদির বাই; আমার দিকে তাকাতে পাৱছে না; প্রত্যেক দিন বেৰোনোৰ সময় সে একবার রওশনেৰ দিকে তাকায়, আজ রওশনেৰ দিকেও তাকাতে পাৱছে না। রওশন তাকে সালাম দেয়, কাদির ভাই কেঁপে কেঁপে ঘৰ থেকে বেৱিয়ে যায়, সাদে

শওকতগু; আর অমনি আমাদের বুক থেকে কলকল ক'রে হাসি বেরোয়, এবং আমাদের হাত একে অন্যকে ধ'রে সুখী হয়ে ওঠে। ওরা অনেকক্ষণ ধ'রে বড়ো কঠে ছিলো।

'জানো', রওশন তার চোখ দুটি আমার দু-চোখের ভেতরে বল্লমের মতো ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, 'কাদির স্যার আজকাল তোমাকে একদম দেখতে পারছে না।'

'আমি যে খুব খারাপ ছেলে, জেখাপড়া করি না, তাই', আমি হেসে বলি, আর মুঝ হয়ে তাকিয়ে থাকি রওশনের চোখের দিকে, তার ঠোটের দিকে। রওশন কী চমৎকারভাবে যে তার ঠোট নাড়ে, নিচের ঠোট ছোয়ায় ওপরের ঠোটের সাথে, আর দাঁত দিয়ে তার ঠোট কাটে!

'তুমি খুব খারাপ ছেলে হলে আমি খুব খারাপ যেয়ে,' রওশন হাসে, আর বলে, 'কাদির স্যারের আজ খুব শিক্ষা হলো।'

'এমনভাবে শিক্ষা না দিলেও পারতে', আমি বলি, 'গুরুজন তো।'

'না দিয়ে কী করি? প্রত্যেক দিন কাদির স্যার তোমার নিন্দা করে', রওশন বলে, 'তাই ঠিক করে রেখেছিলাম একদিন স্যারকে তুল অংক নিন্দা দেখাবো। তুল ইংরেজিটা তো বাকিই রইলো।' রওশন হাসে, আর আমার দিকে চোখ দুটি ছির করে বলে, 'তোমাকে কেউ নিন্দা করলে আমার একদম জালোলাগে না, কান্না পায়। আমাকে কেউ নিন্দা করলে তোমার ভালো লাগে, বলো।'

'না, লাগে না, কোনো দিন লাগাবেন্না', আমি বলি।

'তোমাকে নিয়ে আমি কতো স্বপ্ন সোবি', রওশন বলে, 'আমাকে নিয়ে কি তুমি স্বপ্ন দেবো?'

'দেবি, দিনরাত স্বপ্ন দেবি, আমি বলি।

'তুমি দূরে চলে যাইছোভাবলে আমার কান্না পায়', রওশন বলে; এবং আমার দু-হাতের মুঠো তার মুঠোর ভেতরে নিয়ে তার দু-চোখের ওপর চেপে ধরে; রওশনের দীর্ঘশ্বাসে আমার হাত দুটি কোমল হয়ে ওঠে।

আমি শিউরে উঠে দেবি রওশনের চোখের জন্মে আর দীর্ঘশ্বাসে আমার আঙুল ভিজে গেছে। রওশনের মুখের দিকে তাকাই আমি; আগে কখনো যা দেবি নি সে-অসম্ভব সুন্দরকে দেখতে পাই রওশনের চোখে। অশ্রু। শব্দটি আমি জানি; কিন্তু এর সৌন্দর্য আমি কখনো দেবি নি; রওশনের চোখের কোনায় যে-সৌন্দর্য টলমল করে, যা একটি বিন্দু কিন্তু যা মহাসাগরের থেকেও বিশাল, তা-ই অশ্রু। রওশন দৃঢ়ে পাছে, ওই দৃঢ়ে রওশন সুন্দর হয়ে উঠেছে, আমি মুঝ হয়ে তাকিয়ে থাকি তার মুখের দিকে, সুন্দর দৃঢ়ের দিকে। এতো দিন আমি রওশনের হাসি দেখেছি, তার ঝিলিকে আমার হৃদয় ভরে গেছে, রওশনকে সুন্দর লেগেছে; কিন্তু আজ দেখছি তিনি সৌন্দর্য, যা অশ্রুতে সাজানো; এতো সুন্দর আর কখনো লাগে নি রওশনকে। দৃঢ়খকে আমার সুন্দর মনে হয়, আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। এক সময় মনে হয় রওশন নিজেই একটি অশ্রুবিন্দু হয়ে গেছে, আমার পাশে টলমল করে কাঁপছে, এখনই গলে কাঠের পাটাতনের ওপর মিশে যাবে, আমি তাকে কোথাও বুজে পাবো না।

‘আমি কখনো দূরে যাবো না,’ আমি বলি।

‘তুমি চলে যাবে, আমি জানি, তুমি চলে যাবে,’ রওশন বলে, ‘আর কয়েক মাস
মাত্র। তখন আমাকে তুলে যাবে।’

‘কখনো দূরে যাবো না, তোমাকে কখনো তুলবো না’, আমি বলি; আমার মুঠোতে
রওশনের হাত কাপতে থাকে।

‘তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, বাঁচার ইচ্ছে হবে না’, রওশন বলে, ‘তুমই
আমার সব।’

আমি রওশনের ঘুঁথের দিকে তাকাই, তার মুখটি আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না,
সে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছি তার ঠোট কাপছে। আমরা দুজন একই
বয়সের, কিন্তু এখন রওশন যেভাবে আমার ঘুঁটো ধরে আছে, যেভাবে আমার দিকে
তাকাচ্ছে, ঠোট কাপছে, তাতে রওশনকে মনে হচ্ছে নারী, নিজেকে মনে হচ্ছে পুরুষ।
বাড়ি ফেরার সময় এ-অনুভূতি আমাকে আলোড়িত করে তোলে, মনে হতে থাকে আমি
পুরুষ, আমি রওশনের সব, রওশন আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। সিজেকে আমার কেন্দ্র
মনে হয়; রওশন আমাকে কেন্দ্র করেই ঘূরছে, আমাকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে।
এখন থেকে আমি রওশনকে হাসাতে পারি, আমি চাউলে সে রৌদ্রের মতো ঝিলিক
দিয়ে উঠবে; আমি রওশনকে কাঁদাতে পারি, আমি চাউলে সে শ্রাবণের মতো কাঁদবে।
নিজেকে পুরুষ ভেবে একটা বিশ্বায়কর স্বর আমি বোধ করি। রওশনের চোখের জল
আমার চোখে সুন্দর লেগেছে, তার আঙুল চোখে জল দেখতে আমার ইচ্ছে হয়,
আগামীকালও তার চোখের জল আমার দেখতে ইচ্ছে হয়। কীভাবে দেখবো?
আগামীকাল আমি রওশনদের কাড়ি যাবো না; রওশন নিচয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা
করবে, অপেক্ষা করে কষ্টে রওশনের বুক ভরে যাবে, তার কান্না পাবে, তার চোখ
জলে ভরে উঠবে। পরের দিন বিকেলে আমি যাবো, দেখবো রওশনের চোখে জল।
কিন্তু আগামীকাল রওশনকে না দেখে থাকতে আমার কষ্ট হবে, তার হাত না ছুলে
আমার কষ্ট হবে; আগামীকাল আমি রওশনদের বাড়ি যাবো, পরে যখন রওশনের
চোখের জল দেখতে ইচ্ছে হবে, তখন এক বিকেলে যাবো না; আমার কথা ভেবে
ভেবে কষ্টে রওশনের বুক ভরে যাবে। রওশন, আমার জন্যে অপেক্ষা-করে থাকা
অশ্রুবিন্দু; রওশন, আমার জন্যে বুক ভরে ওঠা দীর্ঘশ্বাস; রওশন, আমার জন্যে টলমল
করা সুন্দর দুঃখ।

রওশন আমাকে সৃষ্টি করে চলছে; প্রত্যেক বিকেলে রওশনের সাথে দেখা হওয়ার
পরই আমি বদলে যাচ্ছি একটু একটু করে; রওশন আমাকে যেমন দেখতে চায় আমি
তেমন হয়ে উঠছি; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষটি হয়ে উঠছি আমি, রওশন আমাকে তা-ই
দেখতে চায় বলে। আমি যে পুরুষ, এটা আমার মনে আসে নি; রওশনই আমাকে মনে
করিয়ে দিয়েছে, আমার ভেতরে একটি সিংহকে জাগিয়ে দিয়েছে রওশন। আগে যখন
আমরা ‘তুই’ বলতাম, তখন সমান ছিলাম দূজনেই; কিন্তু ‘তুমি’ বলার পর থেকে
রওশনই একটু একটু করে আমাকে তার থেকে ওপরে উঠিয়ে দিচ্ছে, আমাকে

সিংহাসনে বসাচ্ছে, সে বসছে সিংহাসনের পাশে যেবের ওপর। সিংহাসনে তার বসার কোনো ইচ্ছে নেই, যেনো সে বসেও সুব পাবে না; আমাকে বসাতে পারলেই বেশি সুব পাবে। রওশন কথায় কথায় বলে, তুমি তো ছেলে, তুমি তো পুরুষ'; তাই আমি সব পারি, সব আমার পারা উচিত; রওশন চায় বলেই আমার পারা উচিত বলে আমার মনে হয়। রওশনের কথায় আমি গর্ব বোধ করি। একদিন আমার হঠাত মনে হয় রওশন সব সময় আমার পাশে দাঁড়িয়েই থাকে; আমি চেয়ারে বসে থাকি, রওশন দরোজার পাশে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে না। রওশনের দাঁড়িয়ে থাকার একটি সুবিধা হচ্ছে আমরা যে হাত ধরে আছি সেটা কেউ দেখতে পায় না উঠোন থেকে; কিন্তু আমি অন্য চেয়ারে গিয়েও দেখেছি, রওশন দাঁড়িয়েই থাকে, খুব দরকার না হলৈ বসে না।

‘রওশন, তুমি বসো’, আমি বলি।

‘না, তোমার পাশে আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই তালো লাগে’, রওশন বলে।

তুনে আমার তালো লাগে, এবং আমি জানতে চাই, ‘কেনো?’

রওশন হাসে আর হাসে, আমার আঙুল নিয়ে বেলে, অন্ত বলে, ‘তা বলবো না, তা বলবো না।’

তুনে আমার আরো তালো লাগে, অন্তত একজন আছে, তার নাম রওশন, যার তালো লাগে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

আমি বলি, রওশনকে একটু কষ্ট দেবার জন্যেই বলি, ‘যদি না বলো, তাহলে আর আসবো না।’

রওশনের চোখে অশ্রুর সৌন্দর্য দেখা দেয়, আমি মুক্ষ হয়ে চেয়ে থাকি।

রওশন বলে, ‘তুমি পুরুষ, তাই এতো নিষ্ঠুর কথা বলতে পারলে, আমি কখনো বলতে পারবো না।’

আমি পুরুষ, আমার মনে হতে থাকে, রওশনের থেকে আমার স্থান উঁচুতে; আমি নিষ্ঠুর হতে পারি, রওশন পারে না; নিষ্ঠুরতাকে গৌরবের বলে মনে হয় আমার। আমি পুরুষ, নিষ্ঠুর হবো; রওশন নারী, অশ্রু হবে।

রওশন আমার বুকের সিংহকে আরো জাগিয়ে দেয়; বলে, ‘তোমাকে নিয়ে আমি কতো গর্ববোধ করি! তোমাকে নিয়ে আমার কতো স্বপ্ন!’

তুনে আমার বুক স্ফীত হয়ে ওঠে, গর্বে আমি পুরুষ হয়ে উঠি। আমাকে নিয়ে রওশন গর্ব বোধ করে, এটা আমার গর্ব। আমি কি গর্ববোধ করি রওশনকে নিয়ে? হ্যা, আমিও একরকম গর্ববোধ করি রওশনকে নিয়ে, সেটা হচ্ছে রওশন আমাকে তালোবাসে, আর কাউকে বাসে না; রওশন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, আর কারো জন্যে করে না; আমার মাথায় একটি মুকুট আছে, রওশনকে আমার মুকুটের সবচেয়ে দামি মাণিক্য বলে মনে হয়। বঙ্গুরা আজকাল আমাকে খুব বেশি সৈর্বা করছে; আমি যে প্রথম হই, সবাই জানে খুব ভালো করবো প্রবেশিকায়, কোনো অংক আমার তুল হয় না, ইংরেজি বাঙ্গলা সব আমার মুখস্থ, ব্যাডমিন্টনও আমি খুব ভালো খেলি, এজন্যে ওরা সৈর্বা করে না; সৈর্বা করে এজন্যে যে রওশন, যে সবচেয়ে রূপসী বলে বিখ্যাত আমাদের গ্রামে, তার সাথে আমার বিকলে দেখা হয়, ওরা বুঝতে পারে

রওশন আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। ওরা আমার কাছে জানতে চায় রওশন
আসলেই কতোটা সুন্দর, দূর থেকে তাকে যতো সুন্দর মনে হয় রওশন কি ততোটা
সুন্দর? ওরা যে-সুন্দরের কাছে কখনো যেতে পারে নি, যার কাছে একবার যেতে
পারলে ওরা আর কিছু চাইতো না মনে হয়, তার কাছে আমি প্রতি বিকেলে যাই, এর
জন্যে আমাকে ওরা সৈর্বা করছে, আমি এটা উপভোগ করি। রওশন যে আমাকে
তালোবাসে আর আমি যে ভালোবাসি রওশনকে, একথা আমি ওদের বলি না, কখনো
বলবো না; কিন্তু ওদের সৈর্বায় আমি গর্ববোধ করি, রওশন আমাকে এ-গর্বের অধিকার
দিয়েছে। আর রওশন আমাকে দিয়েছে জয় করার অভিলাষ। রওশন আমাকে নিয়ে
গর্ববোধ করে, তার গর্ব আমার রক্ষা করতে হবে; তাই আমি ওই বিকেলের সময়টুকু
ছাড়া বই ছেড়ে উঠি না। রওশন আমাকে নিয়ে গর্ববোধ না করলে আমি এতো পড়তাম
না, পড়ছি আমি রওশনের জন্যে, সে যেনো আমাকে নিয়ে গর্ব বোধ করে, চিরকাল
গর্ববোধ করে, তাই আমি পড়ি, পড়ে আমি সুব পাই। আগেও আমি পড়েছি, কিন্তু
এতো সুব পাই নি; পড়া আমার জন্যে আনন্দ হয়ে উঠেছে, রওশনের জন্যে; ফিরে
ফিরে পড়া সুব হয়ে উঠেছে আমার, রওশনের জন্যে, আমি প্রতিটি অক্ষরে রওশনের
মুখ দেখতে পাই, প্রতিটি অক্ষরে দেখতে পাই রওশন আমাকে নিয়ে গর্ববোধ করছে।
রওশন আমাকে সৃষ্টি করে চলছে, রওশন আমাকে ধূক্ষণ করে চলছে।

বিকেলে রওশনদের বাড়ি যাই, রওশনের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না।
রওশন তার চিঠিগুলো আমার হাতে দেয়, আমি কোনো চিঠি দিতে পারি না।

‘ଆମାରଗୁଲୋ?’ ରଓଶନ ଅବାକ ଆର ଆହୁତ ହେଁ ବଲେ ।

‘লিখতে পারি নি’, আমি ঘাথা নিচ করে বলি।

'কেনো পারো নি?' রওশন খুব দুঃখ পায়, আর বলে, 'আমাকে তুমি তধু কষ্ট দিতে ভালোবাসো।'

'না, তা নয়', আমি বলি, 'আমি বুঝতে পারি নি...।'

রওশন দু-হাতে আমার মুখ ধ'রে বলে, 'আমি জানতে চাই, চাই, চাই, কেমন লাগে তোমার আমার মুখ, আমার চোখ, আমার...।'

এমন সময় শওকত এসে ঢেকে, আমি মুক্তি পাই।

'কালকে আমরা কান্দিপাড়া বেড়াতে যাচ্ছি', শওকত হাসতে হাসতে বলে, 'কালকে কিন্তু রওশন মাহবুবকে দেখতে পাবে না।'

'আমি যাবো না', রওশন বলে; আমার দিকে কোমলভাবে তাকায়।

'কেনো যাবে না?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমার ইচ্ছে', রওশন বলে, 'কান্দিপাড়া কী আছে দেখার?'

'নদী আছে খাল আছে ইলিশ আছে', শওকত হাসে, 'কিন্তু মাহবুব নেই।'

'ঠিক আছে', রওশন বলে, 'তাহলে মনে করো সেজন্মেই আমি যাবো না।'

রওশন চিরুকে আঙুল রেখে চুপ ক'রে থাকে, যেনো সে আর কথা বলবে না; তার চুপ ক'রে থাকার ভঙ্গি দেখে তাকে আমার জানিয়ে আর ইচ্ছে হয়, তার চিরুকে আমার নাক ঘষার ইচ্ছে হয়। রওশন ব্যথা পাচ্ছে, কিন্তু আমার বুক সুখে ভ'রে ওঠে; রওশন বেড়াতে যাবে না, আমার জন্মেই যাবে না; কান্দিপাড়া দেখার কিছু নেই আমি সেখানে নেই ব'লে। রওশন যদি কথাটি পুরু চুপেচুপে আমাকে বলতো, তাহলেই আমার রক্ত মধু হয়ে উঠতো, বাঁশি ধাইতে থাকতো আমার সমস্ত নদীর পারে আর কাশবনে, কিন্তু রওশন চুপেচুপে বলেননি, শওকতকে শুনিয়ে বলেছে, সারা পৃথিবীকে রওশন জানিয়ে দিয়েছে সে কান্দিপাড়া বেড়াতে যাবে না, কেননা সেখানে আমি নেই। আমার ইচ্ছে হচ্ছে বাইরে যাবে আমি বস্তুদের ডেকে জানিয়ে দিই যে রওশন কান্দিপাড়া বেড়াতে যাবে না, কেননা সেখানে দেখার কিছু নেই, কেননা সেখানে আমি নেই। চঞ্চলভাবে ঘর থেকে আমার ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, কিন্তু আমি বেরোতে পারি না।

শওকত বেরিয়ে যেতেই রওশন আমার হাত ধরে। আমিও ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আজ রওশনের হাত আমিহি প্রথম ধরবো, অভিমানে রওশন হয়তো আমার হাত ধরবে না। বিষণ্ণ চাঁদের মতো তার মুখ আমার দিকে তুলে ধ'রে রওশন বলে, 'আজ তোমাকে একটি শান্তি পেতে হবে।'

'বুব কঠিন শান্তি? আমি জানতে তাই।'

'তোমার জন্যে কঠিনই', রওশন বলে, 'রওশন আমার দুটি হাতই তুলে নিয়েছে তার হাতে।'

'আমি তৈরি', আমি হাসি আর বলি, 'দাও, শান্তি দাও, বুব কঠিন শান্তি দিয়ো, তারপর ক্ষমা কোরো।'

'সঙ্ক্ষ্যা হ'লেই', রওশন বলে, 'তুমি আজ বাড়ি যেতে পারবে না, আমার সাথে সঙ্ক্ষ্যার পরও অনেকক্ষণ তুমি থাকবে। সঙ্ক্ষ্যার পরও আমি তোমাকে দেখতে চাই,

তোমার মুখ দেখতে চাই, তোমার কথা জনতে চাই।' রওশন একটু থেমে বলে, 'আর সঙ্গ্যার পরও তুমি আমাকে দেবো, আমি চাই।'

রওশন আমার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকতারার মতো জুলতে থাকে, তার চোখ থেকে মুখ থেকে আলো না শিশির না কী যে ঝরতে থাকে, আমি তা বুঝতে পাবি না; আমার উধু ইচ্ছে করে রওশনের চোখ আর মুখ থেকে যা খ'রে পড়ছে, যার নাম আমি কোনো দিন জানবো না, তার সবটুকু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্যে খ'রে রাখতে। রওশনের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, আমার রক্তমাংস সবুজ কোমল ঘাস হয়ে মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

শওকত ফিরে এলেই রওশন বলে, 'জানো, একটি সুসংবাদ আছে, সঙ্গ্যার পর মাহবুব আমাদের সাথে থাকবে।' রওশন এমনভাবে বলে যেনো শওকত এ-সংবাদ শোনার জন্যে বছরের পর বছর অপেক্ষা ক'রে আছে।

শওকত হেসে বলে, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মাহবুব সারারাত থাকবে না।'

'তুমি বেশি দুষ্ট হয়ে যাচ্ছো', রওশন রেগে ওঠে, তার মুগ থেকে বোরা যায় সাতিয়ই কষ্ট পাবে একজন; তখন কী সুন্দর যে লাগে রওশনকে।

সঙ্গ্যার পর ঘরটিতে আমরা তিনজন। চারপাশে অক্কার, ঘরে ঢালের ওপর নারকেলপাতার শব্দ হচ্ছে মাঝেমাঝে, শিরশিরে বাতাস চুকছে কাঠালপাতার ভেতর দিয়ে। রওশনের আকৰা একবার উকি দেন: আমাকে দেবে তিনি খুশি হন, জানালাগুলো লাগাতে লাগাতে বলেন, 'ওঁজের একটু দেখিয়ে দিয়ো তো।' বাইরে শীতের বাতাস, কিন্তু ভেতরে আমরা, রওশন আর আমি, উষ্ণ হয়ে আছি। আমার ডান পায়ের পাতার ওপর রওশনের বাঁশের পাতা, রওশনের ডান পায়ের পাতার ওপর আমার বাঁশের পাতা। মনে হচ্ছে কনকনে শীতের মধ্যে আমরা কোনো চুল্লির পাশে ব'সে আছি। আমরা এবে সন্ধের জন্যে শীতের আগুন, একজনের আগুন পোহাছিছি আরেকজন, আমাদের কোনো শীত লাগছে না। রওশন টেবিলের নিচ দিয়ে তার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছে, উষ্ণ কোমল দুধের পেয়ালার মতো রওশনের হাত, আমাদের পৃথিবীতে কোনো শীত নেই।

শওকত ডান দিকের চেয়ারে চাদর গায়ে দিয়ে একটু একটু কাঁপছে; আর জানতে চাইছে, 'তোমাদের শীত লাগে না?'

'কেনো, এটা শীতকাল নাকি?' আমি হাসতে হাসতে বলি।

'না, এটা গরমকাল', শওকত বলে, 'মাহবুবের আর রওশনের জন্যে।'

রওশন নিজের চাদরটা শওকতের গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে, 'আমার গরম লাগছে, শওকত, তুমি এটিও গায়ে দাও।'

শওকত রওশনের চাদরটি ফিরিয়ে দেয়, রওশন সেটি চেয়ারের পাশে রাখে, আমরা সবাই হাসতে থাকি। হারিকেনের আলোতে টেবিলের ওই পারে রওশনকে ধানখেতের ওপারে আখখেতের ওপরে শিমুল ডালের পাশে পৌষ্ঠের চাঁদের মতো মনে হয়। আজ আমি আমার টেবিলে পড়তে বসি নি, আমার সামনে কোনো টেস্টপেপার নেই মেইড ইজি নেই একের তেতরে পাঁচ নেই অভিজ্ঞ হেডম্যাস্টার নেই; আমার

চোখের সামনে রয়েছে রওশন, যে সব বইয়ের খেকে তালো, যার মুখে নাকে গালে চুলে ঠোটে আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পড়ছি, সব অংকের সমাধান পাচ্ছি, পৃথিবীর সব ভাব সম্প্রসারিত দেখছি। কানের পাশ দিয়ে জুলপির মতো একগুচ্ছ চুল ঝুলে আছে রওশনের, মাঝেমাঝে রওশন আঙুলে জড়াচ্ছে ওই চুল, দাঁত দিয়ে কাটছে, তার ঠোট বেঁকে যাচ্ছে, আমার দিকে স্থির ক'রে রাখছে তার প্রদীপের মতো চোখ দুটি, আড়িয়ল বিলের উত্তরে যেমন আকাশপ্রদীপ জুলে। আজ সন্ধ্যায় আমি যতো পড়ছি, যতো প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করছি, ততো আর কখনো করি নি।

রওশন বলে, 'রাতে তুমি দেখতে অন্য রকম।'

শওকত সাথে সাথে বলে, 'হ্যাঁ, চাঁদের মতোন' একটু খেয়ে বলে, 'এবার তুমি বলো রওশন রাতে দেখতে কেমন, শোনার জন্যে কিন্তু ইনি পাগল হয়ে আছেন।'

রওশন রেগে ওঠে, 'না, আমি তুনতে চাই না।' রওশন একটি কাগজে কী যেনো লিখে আমার হাতে দেয়, তাতে লেখা আছে : 'আসলে আমি তুনতে চাই আমি রাতে দেখতে কেমন?'

আমি কাগজটি উল্টো পিঠে লিখি : 'চাঁদের আলোর মতো।'

রওশন কাগজটি প'ড়ে হাতে তাঁজ ক'রে রেঁপে যান, 'আমার কবরে একথাটি লেখা থাকবে।'

শওকত বলে, 'এতো শিগগিরই কবরে কথা!

আমরা সবাই দুপ ক'রে থাকি কিছুক্ষণ; যেনো কোনো প্রিয়জনের জন্যে নীরবতা পালন করি। রওশন নীরবতা থেকে উত্তীর্ণ করে আমাদের।

রওশন বলে, তোমার চাদরটি দেখতে খুব সুন্দর, আমার গায়ে দিতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'গায়ে দিয়ে দেখো না', আমি বলি, 'তবে চাদরটা খুব খারাপ'; এবং পেছন থেকে চাদরটি তুলে রওশনের হাতে দিই; রওশন চাদরের নিচে আমার হাত ধ'রে থাকে। রওশন চাদরটি গায়ে জড়ায়, চাদরে গাল ঘষে হাত ঘষে, আর বলে, 'তোমার চাদরে মিষ্টি গন্ধ।'

শওকত বলে, 'তিক্কত পাউডারের গন্ধ, মাহবুব তিক্কত পাউডার মাখে।'

'ওটা আসলে চাঁদের গন্ধ', আমি হাসতে থাকি, 'মাঝেমাঝে চাদর গায়ে দিয়ে আমি চাঁদে বেড়াতে যাই।'

'আমাকে নাও না কেনো? রওশন মধুর হাসিতে টেবিল ভরিয়ে দেয়।

'ভানা আছে তোমার, রওশন?' আমি জিজ্ঞেস করি, বলি, 'চাঁদে যেতে লাখ লাখ ডানা দরকার।'

'তোমার তো আছে', রওশন বলে, 'আমাকে তো অন্তত কয়েকটি ধার দিতে পারো। বলো দেবে?' আমার চোখের হাজার হাজার মাইল তেতরে তাকায় রওশন, তাতে আমার চোখ স্বিন্দ্র হয়ে ওঠে।

আমি ওধু টেবিলের নিচে রওশনের হাত আরো কোমল আরো উষ্ণ আরো কোমলভাবে ঘুঁটোর তেতরে জড়িয়ে ধরি।

রওশনের হঠাৎ মনে হয় আমার শীত লাগছে, আমি অবাক হই; আমার শীত লাগছিলো না, আমি তো তকনো খড়ের মতো জুলছিলাম, আমার শীত লাগতে পারে না; তবে আমার শীত লাগছে কি লাগছে না এটা আমার পক্ষে বোৰা হয়তো সম্ভব নয়, বুঝতে পারে শুধু রওশন; তাই রওশন যখন বলে, ‘তোমার শীত লাগছে’, তখন সত্ত্বই আমার শীত লাগতে থাকে। আমি রওশনের দিকে তাকাই, রওশন বুঝতে পারে আমার শীত লাগছে।

রওশন আবার বলে, ‘তোমার শীত লাগছে; আমার চাদরটি তুমি গায়ে দাও।’

আমি একটু বিব্রত বোধ করি, শওকত অবাক হয়ে তাকায় আমাদের দিকে। রওশন চেয়ার ছেড়ে উঠে তার চাদরটি আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়, জড়ানোর সময় আমার শ্রীবা নরমতাবে ছোয়, তাতে আমার শরীর থেকে সব শীত দূর হয়ে যায়। এ-শ্রীবায় আর কোনো দিন শীত লাগবে না। চাদর জড়িয়ে দিয়ে রওশন চেয়ারে গিয়ে ব'সে টেবিলের ওপর চিবুক টেকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতে আমাকে কেমন দেখায় রওশন তা চোখ ভ'রে দেবছে।

শওকত বলে, ‘এবার তুমি বলো রওশনের চাদরে কেমন গন্ধ।’

আমি রওশনের দিকে তাকাই। রওশন বলে, ‘শওকত যখন জানতেই চায়, বলোই না, নইলে ও কষ্ট পাবে।’

আমি বলি, ‘রওশনের চাদরে চাদরে আলোর গন্ধ।’

রওশন টেবিলের নিচে তার মুঝের আমার মুঠো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে। চাদের আলোর গন্ধে আমার বুক ছেঁকে যায়, আমার মাংসের বাগানে কোটি কোটি রঞ্জনীগন্ধ ফুটতে থাকে।

শওকত হ্যারিকেন টিকে খেলতে শুরু করেছে, আলো বাড়াচ্ছে আবার কমাচ্ছে; তাতে রওশনকে আরো সুজ্জির লাগছে, মনে হচ্ছে সব আলো নিভে গেলে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে রওশন। শওকত আলো বাড়াচ্ছে, কমাচ্ছে, খুব মজা পাচ্ছে; আলো কমাতে গিয়ে হঠাৎ হ্যারিকেন নিভে যায়।

‘যাও, এবার নিজে হ্যারিকেন ধরিয়ে আনো’, রওশন বলে। শওকত দুজনের দিকে তাকিয়ে হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে যায়।

শওকত বেরিয়ে যেতেই আন্তে রওশন বলে, ‘এই, তুমি এদিকে আসো তো একটু।’

আমি দাঢ়াই, চেয়ার পেছনের দিকে ঠেলে পা বাড়াই, কিন্তু পা বাড়াতে পারি না; রওশন না এক স্বপ্ন যেনো দু-হাতে সারা শরীরে জড়িয়ে ধরে আমাকে।

‘আমাকেও ধরো’, রওশন আন্তে বলে; আমি জড়িয়ে ধরি রওশনকে। স্বপ্নকে এই প্রথম আমি বাহুর ভেতরে পাই।

রওশন আমার গালে গাল ঘষে, একবাশ কোঘল পালকের মতো চুল আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে দেয়, এবং ‘তুমি কাল দুপুরেই আসবে’ ব'লেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে।

আমি, খ'সে-পড়া এক পালক, চেয়ারে বসি আবার, আমরা কোনো কথা বলতে পারি না; যে-অসম্ভব কোমলতার ভেতর কিছুক্ষণ আগে আমার শরীরটি গিয়ে পড়েছিলো, আমি সেখান থেকে উঠে আসতে পারি না, আমি আরো কোমলতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকি। এতো দিন ধ'রে যে-পৃথিবীতে বেঁচে আছি আমি, সেটিকে স্পর্শ করতে গিয়ে আমার কঠিনতার বোধই হয়েছে সাধারণত; কোমলতা যা বোধ করেছি তা আমাকে জলের, মেঘের, তুলোর, ফুলের বোধের বেশি কোনো বোধ দেয় নি; রওশনের হাত ছোঁয়ার পর আমার তুক বুকোছে আরো এক কোমলতা আছে পৃথিবীতে, কিন্তু আজ আমি পরম কোমলতাকে পাই বাহুর ভেতরে বুকের ভেতরে। আমার বুক গ'লে যায়, আমি এখন আর রওশনকে জড়িয়ে ধ'রে নেই, কিন্তু আমি আমার পৌজারে তাল তাল কোমলতা বোধ করছি, রওশন যে আর আর আর আমার আমার আমার আমার আমার আমার কথা নিবেছিমো, সে-দুটির কোমলতা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, পৃথিবীর সব গন্ধরাজ সব গোলাপ সব পালক আমার বুকে জড়ো হ'লেও এ-কোমলতাকে পাবো না আমি। এ-কোমলতা হচ্ছে রওশন। শতকত হ্যারিকেন নিয়ে ফিরে আসে, আলোতে আমি রওশনকে চিনতে পারি না, রওশনও হয়তো চিনতে পারে না আমাকে।

বেশ রাত হয়েছে, এবার আমি উঠি। রওশন আমার সাথে নারকেল গাছ পর্যন্ত আসে। রওশনদের চাকর বারেক, যে আমার থেকে দশ বছরের বড়ো হবে, হ্যারিকেন নিয়ে চলে আমার সাথে আমাকে বাড়ি পৌছে দেবার জন্যে। আমি ডুবে আছি রওশনের বাহুর মধ্যে বুকের মধ্যে তাল তাল কোমলতার মধ্যে আমি স্বপ্নের সবুজ ঘাসের প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নাঙ্ক বালকের মতো হাসিছি।

বারেক বলে, ‘মাহবুব ভাই, আপনে একটা মাখনের মতন বউ পাইবেন।’

আমি কোনো কথা বলি না।

বারেক আবার বলে, ‘রওশন আফা আপনার লিগা পাগল, সারা দিন পত চাইয়া থাকে। আপনে এমূল একটা বউ পাইবেন যা দুইন্নাইতে আর অয না।’

আমি কোনো কথা বলি না, বারেককে খামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় না, বরং ঝুব তালো লাগে বারেকের কথা। আমি চুপ ক'রে থকি; নইলে, আমার তয় হয়, বারেক হয়তো বুঝে ফেলবে যে আমি মাখনের মধ্যে ডুবে আছি।

বাসায় ফিরে রাতে আমি রওশনের কোমলতা বোধ করি, পানি পান করতে গিয়ে পানিতে আমি বোধ করি রওশনের কোমলতা, বই খুলতে গিয়ে বোধ করি ওই কোমলতা। আমি যদি এখন লোহা ছুই, যদি আমার বুকে এসে লাগে কোনো পর্বত থেকে ছুটে আসা প্রকাণ পাথরখণ্ড, তাহলেও আমি কোমলতা বোধ করবো। রওশন কীভাবে উঠে এসেছে চেয়ার থেকে আমি দেখি নি, কীভাবে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে আমি দেখি নি; আমাকে জড়িয়ে ধরার সময় তার মুখ কেমন দেখিয়েছে, ঠোট বেঁকেছে কেমনভাবে, তাও আমি দেখি নি; আমি আজ সন্ধ্যায় রওশনকে দেখেছি শুধু আমার তুক আর নাসিকা দিয়ে। কোমলতা আর সুগন্ধ আমাকে ঢেকে ফেলেছে। রওশনের মাংস থেকে যে-গন্ধ আমার ভেতরে ঢুকেছে, আমি তার পরিচয় জানি না; ওই গন্ধ হয়তো হরিগের হয়তো বকুলের হয়তো ঘাসের হয়তো আগন্তের হয়তো মেঘের হয়তো

জ্যোৎস্নার হয়তো রক্তের, আমি জানি না, আমি কোনো দিন জানবো না। আমি বই
খুলে বসি, জানালা দিয়ে নারকেল গাছ আর আকাশের দিকে তাকাই, কুয়াশা নেমে
আসছে দেখতে পাই, আমার শরীর আমার পাঁজর তাল তাল কোমলতায় ঢেকে যেতে
থাকে।

রওশন যদি বেড়াতে গিয়ে থাকে? রওশনকে কি একা বাড়িতে রেখে যাবে
রওশনের মা-বাবা? কি ব'লে রওশন বেড়াতে না গিয়ে বাড়িতে থাকবে? সকাল
থেকেই এসব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে আমার মনে। পড়তে তালো লাগছে, পড়তে পড়তে
রওশনকে ভাবতে সুব লাগছে। রওশন যদি বেড়াতে না গিয়ে থাকে, কী করছে তাহলে
রওশন? বই পড়ছে? আমার কথা ভাবছে? টিটি লিখছে? যদি বেড়াতে গিয়ে থাকে,
তাহলে কী করছে? আমার কথা ভাবছে? যদি রওশন বেড়াতে গিয়ে থাকে তাহলে
রওশন কি হাঁটতে পারছে? তার পা কি নদীপারের বালুতে আটকে ঘাচ্ছে না,? না,
রওশন বেড়াতে যেতে পারে না; রওশন বলেছে সে বেড়াতে যাবে না, তাই রওশন
বেড়াতে যাবে না। আমার জন্মেই যাবে না; আমি কান্দিপড়ান নেই, আমি যেখানে
নেই রওশন সেখানে কেনো যাবে! সেখানে রওশনের কী মুসু? আজ যদি আমাদের
বাড়ির সবাই বেড়াতে যেতো, তাহলে আমি কি যেতোয় যেতাম না, সামনে আমার
পরীক্ষা আছে ব'লে? সেজন্মে নয়, আমি যেতাম, না, কারণ সেখানে রওশন নেই।
তবে আমি ছেলে, আর সামনে আমার পরীক্ষা তাই আমি বেড়াতে না যেতে পারি;
কিন্তু রওশন যাবে না কেনো? সে যেয়ে ক্ষয়নে তার পরীক্ষাও নেই, তাই সে কী ক'রে
বেড়াতে না গিয়ে পারবে? ইচ্ছে হচ্ছে একবার গিয়ে দেখে আসি; কিন্তু না, দুপুরের
আগে যাবো না; রওশন দুপুরে যেতে বলেছে আমাকে, দুপুরেই যাবো; দুপুর পর্যন্ত
আমি শুধু রওশনকে ভাববো, আমি পড়বো, আর রওশনের তাল তাল কোমলতা অনুভব
করবো।

দুপুরে বেরিয়েই ভয় পাই আমি, যদি গিয়ে দেখি রওশন নেই? তখন আমি সুব
অঙ্ককার বোধ করবো না? আমি কি তখন বাড়ি ফিরে আসতে পারবো? তখন আমি কি
কান্দিপাড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করবো? পথে পথে রওশনের পায়ের দাগ ঝুঁজতে
ঝুঁজতে হাঁটতে থাকবো? রওশনের পায়ের দাগ ঝুঁজতে আমার তালো লাগবে। গিয়ে
দেখি রওশন দাঁড়িয়ে আছে বাঁধানো কবরের পাশে; কবরটিকে আমার গোলাপবাগান
ব'লে মনে হয়, কেননা তার পাশে এক বিশাল গোলাপের মতো ফুটে আছে রওশন।

‘সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি’, রওশন বলে, ‘তোমার দুপুর এতো দেরি ক'রে
হয়!’

‘আমার ভয় হচ্ছিলো তুমি হয়তো নেই, বেড়াতে গেছো’, আমি বলি, ‘কী যে ভয়
করছিলো! ’

‘না থাকলে তুমি কী করতে?’ রওশন হাসে।

‘কান্দিপাড়ার দিকে হাঁটতে থাকতাম’, আমি বলি।

‘সত্যি?’ রওশনের চোখে লাল লাল গোলাপ ফুটতে থাকে; বলে, ‘আজ বেড়াতে
যেতে হ'লে আমি পাগল হয়ে যেতাম।’

‘কেনো?’ আমি জানতে চাই বা আমি জানতে চাই না।

‘কারণ সেখানে তুমি নেই’, রওশন বলে, ‘তুমি যেখানে নেই সেখানে কিছু নেই ব’লে আজকাল আমার মনে হয়।’

‘আজকাল তোমার এমন তুল মনে হয় কেনো?’ আমি হেসে বলি।

‘তা তুমি বুঝবে না’, রওশন অভিমান করে; এবং আমার ভালো লাগতে থাকে একথা ভেবে যে রওশনের চোখের পাতায় হয়তো অশ্রু সৌন্দর্য দেখতে পাবো। রওশন বলে, ‘এটা অংশ নয় যে তুমি সহজে বুঝবে।’

রওশন আমাকে নিয়ে রওশনদের দোতলার দিকে হাটতে থাকে; আর বলে, ‘আজ দোতলাটি আমাদের।’

আমরা দোতলায় তুকি, রওশন দরোজা বন্ধ ক’রে দেয়; সিডি দিয়ে আমরা ওপরে উঠি;— আমাদের একজনের হাতে আরেকজনের হাত।

‘আজ তোমাকে আমার ঘর দেখাবো’, রওশন বলে, ‘তোমার একটুও ভালো লাগবে না, খুব বিচ্ছিন্ন আমার ঘর।’

‘তোমার ঘরে চুকলে আমি পাগল হয়ে যাবো’, আমি বলি।

‘কেনো?’ রওশন জিজ্ঞেস করে, আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

‘আমি জানি না’, বলি আমি।

‘তোমাকে পাগল দেখতে আমার খুব ভালো লাগবে’, হাসে রওশন, ‘তবে একেবারে পাগল হয়ে যেয়ো না।’

‘যদি হয়ে যাই? আমি বলি।

‘তাহলে পাগলের বউ হয়ে আমাকে থাকতে হবে চিরকাল’, রওশন আমার চোখের মুনির তেজের তার মেঝের মণি গৈথে দিয়ে হাসে।

আমার তেজরটা নেমে পঁচতে ‘বউ’ কী সুন্দর শব্দ! রওশন বউ হবে আমার, রওশন নিজে বলছে একশটি! সারা পৃথিবীকে, সব টাদতারাধ্বনক্ষত্রকে, চিৎকার ক’রে শোনাতে ইচ্ছে করছে। রওশন আমার খুব কাছাকাছি, আমার মুখোমুখি; দুটি হাত সে আমার বাহ্য ওপর রেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বলি, ‘আবার ওই কথাটি বলো।’

রওশন মুখ উঁচু ক’রে আমার চোখ রেখে জলের কূর্ণির মতো তার ঠোট বাঁকিয়ে বনের সবচেয়ে সুন্দর পাখিটির মতো বলে, ‘বউ।’

আমি কাঁপছি, আরো শুনতে ইচ্ছে করছে আমার, বলি, ‘কার?’

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধ’রে বলে ‘তোমার।’

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমার পৃথিবী কাঁপছে, চক্ষু হয়ে নাচছে আমি রওশনকে খুব আন্তে জড়িয়ে ধরি, তার চুলের প্রাণ নিই। রওশন মাথা নিচু ক’রে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি ছোট্ট খাট রওশনের, একটি টেবিল রওশনের, টেবিলে কয়েকটি বই আর পাউডার আর স্নোর কৌটো রওশনের, একটি চেয়ার রওশনের, দুটি জানালা রওশনের,

আর জানালা পেরিয়ে একটি বাঁশবাগানের সবুজ দৃশ্য রওশনের। রওশন আমাকে চেয়ারে বসতে বলে, আর সে পা ঝুলিয়ে বসে থাটে।

রওশন আমার হাত দুটি তার হাতে নিয়ে আঙুল দেখতে থাকে, নখ দেখতে থাকে, এবং বলে, ‘এ-আঙুলগুলো কখনো ভালো ক’রে দেখতে পাই নি।’

আমি হাত টেনে নিতে চাই, রওশন বলে, ‘এ-হাত দুটি আমার, তোমাকে শুধু রাখতে দিয়েছি, আর বেশি টানাটানি কোরো না তো।’ বলে হাসে রওশন।

আমি বলি, ‘তোমার নখ সুন্দর।’

রওশন বলে, ‘মিছে কথা; তোমার নখ সুন্দর। দেখি তো তোমার নখ বড় হয়েছে কিনা?’

রওশন আমার নখ খুঁটতে থাকে, আর বলে, ‘তুমি একটু চুপ ক’রে বসো, আমি তোমার নখ কেটে দিই।’ রওশন টেবিলের ড্রয়ার থেকে ক্লিপ বের করে।

‘তুমি সত্যই আমার নখ কাটবে নাকি?’ আমি হাত টেনে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলি।

‘তুমি দেখো তো আমি কী করি’, রওশন আমার হাত টেনে নিয়ে খুব মস্তিষ্কে নখ কাটতে থাকে। নখের টুকরোগুলো সে জমিয়ে যাবে তার বাঁ হাতে; এবং বলে, ‘জানো এগুলো দিয়ে আমি কী করবো?’

‘জানি না তো’, আমি বলি।

একটি ছোট্ট লাল কৌটোতে নানাতেক করোগুলো রাখতে রাখতে রওশন বলে, ‘এগুলো আমি জমিয়ে রাখবো, মাকেজাবে ঝুলে দেবো এগুলো তোমার নখ, দেখতে আমার ভালো লাগবে।’

আমি রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর বলি, ‘তুমি তো আমার নখ দেখবে, কিন্তু আমি কী দেবো?’

‘তোমার কী দেখতে ইচ্ছে করে?’ রওশন জিজ্ঞেস করে।

‘আমার ইচ্ছে করে কৌটোয় ক’রে তোমার আঙুল আমার ড্রয়ারে রাখি, একটি আঙুল আমাকে দেবে?’ আমি বলি।

রওশন দু-হাত বাড়িয়ে বলে, ‘তোমার যেটি ইচ্ছে করে কেটে নাও; বলো, তোমার কোনটি কেটে নিতে ইচ্ছে করে?’

আমি আমার মুঠোর ভেতর রওশনের আঙুলগুলো চেপে ধ’রে রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, বলি, ‘সবগুলো।’

রওশন বলে ‘নাও, এগুলো তোমার।’

আমি রওশনের দু-হাতের আঙুলগুলো আমার গালে ঘষতে থাকি, কপালে ঘষতে থাকি, নাকে ঘষতে থাকি।

রওশন তর্জনীর ডগা দিয়ে আমার নাক ঘষতে ঘষতে বলে, ‘তোমার নাকে খুব মিষ্টি মিষ্টি ঘাম জমেছে।’

‘তাতে কী হয়েছে?’ আমি বলি।

‘তোমার বউ তোমাকে শুব ভালোবাসবে’, রওশন হাসে।

আমার ইচ্ছে করছে রওশনকে জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু আমি ধরি না; যদি রওশন
কিছু মনে করে।

রওশন বলে, ‘তোমার একগুচ্ছ চুল যদি তুমি আমাকে দিতে।’

‘কী করবে চুল দিয়ে?’ আমি বলি।

‘মাঝেমাঝে দেখবো, মনে হবে তোমাকে দেখছি’, রওশন বলে, ‘আজকাল
সারাক্ষণ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।’ একটু থেমে বলে, ‘আমাকে সারাক্ষণ দেখার
ইচ্ছে যদি কারো হতো।’

‘একজনের হয়, আমি জানি’, আমি বলি ‘দিনবাত দেখার ইচ্ছে তার।’

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, ‘তার মাঝে বুবার বলো, তিনবার
বলো, চারবার বলো, একশোবার বলো, সারাদিন বলো, সারাবাত বলো, মাহবুব,
মাহবুব, মাহবুব।’

রওশনের চুলে ঢেকে যাচ্ছে আমার নতুন সুগন্ধে তরে উঠছে আমার আজ্ঞা,
আমার রক্ত। আমি রওশনের মাথাটি দু-চার বারে চুলের তেতর চোখ মুখ নাক চুকিয়ে
দিয়ে দ্রাঘ নিই।

‘তোমার চুলের সুগন্ধে আমার ভ্রান্ত তরে গেছে’, আমি বলি।

‘ইচ্ছে হ’লে আরো প্রাণ নাপ’, রওশন বলে।

আমি রওশনের চুলের মুখে আমার প্রাণ আরো তরে তুলতে থাকি। তারপর
রওশনের মূখটি আমি নিহত আমার অঙ্গনিতে।

‘রওশন, তুমি চোখ বোজো, তোমাকে আমি দেখবো’, আমি বলি।

রওশন চোখ বোজে; আমি রওশনের মুখের নতুন রূপ দেখে অস্ত হয়ে যাই।
রওশন অনেকক্ষণ পর চোখ খোলে, আমার মনে হয় আমাদের গ্রামে ভোর হলো।
এখন ডালে ডালে পাখি ডেকে উঠবে, ফুল ফুটবে।

রওশন আমার নাকের নিচে আঙুল বুলোয় আর বলে, ‘তোমার গৌফ উঠছে, কী
নরম।’ একটু পরে বলে, ‘তুমি কিন্তু গৌফ রেখো না।’

আমি জিজ্ঞেস করি, ‘কেনো?’

‘গৌফ আমার তাঙ্গাগে না’, রওশন বলে, আর হাত বুলোতে থাকে আমার মুখে,
গালে, চিবুকে, গলায়।

‘তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে’, আমার গলায় হাত বুলোতে বুলোতে
রওশন বলে, ‘প্রাণতরে দেখতে ইচ্ছে করছে।’

‘আমি তো তোমার সামনেই বসে আছি, রওশন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছা না?’
আমি বলি।

রওশন হাসে, আর বলে, 'না, তুম তোমার মুখ দেখছি, তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।' তারপর বলে, 'আমি একটু তোমাকে দেবি?'

'কীভাবে তুমি দেখতে চাও?' আমি বলি।

'আমার ইচ্ছে করে জামা খুলে তোমাকে দেখতে, আমার খুব ইচ্ছে করে',
রওশন বলে, 'মনে হয় জামার ভেতরে তুমি আরো সুন্দর।'

'আমার লজ্জা লাগবে, রওশন', আমি বলি।

'কিন্তু আমার যে দেখতে ইচ্ছে করে', রওশন বলে, 'একটু দেবি?'

'দেখো', আমি বলি।

রওশন একটি একটি ক'রে আমার জামার বোতাম খোলে, আর ডান হাত আমার বুকের ওপর বুলোতে থাকে। রওশন জামাটি খুলে নিতে পারে না, আমি মাথার ওপর দিয়ে খুলে জামাটি রওশনের হাতে দিই। নিচে গেঞ্জিও আছে, রওশন নিজেই আন্তে আন্তে গেঞ্জিটি খোলে। শীতকাল, কিন্তু আমার শীত লাগছে না। আমি তুলে যাচ্ছি আমি কোথায় আছি। রওশন আন্তে আন্তে হাত বুলোতে থাকে আমার শরীরে; আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে বসে থাকি।

'তোমার শরীর কী যে সুন্দর', রওশন বলে। 'আমি কথা বলি না।'

'তোমার এ-তিলটি তুমি কখনো দেখো নি', আমার পিঠের এক জায়গায় আঙুল
রেখে রওশন বলে, 'তিলটি আমি দেখলাম। তিলটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

'ওই তিলটি তোমাকে দিলাম', আমি মালি।

রওশন আমার বুকে আঙুল দিয়ে একটু ঘষে, আর বল, 'দেখো, কী সুন্দর লাল
হয়ে উঠলো; এই লালটুকু আমির।'

রওশনের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে দেবি তার চোখ জুড়ে স্বপ্ন ভাসছে, সে
হয়তো আমার শরীর দেখছেনা, অন্য কিছু দেখছে, দেখতে দেখতে তারও চোখ অঙ্গ
হয়ে যাচ্ছে।

'জানো, তোমার শরীর আমি দিনের পর দিন ধ'রে দেখতে পারি', রওশন বলে,
'দেখে দেখে আমার সাধ মিটিবে না।' 'রওশন, তুমি আর কতোক্ষণ দেববে?' আমি
বলি, 'আমার ঘুম পাচ্ছি।'

'তুমি ঘুমোও আর আমি তোমাকে দেবি', রওশন বলে, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তারপর যে আমি আর কোনোদিন ঘুমোতে পারবো না', আমি বলি।

'কেনো?' রওশন জানতে চায়।

'আমি জানি না', আমি বলি।

রওশন আমার শরীরে হাত বুলোতে থাকে, আর বলে, 'কী যে সুন্দর কী যে
সুন্দর, সারাজীবন চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।'

আমি রওশনকে ডাকি, 'রওশন।'

রওশন বলে, 'কী?'

'তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে', আমি বলি, 'তোমাকে দেখতে আমার
খুব ইচ্ছে করছে।'

রওশন বলে, 'সত্যই তুমি দেখতে চাও?'

'চাই', আমি বলি।

'তাহলে দেখো', বলে রওশন চোখ বোজে, এবং বলে, 'তবে ছুঁয়ো না আমাকে।'

'আচ্ছা', আমি বলি।

কিন্তু আমি কী করবো বুঝতে পরি না যেনো আমি খুব গরিব, আমার সামনে কোনো দেবতা মণিমাণিক্যের সিন্দুর হাজির করে খুলে দেখতে বলছে, কিন্তু আমি খুলতে জানি না। আমার হাত থেকে বারবার সোনার চাবি মাটিতে প'ড়ে যাচ্ছে। তুলতে গিয়ে আবার প'ড়ে যাচ্ছে; সোনার চাবি তুলতে তুলতে আমার সারা জীবন কেটে যাবে, আমি কোনো দিন সিন্দুর খুলে দেখতে পারবো না।

রওশন বলছে, 'তুমি দেখবে না?'

'দেখবো', আমি বলি।

রওশনের কামিজের পেছনে স্বপ্নের ঘোরে বারবার ধৃতি সরিয়ে ফেলতে ফেলতে আমি হাত বুলোই; বোতামগুলোকে একেকটি সোনার ভাঙ্গামনে হয়; একটি একটি ক'রে খুলতে চেষ্টা করি আমি, আমার আঙ্গুল কাপতে থাকে, সারা শরীর কাপতে থাকে, রওশন চোখ বুজে আছে, একটি একটি ক'রে স্বিন্ডুকর সোনার তালা খুলছি আমি। আমি রওশনের কামিজ টেনে নিচের দিকে মায়াই, মনে হয় হাত দিয়ে আমি মেঘ সরিয়ে দিচ্ছি, আমার হাত কাপতে থাকে। রওশনের ধৰ্মবৰ্ষে কাঁধ থেকে আমার চোখ চাদের বন্যার মতো মাংসের আনন্দচূর্ণতে থাকে। রওশন একটুও নড়ে না। আমি কামিজের মেঘ টেনে আরো নিচে মায়াই; আমার চোখের সামনে দুটি চাঁদ জুলে ওঠে, দুটি শুভ পদ্ম স্থির হয়ে ফুটে ওঠে। বাঁ দিকের চাঁদটিকে একটু ছোটো মনে হয় ডান দিকের চাঁদের থেকে। মহাকালের মুখোমুখি আমি দাঢ়িয়ে আছি, আমি চোখ বন্ধ ক'রে ফেলি। আমার ছুঁতে ইচ্ছে করে ওই চাঁদ, ওই পদ্ম; কিন্তু রওশন ছুঁতে নিষেধ করেছে, আমি ছুই না; আমি শুধু অঙ্গ চোখ দিয়ে যুগল চাঁদ যুগল পদ্ম দেখতে থাকি। আমার চামড়া ফেটে শরীরের সব দিক থেকে রক্ত ফিলকি দিয়ে বেরোতে চায়; পদ্মার চেউয়ের ওপর আমি একটি ছোট্ট নৌকো প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকি নিজেকে সমস্ত চেউয়ের মধ্যে স্থির ক'রে রাখতে।

'তুমি কি আমাকে দেখছো?' রওশন জিজ্ঞেস করে।

'দেখছি', আমি বলি, 'কিন্তু মনে হচ্ছে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি কি অঙ্গ হয়ে গেছো?' রওশন বলে, এবং চোখ খুলে আমার মুখের দিকে তাকায়।

আমি রওশনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

'তোমার কি শুধু এটুকুই দেখতে ইচ্ছে করছে?' রওশন বলে, 'আমার কিন্তু তোমাকে পুরোপুরি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'আমিও তোমাকে পুরোপুরি দেখতে চাই', আমি বলি।

রওশন চোখ বোজে, আমি রওশনের সালোয়ার মেঘের মতো টেনে সরিয়ে
মেঘেতে রাখি। জ্যোৎস্নার বন্যায় খাট ভেসে যায়, ঘর ত'রে যায়।

আমি চোখ বুজি, রওশন আমার লুঙ্গি সরিয়ে মেঘেতে রাখে।

আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকাই।

'তুমি সুন্দর', রওশন বলে।

'তুমি সুন্দর', আমি বলি।

আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, কেউ কাউকে ছুইছি না, দেখছি একজন
আরেকজনকে, দেখতে দেখতে অঙ্গ হয়ে যাচ্ছি।

'আমাদের শরীর নিয়ে আমরা কী করবো?' আমি বলি।

'আমাদের জন্যে রেখে দেবো', রওশন বলে।

'সেই ভালো', আমি বলি।

রওশন বলে, 'তোমাকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।'

'একবার আমরা জড়িয়ে ধরি আমাদের?' আমি বলি।

'না, আজ নয়, আজ নয়, সেই একদিন', রওশন বলে।

রওশন সালোয়ারকামিজ পরতে থাকে; আমিও কাপড় পরি, এবং চোখ বন্ধ ক'রে
দাঁড়িয়ে থাকি।

'চোখ খোলো', রওশন বলে।

চোখ খুলে আমি রওশনের দিকে তাকাই, রওশন হেমতের কাশবনে চাঁদের
আলোর মতো হাসে; চাঁদের মতোই সূক্ষ্ম মনে হয় রওশনকে; আমি সিঁড়ির দিকে
ইটতে থাকি, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামি, দরোজা খুলে বাইরে বেরোই; সব কিছু আমার
অচেনা লাগে। ওই নারকেল মাঝে আমি আগে দেখি নি, এই মাটি আমি আগে দেখি নি,
বাতাসের এমন ছোয়া আমি আগে পাই নি। আমি পেছনের দিকে ফিরে তাকাই
একবার, দেখি বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর খুঁকে রওশন তাকিয়ে আছে। আমি নদীর
দিকে ইটতে থাকি, আমি কিছু দেখতে পাই না; নদীর পারে এসে দেখি রওশনের
শরীরের মতো পদ্মা বয়ে চলছে।

আমি কয়েক দিন রওশনদের বাড়ি যাচ্ছি না, তবে যাচ্ছি না আমার এমন মনে
হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমি রওশনের সাথে দোতলায় বয়েছি, রওশন দেখছে আমাকে
আমি দেখছি রওশনকে; যা তখন আমি দেখতে পাই নি এখন দেখতে পাচ্ছি, রওশনের
গ্রীবার নিচের লাল তিলটিকে মনে পড়ছে, তিলটিকে একটি নাম দিতে ইচ্ছে করছে,
ওর নাম লাল শুকতারা; আলতাত দুটি বৃন্ত আমার চোখের সামনে ঘুরছে, রওশনের
চাঁদের শীর্ষে গোলাপকুঁড়ি, দুটি চাঁদের শীর্ষে দুটি গোলাপকুঁড়ি, আলতাত বৃন্তি ঘিরে
আছে কুঁড়ি দুটিকে; একবার মেঘের কথা মনে পড়ছে, হাঙ্কা মেঘ, আকাশে এককোণে
ভিড়ে আছে; তবে আমি তাকালেই লাল রঙলাগা চাঁদ দেখছি চোখ বন্ধ করলেই লাল
রঙলাগা চাঁদ দেখছি। প্রত্যেক বিকেলে বেরোই, কিছু দূর হাঁটি রওশনদের বাড়ির
দিকে, তারপর লাল রঙলাগা চাঁদ দেখতে দেখতে নদীর দিকে চ'লে যাই, ধানবেতের
দিকে যাই, এক দিন বাজারেও গিয়ে চা খাই। শওকত আজ এসেছে, শওকত আমাকে

ওদের বাড়ি যেতে বলছে না, ও তীষণ দুষ্ট, যেতে বলবে না, কিন্তু আমাকে আজ যেতে হবে।

শওকত বাড়ি যাবে না এখন, আমাকে একলাই যেতে হবে।

বাঁধানো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রওশন, যেখানে রওশনকে না দেখলে আমি অঙ্ককার দেখতাম। রওশন খুব গল্পীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এমন গল্পীর আমি রওশনকে কখনো দেখি নি। গল্পীরভাবেও রওশন সুন্দর।

‘তুমি কেমন আছো?’ রওশন বলে।

আমরা দূজনে বসার ঘরে চুকি, আমি আমার চেয়ারটিতে বসি, এবং হাত বাড়িয়ে রওশনের হাত ধরি।

‘তুমি আমাকে ভুলে গেছো’, রওশন বলে, ‘আমি তোমাকে ভুলি নি।’

‘আমিও ভুলি নি’, আমি বলি।

‘তাহলে কেনো আসো নি?’ রওশন বলে।

‘আমি পাগল হয়ে গেছি’, আমি হেসে হেসে বলি, ‘একমত্র পাগল পূর্ব পাকিহানে।’

‘পাগল হলে তো সেদিনই আবার আসতে’, রওশন এবার হাসে, আমার বুকে ঝলক দিয়ে রোদ ওঠে। রওশন আমার মুঠো দুর্ঘে জ্বারে টান দিয়ে বলে, পাগল হলে সেদিনই কেনো হলে না? আমার সামনেই কেনো হলে না? পাগল হলে তোমাকে কেমন লাগে আমি দেখতাম!'

‘তখন পাগল হলে তোমার খুব বিপদ হিলো, লাফিয়ে হয়তো জানালা দিয়ে বাঁশবোপের ভেতর পড়ে যেতাম, তখন তোমার অনেক কষ্ট হতো’, আমি বলি।

কোনোই কষ্ট হতো না, রওশন বলে, ‘আমিও তোমার সাথে বাঁশবোপে লাফিয়ে পড়তাম, খুব চমৎকার হতো! সবাই এসে দেখতো আমরা দুজন ঝুলে আছি!'

‘তারপর তুলে এনে একসাথে কবর দিতো’, আমি বলি।

‘পাগল হলে’, রওশন বলে, মানুষ নাকি বিড়বিড় করে নানা কিছু বলে, চোখের সামনে নানা কিছু দেখে; আচ্ছা, তুমি কী বলছো আর কী দেখছো?’

‘আমি দিনরাত বলছি লাল শুকতারা লাল শুকতারা, আর দেখছি লাল শুকতারা’, আমি বলি।

‘লাল শুকতারা?’ রওশন বলে।

‘আমি নাম দিয়েছি’, আমি বলি।

‘কার?’ রওশন জানতে চায়।

‘তোমার গ্রীবার নিচের লাল তিলটির’, আমি বলি।

রওশন কোমলভাবে তাকায়, বলে ‘আর কী দেখছো?’

‘গোলাপকুঁড়ি’, আমি বলি।

রওশন আরো নিবিড়ভাবে আমার হাত ধ'রে আমার চোখের ভেতরে তার চোখের সমস্ত আলো আর ছায়া স্থির ক'রে জিজেস করে, ‘আর?’

‘লাল রঙলাগা চাঁদ’, আমি বলি।

রওশন আরো শক্ত ক'রে আমার মুঠো ধ'রে বলে আর?’

‘আকাশের কোণে একখণ্ড মেঘ’, আমি বলি।

রওশন আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি মাহবুব।’

আমাদের যেনো কী হয়েছে, বুব গভীর কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে, নইলে এমন হবে কেনো, আমাদের এমন লাগবে কেনো? আগে তো আমরা হাতে হাত রেখে বুব সুবে ছিলাম, এতো সুবে ছিলাম যা কখনো কেউ থাকে নি। কিন্তু এখন তধু হাত ধ'রে কেনো সাধ মেটে না? রওশন এটাও প্রথম আবিকার করে, বা রওশনই প্রথম এ-আবিকারটি প্রকাশ করে, তাই এর কৃতিত্ব তারই প্রাপ্ত্য। আমিও যে বোধ করি নি, তা নয়; কিন্তু প্রকাশ করি নি, রওশন কী মনে করবে এমন এক দিখা আমার মনে থেকেই যায় সব সময় কিন্তু রওশনের কোনো দিখা নেই, সত্যকে সে সত্যের মতোই প্রকাশ করে— আমার কাছে। আমি কি একটু কপট? পনেরো বছরেই? পুরুষ হলে কি একটু কপট হ'তে হয়? দোতলার দিন আমি বুঝতে পারি নি আমারে শরীর নিয়ে আমরা কী করবো, যদিও আমি অনুভব করি যে আমাদের শরীর স্থিতি কিছু একটা আমাদের করার কথা। আমার অনেক তাবনাই আজকাল আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে, অনেক সময় ভীত ক'রে দিয়ে, বদলে যাচ্ছে; এক সময় আমি ভাবতাই রওশন আর আমি চিরকাল তধু মুঝেমুঝি হাত ধ'রে ব'সে থাকবো, রওশন হস্তে আমি দেখবো, আমি কথা বলবো রওশন হনবে, আমরা আর কিছু করবো ন'হ'তে আমরা কখনো অসভ্য হবো না। কিন্তু আমার দিন দিন তয় হচ্ছে আমরা হয়ে হ'তে অসভ্য না হয়ে পারবো না; অন্যদের মতো আমরাও অসভ্য হয়ে যাবো। তবে অসভ্য কীভাবে হতে হয় আমি পুরোপুরি জানি না, রওশনও হয়তো জানে না; কিন্তু একদিন আমি জেনে নিশ্চয়ই ফেলবো কীভাবে সত্যিকার অসভ্য হ'তে হয়ে রওশনও জানাবে; তখন হয়তো আমাদের সব সময় অসভ্য হ'তে ইচ্ছে করবে। রওশনই প্রথম প্রকাশ করে যে হাত ধ'রে আর সাধ মিটছে, কিন্তু হাত ধরা ছাড়া আর কী করলে সাধ মিটবে, তা বুঝতে পারছে না রওশন; এবং আমিও বুঝতে পারছি না।

‘জানো’, রওশন বুব আস্তে বলে, ‘তধু হাত ধ'রে আর সাধ মিটছে না।’

‘আমারও’, আমি বলি ‘হাত ধ'রেও মনে হয় আমরা অনেক দূরে।’

‘কী অবাক কাও না!’, রওশন বলে, ‘একদিন তো হাত ধ'রেই সুবে গলে যেতাম, আর এখন মনে হয় কী যেনো চামড়ায় এসে আটকে যাচ্ছে, বেরোতে পারছে না।’

শওকত এসে ঢোকে এমন সময়, আমরা বীজগণিত নিয়ে আলোচনা শুরু করি। রওশন বুব আগ্রহের সাথে বীজগণিত শিখতে থাকে। শওকত চ'লে যায়, আমরা আবার আমাদের বিশ্বয় নিয়ে বিশ্মিত হ'তে থাকি।

‘কী যে করি, কী যে করি’, রওশন বলে, ‘কী করলে যে মনে হবে তোমাকে ধ'রে আছি!'

‘আমার ইচ্ছে করে,’ আমি বলি, ‘আমার আর তোমার আঙ্গুল কেটে আমার আঙ্গুলের রগ তোমার আঙ্গুলের রগের সাথে জোড়া দিয়ে দিই।’

রওশন বলে, ‘সেই ভালো, সেই ভালো; তাহলে আমাদের রক্ত মিলেমিলে একাকার হয়ে যাবে, আমাদের সাথ ছিটবে।’

তবে এ-পদ্ধতি সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না; আমাদের মাত্র পনেরো বছর বয়স হলেও আমরা বুঝতে পারি আঙুল আর রগ কাটাকাটি বিচ্ছিরি কাও ঘটাবে, রগ জোড়া দেয়ার আগেই রক্তে আর আমাদের চিংকারের চারদিক ক'রে উঠবে। রওশন তখন নতুন একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করে।

রওশন বলে, ‘একটি কাজ করতে পারি, অতিদিন আমরা একবার নিজেদের জড়িয়ে ধরবো।’

‘কেউ যদি দেবে ফেলে?’ আমি বলি।

রওশন খুব চিন্তিত হয়, বলে, ‘তার সম্ভাবনা আছে।’

‘তাহলে কী করবো?’ আমি বলি।

‘খুব সাবধানে দেখেওনে নিতে হবে’, রওশন বলে, ‘একটু জরিপ ক'রে নিতে হবে। জরিপটা আমিই করবো।’

‘তাহলে সুখ লাগবে না’, আমি বলি।

‘ঠিকই’, রওশন বলে, ‘তবে যেদিন সুযোগ পাবে সেদিন।’ একটু পর রওশন বলে, ‘আচ্ছা, এর কোনো দেবতাটেবতা নেই, যে একটু সুযোগ ক'রে দিতে পারে? না হয় বিকেলবেলা আমরা হিলুই হয়ে যাবো।

‘একটি আছে বলে আমি শনেছি’ আমি বলি, ‘তবে সেটা সুযোগ ক'রে দিতে পারে না, তখন তীর ছুঁড়তে পারে।’

‘তাই হবে’, রওশন বলে, ‘মন্দির শরীরে অনেক তীর ফুটছে ব'লে মনে হচ্ছে।’

রওশন একটু জরিপ করতে যায়, আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আলমারিটার কোনায়; এবং ফিরে এসেই জড়িয়ে ধরে আমাকে, সাথে সাথে দূরে স'রে যায়।

‘না, এতে মন ভরলো না’, রওশন বলে।

‘একটু ব্যায়াম হলো’, আমি বলি; আর রওশন খিলখিল করে হেসে ওঠে।

‘তুমি একটু ভেবো’, রওশন বলে, ‘একটি উপায় বের কোরো, এটাই আমার প্রথম বায়না তোমার কাছে।’

কোনো উপায় বের করতে পারি না আমি, রওশনের প্রথম বায়নাটি আমি বোধ হয় রাখতে পারবো না; আমার তখন মনে হ'তে থাকে আমাদের রক্ত আর মাংস অসভ্য হয়ে উঠছে, খুব অসভ্য হয়ে উঠতে চাইছে। আমি ভয় পেতে থাকি আমি বোধ হয় আর রওশনের মুখের দিকে চিরকাল তাকিয়ে থাকতে পারবো না, তখন রওশনের হাসি দেবেই আমার বুক সুবে তরে উঠবে না; রওশনও তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আর আমার কথা শনে শনে সুবে তরে উঠতে পারবে না। আমরা বদলে যাচ্ছি আমাদের সুখ বদলে যাচ্ছে, আমাদের রক্ত বদলে যাচ্ছে, আমাদের মাংস বদলে যাচ্ছে। সুব চিরকাল একরকম থাকে না কেনো, চিরকাল একইভাবে কেনো সুব পাওয়া যায় না। আমাদের কি কেউ অভিশাপ দিয়েছে? দেবতাটেবতা বা ফেরেশতাটেরেশেতা কেউ কি আকাশ থেকে দেখতে পেয়েছে আমরা হাতে হাত রেখে খুব সুব পাই, দেখে

তাদের শুব ঈর্ষা হয়েছে, এবং অভিশাপ দিয়েছে তোমরা আর শুধু হাত ছুঁয়ে সুখ পাবে না, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সুখ পাবে না? আমার তাই মনে হয়; তাদের অভিশাপে আমাদের রক্ত জুলছে মাংস পুড়ছে; নিজেদের পোড়া রক্তমাংসের গক্ষে আমাদের জগত ভরে উঠছে। রওশন আমাকে বলেছে তার মাংস জুলে, রক্ত পোড়ে; আমিও বোধ করছি আমার মাংস পোড়ে রক্ত জুলে। সেখান থেকে অসহ্য সুগন্ধ উঠছে। কয়েক মাস আগে আমি একটি উপন্যাস পড়েছিলাম, আমার মনে পড়ে, তাতে এক জায়গায় লেখা ছিলো, 'তাহারা চুম্বন করিল।' পড়ে আমার রক্ত ঝনঝন ক'রে উঠেছিলো। ঠিক রওশন ও আমার মতোই ওই উপন্যাসের নায়কনায়িকার রক্ত আর মাংস জুলছিলো পুড়েছিলো; চুম্বন করে তাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়েছিলো। রওশনকে আমি সে-কথা বলি; রওশন প্রথম লজ্জা পায়, কিন্তু আমরা দুজন বুঝে উঠতে পারি না চুম্বন কীভাবে করতে হয়। আমি বলি চুম্বন গালে করতে হয় ঠোট আন্তে গালে ছোঁয়ালেই চুম্বন হয়; রওশন বলে চুম্বন হাতের উল্টোপিঠে করতে হয়। আমরা কয়েক দিন ঠোট দিয়ে গাল আর হাত স্পর্শ করি; প্রথম আমাদের একটু অস্ত অনুভূতি হয়, কিন্তু পরে তা আর যথেষ্ট মনে হয় না; আমরা যা চাই, আমাদের যেকোন চায়, তা ওই চুম্বন নয়।

আমাদের শরীরের ভেতর কী আছে, আমাদের রক্তে আর মাংসে এখন কী জমছে? সুধা না বিষ? রওশন বলে তার মনে হচ্ছে তার রক্তে বিষ জমছে, তবে অন্য রকম বিষ, এমন এক ধরনের বিষ, যা শুব মধুর যা শুব মিষ্টি, যাতে মানুষ মরে না, মানুষ পাগল হয়ে ওঠে। আমারও তাই স্ট্রেচ হয়। রওশনকে আমি মনে করিয়ে দিই রওশন একবার লিখেছিলো যে আমিই পান করবো তার ঘোবন সুধা। রওশন বলে যখন সে লিখেছিলো তখন সে প্রয়োগুর বুবাতে পারে নি সে কী লিখেছে। রওশন ভুলো না আমায় নামের একটি বইতে কথাটি পেয়েছিলো, পড়ে রওশনের ভালো লেগেছিলো, রওশনের শরীর কেমন করে উঠেছিলো, অনেক দিন ধ'রে কথাটি রওশনের মনের ভেতরে গানের মতো বাজছিলো, আর চিঠিতে ওই কথাটি লিখে রওশন সুখ পেয়েছিলো। এখন রওশনের মনে হচ্ছে তার শরীরে সুধা জমছে, আমার মনে হচ্ছে আমার শরীরেও সুধা জমছে; একদিন আমরা ওই সুধা পান করবো। সে-একদিন কতো দূর? অনেক দূর? ততো দিন কি আমরা বাঁচবো? পিপাসায় আমরা মরে যাবো না? আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে, আমরা প্রাণ ত'রে পান করবো আমাদের সুধা। তবন আমাদের অসভ্য মনে হবে না, আমাদের সুধা তো আমাদেরই পান করতে হবে। রওশনকে আমি একটি কথা কিছুতেই বলতে পারছি না, রওশন আমাকে অসভ্য ভাববে, তাই বলতে পারছি না। আমি এক সময় নিজের শরীর থেকে মধু আহরণ করতাম, মধুর চাক ভেঙে সুবে ক্লান্তিতে ভরে যেতাম। সেভাবেই আমাদের মধু আহরণ করতে হবে, নিজের শরীর থেকে নয়, পরস্পরের শরীর থেকে; রওশনের মধুর চাক ভাঙবো আমি, আমার মধুর চাক ভাঙবে রওশন; রওশনের সুধা পান করবো আমি, আমার সুধা পান করবে রওশন। আমাদের শরীর বেয়ে বেয়ে সুধা ঝরতে থাকবে, আমার মুখ থেকে সুধা ঝরবে, রওশনের মুখ থেকে সুধা ঝরবে; সুধায় আমাদের শরীর ভিজে যাবে, বালিশ ভিজে যাবে বিছানা ভিজে যাবে; আমাদের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র

দিয়ে সুধা খরতে থাকবে। সুধা পান করতে হলে অসভ্য হতে হবে আমাদের; খুব অসভ্য, অত্যন্ত অসভ্য, জঘন্য অসভ্য হতে হবে আমাদের। সবাই অসভ্য হয়; আদম-হাওয়াও অসভ্য হয়েছিলো। আমার আজ মনে হচ্ছে আমি পারবো অসভ্য হতে, কিন্তু রওশন কি পারবে?

রওশনকে একদিন আমি জিজেস করি, 'রওশন, তুমি কি অসভ্য হতে পারবে?'

রওশন বিস্মিত হয়, 'অসভ্য? অসভ্য কেনো হতে হবে?'

আমি বলি, 'এই যে হাত ছুঁয়ে আমরা আর আগের মতো সুখ পাচ্ছি না।'

রওশন বলে, 'হ্যাঁ পাচ্ছি না।'

আমি বলি, 'এই যে একবার জড়িয়ে ধরে আমরা আর সুখ পাচ্ছি না।'

রওশন বলে, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি না।'

আমি বলি, 'সুখ পেতে হলে আমাদের খুব অসভ্য হতে হবে।'

রওশন আমার চেবে গভীরভাবে তাকায় আস্তে বলে, 'খুব অসভ্য হতে পারবো আমি তোমার সাথে, তবে আজ নয়, সেই একদিন।'

অনেক রাত জেগে আমি পড়তে থাকি; আমার আবাসিক পড়ার নেই, সব মুখ্য হয়ে গেছে, তবু আমি পড়তে থাকি, চিংকার করে পড়তে থাকি; কেননা চোখ বুজলেই আমি দেখতে পাই রওশন আর আমি অসভ্য হয়ে পাওছি, মাছের মতো পারদের মতো জলের ভেতরে আমরা অসভ্য হয়ে উঠেছি, আমাদের শরীর থেকে মধু ঝরছে, সুধা ঝরছে। আমি দেখতে পাই আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি, আমাদের পৃথক করা যাচ্ছে না, আমরা এক হয়ে যাচ্ছি, আমি হারিয়ে যাচ্ছি লাল রঙলাগা চাঁদের ভেতরে, গোলাপকুড়ির ভেতরে, একখণ্ড মেঁয়ের ভেতরে। আমি আর আমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। পারদ জলের ভেতরে রওশনের চুল ছড়িয়ে পড়েছে, মাছের মতো আমি আটকে যাচ্ছি রওশনের চুলের জালে, শালিসায়, কচুরিপানায়, শৈবালে। রওশন বলেছে সে আমার সাথে খুব অসভ্য হতে পারবে, খুব অসভ্য হতে পারবে, আমার সাথে, তধু আমার সাথে।

প্রবেশিকা পরীক্ষাটি আমি খুবই ভালো দিই, এতো ভালো দেবো আগে ভাবি নি, রওশনের জন্যেই আমি এতো ভালো দিই-রওশন গর্ব করবে আমাকে নিয়ে। আমি ছাড়া আর গর্ব করার রওশনের কী আছে। রওশন সুন্দর, তা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে; কিন্তু রওশন যে সুন্দর তা তো আমার গর্ব। আমি যাকে ভালোবাসি, সে সুন্দর; এটা আমার গর্ব। রওশন গর্ব করবে আমাকে নিয়ে। আট দিন পর যুনশিগঞ্জ থেকে ফিরে বিকেলে আমি রওশনদের বাড়ি যাই। আমি অবাক হই, আর আমার খারাপ লাগে যে রওশন বাঁধানো করবের পাশে নেই। আমি বসার ঘরে ঢুকি, কিন্তু রওশন নেই। শওকত আমাকে দেখে দৌড়ে আসে।

শওকত বলে, 'রওশন মারা গেছে।'

আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠি, 'কী বলছো তুমি?'

শওকত হাসে, 'তুমি এসেছো আর রওশন এ-ঘরে নেই, এতে বুঝতে পারছো না যে রওশন মারা গেছে?'

আমি বলি, ‘সত্ত্ব করে বলো কী হয়েছে?’

রওশনের মা ঘরে চুক্ষেন দেখে আমি অবাক হই, তিনি তো কখনো এ-ঘরে আসেন না। আমি দাঢ়িয়ে সালাম দিই। তিনি আমার চুলে হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। শওকতকে চলে যেতে বলে তিনি চেয়ারে বসেন, এবং রওশনকে ডাকেন। রওশন তাঁর ডাক শনে এসে দাঢ়ায়।

রওশনের মা বলেন, বাবা, তুমি একবার রওশনকে দেখো।’

আমি রওশনের দিকে তাকাতেই রওশন দু-হাতে মুখ জেকে ছহ করে কেঁদে ওঠে, দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রওশনের মা বলেন, ‘বাবা তোমাকে ছেলের মতো পেলে আমাদের সুখের সীমা থাকতো না, রওশনেরও সুখের সীমা থাকতো না।

আমি মাথা নিচু করে কান্না চাপতে থাকি।

রওশনের মা বলেন, ‘তা তো হওয়ার নয়, রওশন বড়ো হয়েছে, আর তোমার অনেক লেখাপড়া বাকি।’

আমি কেঁদে ফেলি।

তিনি বলেন, ‘রওশনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমি ওকে দোয়া কোরো।’

রওশনের মাকে সালাম দিয়ে টলতে টলতে সামি বেরিয়ে আসি।

আমি নদীর দিকে হাঁটতে থাকি, আমি ব্রহ্মতে পারি না কোন দিকে হাঁটছি, নদীর দিকে না অঙ্ককারের দিকে, আমার খুব কষ্ট হয়, কান্দতে ইচ্ছে হয়, সূর্য ডুবছে নদীতে, আমার ঝাপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, আমি কি সূর্য উঠবে, আমি কিছু দেখতে পাই না, সবুজ গাছগুলোকে কালো মনে কর, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, রওশনের মুখটি আমি মনে করতে চাই, মনে করতে পারি না, কিছুই আমি মনে করতে পারি না, আরেকবার রওশনকে দেখতে ইচ্ছে হয়, রওশন বাধানো কবরের পাশে দাঢ়িয়ে আছে, আমি আর বাড়ি ফিরবো না, অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো, আমাকে কেউ আর দেখতে পাবে না, রওশনকে নিয়ে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়, যেনো আমি রওশনদের বাঁশবাগানে গিয়ে দাঢ়িয়েছি, রওশন আমাকে দেখতে পেয়েছে জানালা দিয়ে, পালিয়ে চলে এসেছে রওশন, আমরা নৌকোয় উঠে ভেসে চলেছি, আমরা নিজেদের জড়িয়ে ধরে কান্দছি। কিন্তু আমি সঙ্ক্ষায়ই বাড়ি ফিরি, যেমন আগে ফিরতাম। আমি খুব শূন্য বোধ করি, রওশনই আমাকে প্রথম দেয় শূন্যতার বোধ। আমি কি ভেঙে পড়বো, পনেরো বছর পাঁচ মাসের আমি নিজেকে বারবার প্রশ্ন করি, আমি কি ভেঙে পড়বো? আমার ইচ্ছে হয় ভেঙে পড়তে। কে যেনো আমার ভেতর থেকে বলে, না। ঘুমোতে আমার কষ্ট হয়, আমি ঘুমোতে পারি না, আমি ঘুমোতে জানি না; চোখ বুজলেই আমি একটি লোককে দেখতে পাই, যাকে আমি কখনো দেখি নি, লোকটি রওশনের ব্লাউজ খুলছে, আমার রক্ত জুলছে, দুটি লাল রঙলাগা চাঁদ বেরিয়ে পড়ছে, আমি দেখতে পাই লোকটি রওশনের লাল রঙলাগা চাঁদ ছুচ্ছে, কালো হাত দিয়ে রওশনের চাঁদ দুটিকে পিষছে লোকটি, আমি কেপে উঠি, ঘুমোতে পারি না; আমি দেখতে পাই লোকটির হাত আরো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, লোকটি রওশনের শাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে কালো হাত

দিয়ে, রওশন নগ্ন, লোকটি একবার মেঘ দেখতে পাচ্ছে রওশনের, মেঘের আড়ালে লোকটি সোনার খনি খুঁজছে, আমি দেখতে পাই লোকটি উলঙ্গ হচ্ছে, লোকটি রওশনের সাথে অসভ্য কাজ করছে, আমি নিঃশব্দে চিৎকার ক'রে উঠি, একবার মনে হয় রওশন লোকটিকে সহ্য করতে পারছে না, সে বাধা দিচ্ছে লোকটিকে, আমার একটু ভালো লাগছে, কিন্তু রওশন লোকটিকে ফেরাতে পারছে না, লোকটি অসভ্য কাজ করছে, রওশন শুধু শয়ে আছে চিৎ হয়ে, পরমুহূর্তেই আমার মনে হয়, আমি দেখতে পাই, রওশনের ভালো লাগছে; রওশন লোকটিকে চুমো আছে, লোকটিকে রওশন জড়িয়ে ধরছে নিজের লাল রঙলাগা দুই চাঁদের মধ্যে, লোকটি উলঙ্গ হয়ে রওশনকে পা ছড়াতে বলছে, আমি দেখতে পাই, সুখের ঘোরে পা ছড়িয়ে দিচ্ছে রওশন, লোকটি রওশনের মেঘের ভেতরে চুকছে, রওশন চোখ বন্ধ করে সুখে জড়িয়ে ধরছে লোকটিকে, রওশন কেমন শব্দ করছে, আমি দেখতে পাই রওশন লোকটির তালে তালে শরীর দোলাচ্ছে, রওশনের ঘোবন সুধা পান করছে লোকটি, রওশন তাকে আরো সুধা পান করতে দিচ্ছে, লোকটি রওশনের ঘোবন সুধা প্রাততর পান করছে দিনভর পান করছে, আমি নিঃশব্দে চিৎকার ক'রে উঠি, আমি পুয়েতে পারি না, মনে মনে বলতে থাকি, রওশন তুমি বলেছিলে আমিই পাবি আবো তোমার ঘোবন সুধা, আমার সাথেই তুমি করবে অসভ্য কাজ, তুমি কথা সাবো নি, আমিও কথা রাখবো না; আমিও অসভ্য কাজ করবো, আমিও ঘোবন সুধা পান করবো, তখন তুমিও পুয়েতে পারবে না।

আমার প্রথম ব্রিজটি, যেটি তৈরির সাথে আমি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম, যার নকশাই করেছিলাম আমি সাটি ওপর করতেই ভেঙে পড়েছিলো; মনে হচ্ছিলো ফুলবর নদীর ওপর আমার ব্রিজ কেবো সিন দাঢ়াবে না; কিন্তু এখনো ওই ব্রিজ দাঢ়িয়ে আছে, আরো কয়েক দশক দাঢ়িয়ে থাকবে। বেশ সুন্দর নাম ছিলো ব্রিজটির, নদীটির নাম আরো সুন্দর; তবে নদীটি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো দুই তীরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি, নদীর ওপর সঙ্গীত নেবা, সহজ কাজ নয়। আমার মনে প্রশ্নাই জাগিয়ে দেয় যে যা বিচ্ছিন্ন, তা কি আসলেই সম্পর্কিত হতে চায়; কিছু কি আসলেই পারে সম্পর্কিত হতে? ফুলবর নদীর দু-তীরের সম্পর্ক ছিলো না, আমি সম্পর্কের একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করছিলাম; নদীর ওপর ব্রিজের কাজ চলছিলো ঠিকঠাক; ব্রিজটি বেশি বড়ো হবে নয়, আট শো ফুটের মতো দীর্ঘ, পাশে বত্রিশ, আমি নিশ্চিত ছিলাম সব কিছু ঠিক সময়ে ঠিক মতো হয়ে যাবে, কিন্তু হঠাৎ বন্যা আসে। বন্যা হঠাৎই আসে; রওশন ও আমার ব্রিজ, ফুলবর নদীর ব্রিজের অনেক আগে, হঠাৎ বন্যায়ই ভেসে গিয়েছিলো; আমি নদীর ওপর ব্রিজ বানাতে গিয়ে দেখি সেভাবেই বন্যা আসছে। যমুনার বাঁধ ভেঙে প্রচণ্ড স্রোত বইতে শুরু করে ফুলবর নদী দিয়ে, ওই স্রোতের বড়ো কাজই হয় দু-দুটি ভিত্তিকূপ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার চোবের সামনেই ঘটনাটি ঘটে, অনেকেই চিৎকার ক'রে উঠেছিলো, ঠিকাদারের চিৎকার ছিলো শোনার মতো, কিন্তু আমি ওই দৃশ্য দেখছিলাম নির্বিকারভাবে। ভিত্তিকূপ তৈরি হচ্ছে দেখে আমার যেমন লেগেছিলো, ভেসে যাচ্ছে দেখে তার থেকে ভিন্ন কোনো আবেগ আমার জাগে নি। কাঠামোর কাজ

অবধারিত ভেঙে পড়াকে বিশেষ একটা সময়ের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা; ওই ভিত্তিকূপ নিজেও কাঠামো, একদিন ধৰ্ম হয়ে যেতোই, তবে ওই কৃপের কাছে আশা করেছিলাম একটা বিশেষ সময়ের জন্যে ওটি টিকে থাকবে, কিন্তু টিকে থাকতে পারে নি। কিছুই টেকে না, সব কিছুই ভেঙে পড়ে, কোনোটি আগে কোনোটি পরে।

ভিত্তিকূপ ধ'সে পড়েছিলো ব'লে আমরা দয়ে যেতে পারি নি; বিজ আমাদের দরকার, ফুলবর নদীর ওপর বিজ দরকার, সম্পর্ক দরকার। আগে যেতাবে ভিত্তিপ্লাপনের পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, তা আর চলে নি; অন্যভাবে অন্যথানে ভিত্তিপ্লাপন করতে হয়েছিলো আমাদের বিজের নকশাও বদল করতে হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে; কিন্তু আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম একটি বিজ, নদীর দুই পারের মধ্যে সম্পর্ক। ফুলবর নদীর ওপর ওই বিজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ বুজলেই বিজটিকে দেবি আমি; ওটি আমার প্রথম বিজ, ওটি আরো অনেক বছর দাঁড়িয়ে থাকবে, সম্পর্ক পাতিয়ে চলবে উত্তরবঙ্গের সাথে ময়মনসিং আর টাঙ্গাইলের, কিন্তু ওই কাঠামো চিরকাল থাকবে না। আমি এখন একটি বড়ো বিজ নির্মাণের সাথে জড়িয়ে আছি। এ-বিজ সরকারের একটি বড়ো কৃতিত্ব ব'লে গণ্য হবে, অনেক বিদেশি টাকা ভিত্তি করতে পেরেছে তারাও; যে-মন্ত্রীটি এ-এলাকায় দিন দিন অপ্রিয় হয়ে উঠছে, বিজটি তৈরি হওয়ার পর সে আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে ব'লে রাজনীতিকভাবে আস্থা করা হচ্ছে, তোট এলে ছিনতাই না ক'রে সে পাশটাশ করবে, তার কাঠামোগুলো টিক থাকবে; কিন্তু আমি আর কোনো কাঠামোর ওপরই বিশ্বাস রাখতে পারছি। ক'রে উদ্বোধনের সময়ই যদি প্রধানমন্ত্রী, আর প্রত্যাশিত মন্ত্রী, আর একপাল রাজনীতিজ্ঞের বিজটি নদীর ভেতর তলিয়ে যায়, তাদের আর খুঁজে না পাওয়া যায়, তাতে অসম বুব কষ্ট পাবো না; বরং চোখ ভ'রে সেই দৃশ্য নির্বিকারভাবে দেখবো। কির আবলেই কি আমি নির্বিকারভাবে দেখবো, দেখতে পারবো? আমি কি এতোটা নির্বিকার হয়ে উঠতে পেরেছি?

চল্লিশ পেরিয়েছি, সব মিলে ভালোই আছি; আমার ব্যক্তিগত কাঠামোটি ও চমৎকারই ব'লে মনে হচ্ছে, যদিও এর ওপরও আমি বিশ্বাস রাখি না, যে-কোনো সময় এটা ধ'সে পড়তে পারে। মনে মনে একটা তয় আছে আমার, ধ'সে পড়ার তয়, আমি ধ'সে পড়তে চাই না। দিন দিন আরো আকর্ষণীয় হচ্ছি শুনতে পাই; এমন অনেকের মুখে শুনি যে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না, চুপচাপ ভেতরে জমিয়ে রাখি। সৌন্দর্য আর প্রশংসা সব সময়ই ভালো। যে-বিজটি তৈরি করছি এখন, যার নকশা আমিই করেছি, দেখাশোনা করছি, সেটি আমাকে উদ্বেগে রাখছে বছর দুই ধরে, কেনো যেনো আমার তয় হচ্ছে এটি ভেঙে পড়বে। হয়তো ভেঙে পড়বে না, আসলে ভেঙে পড়বেই না, আমার ব্যক্তিগত কাঠামো ভেঙে পড়ার পরও ওই তয়কর নদীটির ওপর বিজটি দাঁড়িয়ে থাকবে, দুই পারের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলবে; তবু আমার তয় হয় বিজটি ভেঙে পড়বে, আমি দেখতে পাই ভেতরে ভেতরে এটি জীর্ণ হচ্ছে, এটি ভেঙে পড়ছে। এটি ভেঙে পড়ছে দেখার সময় আমি অন্য কিছু দেখতে পাই, আমার পাড়াটিকে দেখতে পাই। আমি এক ভালো আবাসিক এলাকায়ই থাকি, অধিকাংশেরই গাড়ি আছে, কারো কারো একাধিক আছে; বাড়িও আছে অনেকের, যাদের নেই তাদের

শিগগিরই হবে; কিন্তু তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় তাদের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে। হয়তো তারা তা বুঝতে পারে, হয়তো পারে না; কিন্তু ভেঙে যে পড়েছে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘূম থেকে ওঠার পর একবার উত্তরের বারান্দায় যাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে দাঢ়িয়েছে, এটি আমার উৎকৃষ্ট অভ্যাসগুলোর একটি; বারান্দায় গেলে সামনের দালানের বারান্দায় বেগম আর জনাব নূর মোহাম্মদকে দেখতে পাই। যদিও তাদের সাথে আমার বিশেষ আলাপ নেই, তবু তাদের দেখলে আমার ভালো লাগে; আমি কি তাদের দেখার জন্যেই বারান্দায় যাই? তাদের বয়সের ফারাকটি একটু বেশি; নূর মোহাম্মদ নিচয়ই পঞ্জাশ পেরিয়ে গেছেন, তবে তার দেহচান বেশ বলিষ্ঠ, বারান্দায় তিনি খালি গায়েই দাঢ়ান, তাঁর বুকের লোমগুলো দেখা যায়; তাঁকে একটি স্বাস্থ্যবান মৌখের মতো দেখায়। বেগম নূর মোহাম্মদ চল্লিশ হবেন, এককালে তিনি একটি ধৰ্মবে হরিণী ছিলেন সন্দেহ নেই, সে ছাপ রয়ে গেছে তার শরীরে, যদিও তাঁর মুখ তরে ক্লান্তি নেমেছে। তাঁর মুখে দূর থেকে আমি যা দেখতে পাই, তা কি আসলে ক্লান্তি? না কি ভোরবেলাকার রোদে আমি ঠিক মতো তাঁর মুখটি দেখতে পাই না? তাদের আমি প্রতিদিনই বারান্দায় দেখতে পাই, কিন্তু কখনো তাদের কথা বলতে দেবি না,

একজনকে আরেকজনের দিকে তাকাতেও দেবি নাম নূর মোহাম্মদ অনেকক্ষণ ধরে নিজের বুক ঘালিশ করেন, আর দক্ষিণপশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকেন; আবার কখনো কনুই বারান্দার রেলিংয়ের ওপর রেখে খালিটো ভেঙে দাঢ়ান, নিচের মাটি দেখেন। বেগম নূর মোহাম্মদ বসেন এক কাপ ছিয়ে, চায়ের কাপটি তিনি বারান্দার রেলিংয়ের ওপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে দুরে রাখেন, কিন্তু চায়ের পেয়ালায় তাঁকে মুখ দিতে বিশেষ দেবি না, পুর দিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন ভাবলেশহীনভাবে। আমি অনেকবার খেয়াল করে দেখেছি তাঁর মুখে কোনো ভাবের আভাস দেখা যায় কি না, তিনি নূর মোহাম্মদ সাহেবের দিকে বিরক্তির সাথেও অন্তত একবারও তাকান কি না, কিন্তু আমি তা দেখতে পাই নি।

বেগম ও জনাব নূর মোহাম্মদ কি সারারাত শারীরিক শ্রম করার পর ক্লান্তি? এ-বয়সে অধিক নৈশ শ্রম কি পোষাঙ্গে না তাদের? তবু তাঁরা শ্রম করে চলছেন? মেয়েটি তাদের দিনিতে, ছেলেটি নিউইঞ্জেকে ব'লে আবার একটি শিশু আনতে চাইছেন তাঁরা? শ্রমের ক্লান্তি নিয়ে সকালবেলা তাঁরা কি একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর আগ্রহও বোধ করেন না? তবে তাঁরা কি সারারাতে একবারও, ঘুমের মধ্যেও, একজন ছুয়েছেন আরেকজনকে? আমি জানি না, আমার জানার কথা নয়, তাঁরা এক শয্যায় ঘুমোন কি না, একই ঘরে ঘুমোন কি না। দেখে মনে হচ্ছে এখন তাদের একজন হঠাতে বারান্দায় পড়ে গেলে আরেকজন খুব বিরক্ত হবেন; বেগম নূর মোহাম্মদের খুব খারাপ লাগবে চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে উঠে দাঢ়াতে, নূর মোহাম্মদ সাহেবের খারাপ লাগবে রেলিং থেকে কনুই সরিয়ে সোজা হয়ে দাঢ়াতে। তাদের একজন পুরুষ আরেকজন মেয়েলোক, একই ঘরে তাদের থাকার কথা ছিলো না; কিন্তু তাঁরা পরস্পর বিবাহিত ব'লে, একজন স্বামী আরেকজন স্ত্রী ব'লে-যেমন ফিরোজা ও আমি বিবাহিত ব'লে,

থাকছি, তারাও থাকছেন, অনেক বছর ধ'রে তাদের একজনের শরীরের ওপর আরেকজনের অধিকার স্বাই মনে নিছে; কিন্তু তারা এতো দূরে কেনো? তাদের দেখে যেমন মনে হচ্ছে তাতে বিশ্বাসই করতে কষ্ট হচ্ছে কবনো তাদের একজন উলঙ্গ দেখেছেন আরেকজনকে। না দেখলে তারা এতো দিন একসাথে থাকতে পারতেন না, নিচয়ই দেখেছেন, হয়তো আজ রাতেই দেখেছেন, কিন্তু একই বারান্দায় তারা এতো দূরে কেনো?

আমি নুর মোহাম্মদ আর বেগম নুর মোহাম্মদের কথা ভাবছি কেনো, নিজের কথাই তো ভাবতে পারি; ওরা দুজন অন্তত ভোরবেলা একসাথে বারান্দায় আসেন, কিন্তু আমি তো একলাই আসি, ফিরোজা বারান্দায়ও আসে না। ফিরোজ আসে না ব'লে কি আমার খারাপ লাগে? আমি কি চাই এই এখন যখন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে নুর মোহাম্মদ দম্পত্তিকে দেখছি, তখন ফিরোজা আমার পাশে এসে দাঁড়াক, আমরা একসাথে সামনের দালানের দম্পত্তিকে দেখি, দূরের দু-একটি পাখি আর গাছের ডালে পাতার সবুজ দেখে মুঝ হই? না, আমি চাই না ফিরোজা এখন আমার পাশে এসে দাঁড়াক; সে এসে দাঁড়ালে আমার বিরক্তি লাগবে, আমি অবশ্য তা প্রকাশ করবো না, একটু হাসারও চেষ্টা করবো হয়তো, কিন্তু আমি চাই না ফিরোজা এখন আমার পাশে এসে দাঁড়াক। শামী-স্ত্রী খেলা যথেষ্ট হয়েছে, এবেরবেলা তা আর খেলতে ভালো লাগবে না। ফিরোজা যে আসে না এতে আমার খারাপ লাগে না, বরং অত্যন্ত ভালো লাগে; সে এলে আমি বেগম নুর মোহাম্মদকে দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারতাম না, বা আমি আসা বন্ধ ক'রে দিতাম। ফিরোজা আসে না ব'লে আমার ভালো লাগে। তাহলে ফিরোজা কি আমাকে ঝাউ করে, আমি কি ঝাউ করি ফিরোজাকে? এখন আমি যদি ফিরোজাকে ডাকি, সে কেবলমাত্র করতে করতে ছুটে আসবে? সে আমার ডাক শুনতেই হয়তো পাবে না, যেন আমিও তার ডাক শুনতে পাই না মাঝেমাঝে।

আমাদের-ফিরোজার ও আমার-ব্রিজটি ভেঙে পড়ছে ব'লেই মনে হচ্ছে; ঠিক ভেঙে পড়ছে না, তবে ওই সাঁকো দিয়ে অনেক দিন আমরা চলাচল করছি না; কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর কোনো পায়ের শব্দ নেই। ফিরোজার মুখ দেখার জন্যে আমি কোনো ব্যাকুলতা বোধ করি না, বেশির ভাগ সময় না দেখলেই ভালো লাগে; ফিরোজারও তাই হয় নিচয়ই, আমার মুখের দিকে সে অনেক দিন তাকায়ই নি, আমিও বোধ হয় তাকাই নি, মাঝেমাঝে আমি তার মুখটিকে মনে করতে পারি না। আমরা যে একজন ঘেন্না করি আরেকজনকে, পাশাপাশি বসতে আমাদের বমি পায়, এমন নয়; কিন্তু আমরা কোনো উল্লাসও বোধ করি না। ফিরোজাকে দেখে আমি অনেক বছর চলে হই নি; বাসায় ফিরে যখন দেখি সে বাসায় নেই, তখন দু-একটি সন্দেহ মনে উঠি দেয়, কিন্তু কোনো উদ্বেগ বোধ করি না; যখন দেখি সে ফিরে আসছে তখন কোনো কাঁপন লাগে না। আমাদের সব কি ঠিক আছে? আমরা কি ঠিক আছি? একটি বেজি দৌড়ে যাচ্ছে দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছটির পাশ দিয়ে, চুকছে জঙ্গলের যথে, দেখে আমার ভালো লাগছে, মন ভ'রে উঠছে; ফিরোজা যদি ওই বেজিটি হতো, দেখে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু আমরা শামী-স্ত্রী, ভোরবেলা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশ দিয়ে দৌড়ে

যাওয়া বেজি আমরা কোনো দিন আর হয়ে উঠতে পারবো না আমাদের কাছে।
আমাদের সব কিছু কি ঠিক আছে?

আমরা এক বিছানায় ঘুমোই না, আমারই এটা তালো লাগে না; ঘুমোনোর সময় কারো একটা হাত বা পা আমার গায়ে এসে পড়লেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুমোনার সময় আমার গায়ের ওপর বিশ্বসুন্দরীর বাহু, শন, জংঘাও আমার সহ্য হবে না। আমি কামত্রেয়হীন ঘুম পছন্দ করি। ঘুমোতে যেতে সাধারণত আমার দেরি হয়; আর ফিরোজার রাত্রিজ্ঞান একান্ত নিজস্ব ও অস্ত্রুত, কোনো দিন সক্ষ্যার পরই তার মনে হয় রাত গভীর হয়ে গেছে, আর জেগে থাকা যায় না, সে আর জাগতে পারে না, বালিশ জড়িয়ে ধ'রে শয়ে পড়ে, মানুষের পৃথিবী তখন তার তালো লাগে না তার শোয়ার ভঙ্গি দেবেই বোৰা যায়। আমি কোনো কোনো দিন দেরি ক'রে ফিরি, দেখি ফিরোজা ঘুমিয়ে পড়েছে; ঘুমন্ত মানুষকে ডাকতে আমার ইচ্ছে হয় না, খুব শারীরিক দরকারেও না। একটি ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলে জাপিয়ে প্রস্তুত ক'রে দরকার মিটিয়ে আরেক বিছানায় গিয়ে শয়ে পড়ার কথা তাবতেই আমার ঘেন্না লাগে। আবার কখনো রাত দশটায় ঘুমোতে গিয়ে দেখি ফিরোজার মনে হচ্ছে রাতই হয় নি, তার একটা অনুষ্ঠান দেখা দরকার, একটি সিনেমা পত্রিকার করেক পাতা পড়া তার বাস্তক আছে; তখন শয়ে পড়ি, রাতে আর আমাদের দেখা হয় না। কোনো কোনো ঘুমন্ত আমার ঘুম আসে না, অনেকটা শারীরিক দরকারেই, দরকারটা মিটে গেলে একটা চমৎকার ঘুম হ'তে পারতো; কিন্তু আমি ফিরোজাকে ডাকি না। এটা চ'লে আসছে অনেক বছর ধ'রে, কিন্তু আমরা বেশ আছি; তবে আমার মনে হয় আমাদের কিছু একটা হয়েছে। আমাদের সাঁকোচিতে আর চলাচল নেই; অন্ত আর আমাদের পায়ের ছাপ পড়ে না; ওটি আছে, সবাই দেখছে, আমরাও দেখছি, এই সব।

আমি জানি না ফিরোজা-আর কোনো ব্রিজ আছে কি না, কিন্তু আমি যতোই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি ততোই আকৃষণীয় হচ্ছি, আর ততোই আমার ব্রিজের সংখ্যা বাঢ়ছে; সেগুলোতে চলাচলও অনেক বেশি। ফিরোজা-আমি বিবাহিত, আমরা স্বামীস্ত্রী, এটি আমাদের সর্বজনস্বীকৃত ব্রিজ, এটিই আমার একমাত্র ব্রিজ ব'লে অন্যরা মনে করার তান করে, আমিও করি। এ-ছাড়া অন্য কোনো ব্রিজ অন্যরা মেনে নেবে না, যদিও তারাও নিজেদের ব্রিজে হেঁটে হেঁটে ঝান্ত, তারাও অন্য ব্রিজ তৈরি ক'রে চলছে, বা তৈরি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। একটি পুরুষ আর একটি নারী কতো দিন একসাথে থাকার পর ঝান্ত হয়? কতোবার একসাথে ঘুমোনোর পর, ঠিক কতোটি সঙ্গমের পর, তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ হারায়? মানুষের গঠন আমি জানি না; আমি জানি না মানুষের ভেতরে এমন কিছু আছে কি না যা পালন করে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার দায়িত্ব; আছে নিশ্চয়ই, আমি তা টের পাই, বারবার আমি টের পেয়েছি; কিন্তু সেটি শক্তি কতোটা? কতো দিন সেটি আকর্ষণ বোধ ক'রে যেতে পারে? ওই আকর্ষণ বোধ করার শক্তিটির নামই সম্ভবত প্রেম। প্রেম বিয়ের শর্ত নয়, বিবাহিত জীবনেরও শর্ত নয়, কোনা ধর্মই চায় না স্বামীস্ত্রী প্রেমের মধ্যে থাকবে; এখন মানুষ একটু বেশি * দাবি করছি বিয়ের কাছে, তান্তে তালো শোনায় ব'লে। কোনো কালে কোনো স্বামীস্ত্রী সব কিছু ভেঙে পড়ে-৫

ভালোবেসেছে একে অন্যেকে, এটা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না; সহবাস, সঙ্গম, সত্তান, দায়িত্ব এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়া, বেশ এই, এই তো বিয়ে। যেমন আমরা, ফিরোজা আর আমি, আমাদের মধ্যে বিশেষ কোনো গোলমাল নেই, সবই ঠিক আছে; কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও একটি বড়ো গোলমাল ঘটে গেছে, যার জন্যে আমি দায়ী নই, ফিরোজাও দায়ী নয়।

ভাত খেতে বসেছি, খাওয়া আমার শেষ হয়ে এসেছে, ফিরোজা আমার পাতে বড়ো এক চামচ ভাত তুলে দেয়।

‘আমি তো ভাত চাই নি’, আমি অবাক হয়ে বলি।

‘চাও নি তাতে কী’, ফিরোজা বলে, ‘ভাত তো তুমি নিতেই।’

‘তুমি কী ক’রে জানলে?’ আমি বলি।

‘অন্য কেউ দিলে বুব তো বুশি হ’তে, আমি দিচ্ছি বলেই’, ফিরোজা বলে।

আমি আর কথা বলি না, ভাত খাই; আমি পছন্দ করি না আমার পাতে কেউ ভাত তুলে দিক; এটা আমার ক্ষটি, ভাত তুলে দিলে বুশি হ’তে, কিন্তু আমি হ’তে পারি না। কেনো হ’তে পারি না? ফিরোজা আমার পাতে ভাত তুলে দিলে আমার কেনো ভালো লাগে না, সে কি ফিরোজা ব’লে? অন্য ক্ষটি হ’লে সত্যিই কি আমি আনন্দিত হতাম? ফিরোজার ভাত তুলে দেয়ার মধ্যে আমি কোনো চাষ্টল্য দেবি না, আমার পাতে ভাত তুলে দিয়ে সে সুখ পাচ্ছে, আমার মনে হয় না; এমনকি সে একটি দায়িত্ব পালন করছে, এটা তাও নয়। হচ্ছে যদি আমার হাত অবশ হয়ে গেছে, দুষ্টিনায় একটি হাত হারিয়ে ফেলেছি, অত তুলতে পারছি না, সে তুলে দিচ্ছে, একটি উপকারী দায়িত্ব পালন করছে, তাইলে কৃতজ্ঞ বোধ করতাম; কিন্তু এই হঠাত ভাত তুলে দেয়ার মধ্যে একটু প্রতৃত্ব করে বোক আছে, সে আমার বৈধ স্ত্রী, যখনতখন ইচ্ছে করলেই সে আমার পাতে ভাত তুলে দিতে পারে, আমার দরকার থাক বা না থাক।

আমি এক কাপ চা খেতে চাই। কাজের মেয়েটি জানে আমি ঠিক কী রঙের চা খেতে পছন্দ করি; মেয়েটি দু-মাসেই শিখে ফেলেছে, জেনে ফেলেছে ঠিক কতোটা চিনি চাই আমার; ফিরোজা অবশ্য তা জানে না, তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই, বরং আমি কখনোই চাই না ফিরোজা আমার জন্যে চা তৈরি ক’রে আনুক। চা বানানোর মতো একটি কাজের জন্যে কাজের মেয়েই যথেষ্ট, তার জন্যে একটি বিবাহিত স্ত্রী দরকার পড়ে না। কাজের মেয়েটি পিরিচটি বুব যত্নের সাথে মোছে একফোটা চাও তাতে লেগে থাকে না; চা খাওয়ার আগে আমি চামচ দিয়ে চা নাড়তে পছন্দ করি, মেয়েটি হয়তো দেখেছে, বা আমিই হয়তো তাকে ব’লে দিয়েছি চায়ের সাথে চামচ দেয়ার, তাই সাথে সে একটি পরিচ্ছন্ন চামচও দেয়। আমি ওই চা খেয়ে তৃণি পাই। আমি মনে মনে চাই মেয়েটি চায়ের পেয়ালা আমার সামনের টেবিলে এনে রাখুক। মেয়েটিকে একবার দেখে কি আমার ভালো লাগে? আমি জানি না, তবে সচেতনভাবে মেয়েটিকে দেখার আগ্রহ আমার হয় নি কখনো। কোনো কোনো দিন ফিরোজা মেয়েটির হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে আমার সামনে রাখে, কয়েক ফোটা চা ছলকে পিরিচে পড়ে, চামচটি মেঝেতে প’ড়ে যায়; চামচটি উঠোনোর জন্যে ফিরোজা

মেয়েটিকে ডাকতে থাকে। আমার আর চা খেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু চা আমি বাই; না খেলে একটা ঘটনা ঘটে যাবে, আমি অমন ঘটনায় অংশ নিতে চাই না। বাবাকেও দেখেছি কদবানের হাতের চা সুবের সাথে খেতে, মা চা নিয়ে এলে বাবার সামনে চা অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকতো, ঠাণ্ডা হয়ে যেতো; তারপর মা তাড়া দিলে তিনি একবারে চা গিলে ফেলতেন, সে-দিন আর চা খেতেন না।

আমার ছোটো বোনটি, ইসমত, একটি সমস্যায় পড়েছে; তাকে আমার উদ্ধার করতে হবে, যদিও উদ্ধার করা অসম্ভব আমার পক্ষে, এসব ক্ষেত্রে কেউ উদ্ধার করতে পারে না। ইসমত আমার ছোটো বোন, ওকে আমি পছন্দ আর অপছন্দ দুটোই করি, ও তার একটার ব্ববরও জানে না; আমি কখনো প্রকাশ করি নি ওকে আমি পছন্দ করি, এও জানতে দিই নি ওকে আমি অপছন্দ করি। এমএ পর্যন্ত ওর আসার কথা ছিলো না, বাবা-মা কেউ চায় নি, তেরো বছর থেকেই ওর বিয়ের চেষ্টা চলছিলো, আমি বাধা দিয়েছি, ও নিজেও বাধা দিয়েছে। সবাইকে অবাক ক'রে ইসমত এমএ পর্যন্ত চ'লে আসে; এবং এমএ পড়ার সময়ই আমাদের না জানিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলে। ছেলেটা এক ক্লাশ নিচে পড়তো ওর থেকে, ত্যাদরও ছিলো কেৱল ক্লাশের সব কিছু সে সবার চেয়ে বেশি জানতো, কাউকেই পাঞ্চা দিতো না, অসম সাথে দু-একদিন এমনভাবে কথা বলেছে যেনো আমি ক্লাশ ফোরের ছাত্র। এ-ক্লিয়ে সবাই থেপে উঠেছিলো ইসমতের ওপর। আমি থেপি নি। ওর বিয়ে করার ইচ্ছা বা দরকার হয়েছে, ও বিয়ে করেছে, তাতে আমার কী; একটা চাঁড়ালঢ়ে যদি ও বিয়ে ক'রে থাকে, চাঁড়ালের সাথেই যদি ও ঘুমোতে চায়, তাতে আমি বাধা দিতে পারি না। শরীরটা ওর, জীবনটা ওর। বিয়ে করাটা দরকারই হয়ে পড়েছিলো ওর জন্যে, নইলে প্রথম ভাগনেটি পিতা পরিচয় ছাড়াই জন্মাতো, ক'বৈ ভালো লাগতো না, ঝামেলা হতো। ইসমত আর তার ত্যাদরটি বেশ প্রজননশীল ছিলো, বিস্তৃত হচ্ছিলো তারা তীব্র বেগে, চার বছরেই চার চারটি বাচ্চা জন্মাতে পেরেছিলো; একটা বাচ্চাকে ইসমতের পেটে রেখেই ত্যাদরটি এক সন্ধ্যায় খুন হয়ে যায়। খুন হয়ে যাওয়ার পর আমি প্রথম বুঝতে পারি ত্যাদরটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

ইসমত ভালো চাকুরিই করে, তবে নিচয়ই ওর কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে, কিন্তু ও কারো সাহায্য চায় নি; বরং ও-ই সাহায্য করে অনেককে। গ্রাম থেকে আজীয়রা এসে আমার বাসায় ওঠে না, হয়তো সাহস করে না, বা স্বত্ত্ব পায় না, এতে আমার ভালোই লাগে; ওঠে ওর বাসায়, এতে আমার কিছুটা খারাপই লাগে। আমি দু-একজনকে আমার বাসায় উঠতে ব'লেও দেখেছি, তারা এককাপ চা খেয়ে চ'লে যায়, আর আসে না। একবার আমি অনেক রাত পর্যন্ত একজনের জন্যে না খেয়ে ব'সে ছিলাম, সে আসে নি; ফিরোজা অবাক হয়েছিলো গ্রামের একটি আজীয়ের জন্যে আমার ব'সে থাকা দেখে। বছর চারেক আগে ইসমত একটি হিন্দু ছেলেকে-হিন্দু বলা ঠিক হচ্ছে না মনে হচ্ছে, কেউ কেউ আমাকে সাম্প্রদায়িক ভাবতে পারে-বাসায় জায়গা দেয়; ছেলেটা আমাদের গ্রামেরই, ওর পিতাকে আমি মাছটাছ বিক্রি করতে দেখেছি, মদনকুমার না হরিপদ নাম ছেলেটার, রাস্তায় রাস্তায় ঘূরছিলো, কিন্তু অত্যন্ত চৌকশ

ছেলে সে। এর বেশি সংবাদ আমি রাখি না, তবে তুনি যদন নাটকটাটক ক'রে খুব নাম করেছে, এক পত্রিকায় আমি তার সাক্ষাৎকারও পড়েছিলাম। অভিনয় যে এখন এতো শ্রদ্ধেয় ব্যাপার হয়ে দাঢ়িয়েছে, আমার জানা ছিলো না, যদনকুমারের সাক্ষাৎকার পড়েই আমার চোখ খুলে যায়; ফেলটেল করা বাউলুলেরাই এসব করে ব'লে আমি জানতাম, ওর সাক্ষাৎকার প'ড়ে বুঝতে পারি অভিনয় আজকাল শ্রেষ্ঠ প্রতিভারাই করেন। তাই হবে, এ পর্যন্ত কেউ আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসে নি। ছোকরাকে মনে মনে আমি একটু ঈর্ষাও করি। ইসমত ছোকরাকে বিয়ে করছে তুনে আমি উজ্জেবিত হই নি, ভালোই লাগছিলো, আঘরা তো আর ব্রাক্ষণ নই; মা কিছুটা উজ্জেবিত হয়েছিলো; কিন্তু ইসমত যা করতে চায়, তা সে করে। ইসমতের একটি পুরুষ দরকার ছিলো, ছোকরার একটি থাকাখাওয়ার জায়গার দরকার ছিলো, আমি আপত্তির কিছু দেবি নি। ছোকরা দেখতে বেশ, ইসমতের প্রথম ত্যাদরটা থেকে অনেক বেশ, গজারমাছের মতো, বয়সে বছর দশেকের ছোটো; ইসমত নিশ্চয়ই সব কিছু পরবর্তী ক'রেই নিয়েছে। খোকাও হয়েছে একটি বছর দুয়েক আগে, কিন্তু ইসমত এখন একটু সমস্যায় পড়েছে।

‘দাদা, একটু বাধা দাও এতে’, ইসমত খুব আবেগে সাথে বলে আমাকে, কেঁদেও ফেলতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে। ইসমতকেও এতোটা বিহ্বল হ'তে আমি আগে কখনো দেবি নি; ত্যাদরটা খুন হয়ে যাওয়ার পরও ইসমত এতটা কাতর হয় নি।

‘আচ্ছা, দেবি’, আমি বলি, ‘আজই দেবি হি।’

‘তোমার সাথে তো মেয়েটির সাথে পরিচয় আছে, তুমি তার সাথে একবার কথা বলো’, ইসমত বলে, ‘যদন একটা বিশ্বাসঘাতক হবে আমি কখনো ভাবি নি।’ গলা ধ'রে আসতে চাচ্ছে ইসমতের খুব কষ্ট পাচ্ছে, আরো কষ্ট পাবে ইসমত।

‘তুই জানতি না আশে? আমি বলি।

‘এসব ব্যাপারে বউ জানে সবার পরে’, ইসমত বলে, ‘এখন দেবি সবাই জানে অনেক আগে থেকে, তখন আমি ছাড়া।’ ইসমতকে বেশ অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে। ‘অবাক লাগছে, আমাকে একবারও কেউ বলে নি।’

যদনকুমার কয়েক দিন ধ'রে ইসমতের বাসায় আসছে না। আগে যদন দুপুরে আসতো না, তাতে ইসমতের কোনো সন্দেহ হয় নি। কিন্তু রাতে না আসায় ইসমত প্রথমে তয় পায় পরে খবর পায় যদন একটি তেলতেলে বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে অন্য এক বাসায় উঠেছে। ইসমত বেশ কষ্ট পাচ্ছে, মেয়েটি বাচ্চা ব'লে বেশি কষ্ট পাচ্ছে, বুড়ি হ'লে এতো কষ্ট পেতো না, হঠাতে ইসমত নিজেকে বুড়ি ভাবছে, ইসমতের মুখে প্রতারিতের অপমানিতের মুখ দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটির মায়ের সাথে আমার পরিচয় আছে। মেয়েটির বাবা আমাদের ফারেই ছিলেন, তাঁর কাছে ব্রিজের অনেক কিছু আমি শিখেছি, কয়েক বছর আগে হঠাতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে ব্রিজট্রিজ ফেলে রেখে চ'লে গেছেন। মেয়েটিকেও আমি চিনি, আমি বুঝতে পারছি ইসমতকে উদ্ধার করতে আমি পারবো না, কেউই পারবে না, ইসমতের ধ'সে পড়া ব্রিজ আমি সারাই করতে পারবো না; শুই মেয়েকে ছেড়ে যদন ইসমতের কাছে ফিরবে না। দেশ খুব সাম্প্রদায়িক হয়ে

উঠছে, দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু মদন দেখছি একটি মুসলমান মেয়েকে নিকে ক'রে চলছে। মেয়েটির নামও আমার মনে পড়ছে, তিলোত্তমা, ইসমতই মনে করিয়ে দেয়। মেয়েটি আমার কোলেও দু-একবার বসেছে। ফয়েজ সাহেবের বাসায় আমি বেশ কয়েকবার গেছি, মেয়েটি তখন মাধ্যমিকে পড়ে হয়তো, খুব বলমলে, উপচে পড়ছে সব কিছু। সে এসেই কোলে বসতো, জড়িয়ে ধরতো। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম, উত্তাপও; ফয়েজ সাহেব কিছু মনে করতেন না, তবে আমি যে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি তাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন।

‘ভাবী, আমি মাহবুব বলছি, আমাকে চিনতে পারছেন?’ আমি ফয়জুন্নেসা ফয়েজকে ফোন করি, ‘আপার সাথে আমি একটু দেখা করতে চাই।’

‘আমার সাথে আজকাল আর কে দেখা করে’, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ একটু শ্বাস একটু ক্ষেত্রে মিলিয়ে বলেন, ‘আমার কি সেই দিন আছে!'

‘দুঃখিত ভাবী, আপনার কথা প্রায়ই মনে পড়ে, কিন্তু সময় ক'রে উঠতে পারি না’, আমি একটু বিনয়ের ভাব করি।

‘বিনয়ের দরকার নাই, আসতে চাইলে এখনই আসুন’, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, ‘আজকাল আর এই সব জদুতা ভালো ন্যায়ে না।’

‘আমি আসছি ভাবী’, বিব্রত হয়ে আমি চেজফোন রাখি।

ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বাসায় একলাই প্লাট হেন। কয়েক বছরে বেশ বয়স হয়ে গেছে তাঁর; তবে ঠোট এখনো আগের মতোই জাল, বাহু আগের মতোই খোলা, পেট এখনো আগের মতোই আকর্ষণীয়। ফয়েজ সাহেবের তিনি দ্বিতীয়, আর ফয়েজ সাহেব তাঁর তৃতীয়।

‘মদন নামের একটি ছেলেকে’, আমি কথা শেষ করতে পারি না।

‘মদনা, দি বাস্টার্ড’, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন, ‘আপনি ওই বাস্টার্ডটার পক্ষে কথা বলতে এসেছেন?’ খুব উৎসুকি ফয়জুন্নেসা ফয়েজ।

‘না, ভাবী, আমি কথা বলতে এসেছি মদনের বিপক্ষেই। মদনের সাথে আমার ছোটো বোনের বিয়ে হয়েছিলো’, আমি বলি, ‘একটি বাচ্চাও আছে।’

‘আমি জানতাম বাস্টার্ডটা বিয়ে করেছে, একটি মুসলমান মেয়েকেই করেছে, সে যে আপনার বোন, তা জানতাম না। বাস্টার্ডটাকে আমি পছন্দই করতাম, সে বলতো সে আমাকে পছন্দ করে, বলতো আমার জন্যেই এ-বাসায় আসে, আমি বিশ্বাস করতাম। তার বড় আছে এটা কোনো সমস্যাই ছিলো না, বাস্টার্ডটাকে ভাগানোর কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। আমি চেয়েছিলাম মাঝেমাঝে সঙ্গ।’

‘আপনি মনে হয় তুল করেছিলেন’, আমি বলি।

‘তুল করেছিলাম, তবে ভাগ্য ভালো মেনোপজটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো, নইলে একটা ঝামেলা হতো’ ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলতে থাকেন, ‘হারামজাদার বাচ্চা দুপুর হ'লেই এখানে চ'লে আসতো, খেতো এখানেই, তিলোত্তমা

ওকে জড়িয়েটড়িয়ে ধরতো, কিন্তু রিলেশনটা ছিলো আমার সঙ্গেই।' খেপে ওঠেন ফয়জুল্লেসা ফয়েজ।

'এখন কী করা যায় বলুন, একটা কিছু করা দরকার', আমি বলি।

'কিছু করতে পারলে আমি নিজের জন্মেই করতাম', ফয়জুল্লেসা ফয়েজ বলেন, 'তিলোত্মা চার মাসের প্রেগন্যান্ট, আমিও দেড় বছরের প্রেগন্যান্ট হ'তে পারতাম যেনোপজটা না হ'লৈ।'

'আমার বোনটি তেজে পড়েছে', আমি বলি, 'ওও মদনকে বিশ্বাস করতো।'

'আমি কি কম তেজে পড়েছি যনে করেন?' ফয়জুল্লেসা ফয়েজ বলেন, 'মদনের সাথে দুপুরগুলোর কথা কি আমার যনে পড়ে না? যেয়ের কাছে হেবে যেতে আমার কষ্ট লাগে না? ও আমার অভ্যাসই বদলে দিয়েছিলো, রাতের বদলে দুপুর। খুব দক্ষ ছিলো মদন।'

আমি কথা হারিয়ে ফেলি, শুধু বুঝতে পারি ইসমতকে আমি উদ্ধার করতে পারবো না।

ফয়জুল্লেসা ফয়েজ বলেন, 'তিলোত্মার কাছে আমি দাঢ়াতে পারি না, তার ঘোবন আছে, আপনি তো তাকে দেখেছেন, মদনা তিলোত্মাকে রেখে আপনার বোন বা আমার কাছে ফিরে আসবে না।'

দেয়ালে তিলোত্মার ছবিটার ওপর আমার চোখ পড়ছে বারবার, আমি তার সাথে একমত; আমি যদি মদন হতাক জাতিলে কি ফিরতাম, দোয়ালের ওই ছবিটি যার, তার শরীরটি ফেলে কি পাঁচপাঁচটি কাঞ্চার মায়ের শরীরের কাছে ফিরতাম? মদনকে জেলে পাঠাতে পারি, হয়তো শাস্তিও হবে, তবে মদন আনন্দে জেলে যাবে, জেলে যেতে তার কষ্ট হবে না, কুকুর লাগবে, বেরিয়ে তিলোত্মার কাছে যাবে তিলোত্মা যতো দিন তিলোত্মা আছে, তারপর অন্য কোথাও যেতে পারে, কিন্তু তার আগে যাবে না, আমিও যেতাম না।

ফয়জুল্লেসা ফয়েজ বলেন, 'আপনার বোনের একটি পুরুষ দরকার, আমারও একটি পুরুষ দরকার, আমি এখনো বাতিল হয়ে যাই নি। পুরুষ আমি পাবো, পেতেই হবে আমাকে, রাস্তাধাটে পুরুষের অভাব নেই, কুকুর যতো ঘূরছে তারা, কিন্তু মদনার যতো একটা ছোকরা পাবো কি না জানি না।'

আমাকে উঠতে হবে, ইসমতকে আমি উদ্ধার করতে পারবো না, কাউকেই পারবো না। উদ্ধার করার কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে, আমি হয়তো সুস্থ নই, নইলে এমন নিরর্থক কাজের ভার আমি নিলাম কী ক'রে? ইসমতের একটি পুরুষ লাগবে, ইসমতকে একটি পুরুষ নিজেই খুজে নিতে হবে, তা ইসমত পাবে; ইসমত চাইলে ইসমত পারে, কিন্তু মদনকে সে পাবে না। মনে হচ্ছে মদনকে ইসমত ফিরে পেতে চায়, এখানেই আমার একটু কষ্ট হচ্ছে, যে ফিরে পেতে চায় সে ভিক্ষুক, ইসমত এখন ভিক্ষুক, আমার কষ্ট হচ্ছে, মদনকে ফিরে পেতে চায় ইসমত, হয়তো তার ঘুম হয় না। কাউকে ফিরে পেতে চাওয়ার মধ্যে গভীর যত্নগা আছে, ইসমত সে-যত্নণার

মধ্যে আছে। পরিত্যাগ করা বেশ সুবকর; যে পরিত্যাগ করে, সে ফেলে যায় বাসি মাল, যে-বাসি মাল তার আর রোচে না, সে আরো টস্টসে কিছু পেয়েছে, তার স্বাদ তীব্র, সে কোনো অভাববোধের মধ্যে থাকে না; ইসমত এখন বাসি বস্ত্র, মদনের অবাদ্য, এখন চরম অভাববোধের মধ্যে রয়েছে ইসমত, আর ফয়জুন্নেসা ফয়েজ; তাদের কাউকেই আমি উদ্ধার করতে পারবো না। আমাকে এখন উঠতে হবে।

‘আপনি মাঝেমাঝে দুপুরবেলা আসতে পারেন’, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ বলেন।

‘ধন্যবাদ ভাবী, আসতে চেষ্টা করবো, কিন্তু আমি বেশ ব্যস্ত থাকি’, আমি বলি।

‘তার মানে আমার শরীরে আপনার চলবে না’, উত্তেজিত হন ফয়জুন্নেসা ফয়েজ, ‘আপনার তরতাজা শরীর দরকার, পুরুষদের আমি ভালোভাবেই চিনি। তিলোত্তমা যদি আসতে বলতো তাহলে আপনার কোনো ব্যস্ততা থাকতো না।’

আমি বেরোনোর জন্যে উঠে দাঢ়াই, ফয়জুন্নেসা ফয়েজ উঠবেন না মনে হচ্ছে, আমার তা দরকার নেই। ইসমত অপেক্ষা ক'রে আছে, আমার খারাপ লাগছে ইসমত অপেক্ষা ক'রে আছে, অর্থাৎ আশা করছে আমি তার শান্ত মানুষের মদনকে ধ'রে নিয়ে যাবো, মদন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবে তুল হয়ে গেছে, সে আর তিলোত্তমার কাছে যাবে না, তার কাছেই থাকবে, তার কাছেই সে সুখ পায়, অন্য কোথাও পায় না, সে তিলোত্তমাকে ভালোবাসে না, ইসমতকেই ভালোবাসে। যাতে আবার এক সঙ্গে ঘুমোবে, ইসমত আশা ক'রে আছে, এটাই আমার খারাপ লাগছে। ইসমতের আজকাল ঘুম হচ্ছে না, সে খুব হতাশ হয়ে পড়েছে, পড়েছে কেকে বুড়িই মনে করছে; সে যতোবার কথা বলছে মদনকে দোষ দিচ্ছে না, বেস দিচ্ছে তিলোত্তমাকে, তিলোত্তমা একটি খানকি, সে-ই নিয়ে গেছে তার মদনকুমারকে, মদনকুমারের মতো দুধের শিশুকে, মদনকুমারের কোনো দোষ নেই, সব দোষ তিলোত্তমার। হেরে যাওয়ার কাঁটাটা ধারালোভাবে চুকে গেছে ইসমতের তেতরে, আরেকটি পুরুষ না পাওয়া পর্যন্ত কাঁটাটা গেঁথে থাকবে, তেতরে পচবে, আরো জুলা দেবে, খসবে না। শরীরটিও কষ্ট পাচ্ছে ইসমতের, এমন অবস্থায় শরীর আরো খাই খাই করে, সবখালে ব্যথা করতে থাকে, মনে হ'তে থাকে কেউ ভেঙে চুরমার ক'রে দিলে শাবল দিয়ে খুড়ে তচনছ ক'রে দিলে শান্তি হতো, ইসমতের তেমন হচ্ছে নিচয়ই, কিন্তু আমি তার কোনো উপকার করতে পারি না।

একটি মানুষের দরকার হয়, একটি শরীরের আরেকটি শরীর দরকার হয়, শরীরকে কেউ এড়াতে পারে না; শরীরটি ঠিক থাকলে মনটা ঠিক থাকে, সব ঠিক থাকে। মানুষ বা আমার গোত্রটি অবশ্য শরীরের কথা স্বীকার করতে চায় না, অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলে, আর সারাক্ষণ অসুস্থ থাকে। এখন ইসমতকে যদি বলি একটি পুরুষ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা চমৎকার সময় কাটিয়ে দে, মদনের কথা আর মনে পড়বে না, ইসমত আমাকে খুব খারাপ ভাববে, মদনের থেকেও খারাপ ভাববে, কিন্তু আমি জানি ইসমত সেরে উঠবে, রিক্ষা নিয়ে তাকে ছোটাছুটি করতে হবে না। একবার আমি ফিরোজাকে সারিয়ে তুলেছিলাম, ফিরোজা রোদের মতো ঝরবারে হয়ে উঠেছিলো, মনেই হয় নি তার জীবনে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘট্ট কয়েক দিন আগে

ঘ'টে গেছে। ফিরোজা জন্মের পর কোনো শোকের অভিজ্ঞতা বোধ করে নি, সুখ ছাড়া আর কিছুই সে জানে না, সে কোনো মৃত্যু দেখে নি, কখনো ক'দে নি; কয়েক বছৰ আগে হঠাৎ ফিরোজার পিতা মারা যান। তার মরার কোনো কথাই ছিলো না।

অন্ধলোকের অত্যন্ত চমৎকার স্বাস্থ্য ছিলো, সব কিছুতে তীব্র আকর্ষণ ছিলো, নারীও তার বাইরে ছিলো না; আমার বুব ভালো লাগতো অন্ধলোককে, তিনি ক্লাবে থেকে ফিরেই টেলিফোন করতে গিয়ে পড়ে যান। কাকে তিনি টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন কেউ জানে না, যত্নটি হাতে নিয়েই তিনি নিচে পড়ে যান; আর ওঠেন নি। তিনি ডায়াল শেষ ক'রে যেতে পারেন নি। ফিরোজার ওই প্রথম শোক আর কান্নার অভিজ্ঞতা। প্রথম কয়েক দিন ফিরোজার কান্না ভালো লাগছিলো আমার;- মেয়েকে, অর্টিকে, জড়িয়ে ধ'রে ক'দছে ফিরোজা, নিজের জন্মদাতার জন্যে ক'দছে, বুক ত'রে ক'দছে, অর্টি বুঝতে পারছে না, তবু কেঁদে ফেলছে, দেখে আমার ভালো লাগছিলো। কান্নায় বাড়িঘর পবিত্র হয়ে উঠছিলো; বাতাস শুন্ধ হয়ে উঠছিলো। ফিরোজা বালিশ চেপে ধ'রে ক'দছিলো কখনো, বালিশটাকে রজনীগঞ্জের প্রান্তে যতো লাগছিলো, পবিত্র শোকের সুগন্ধ উঠছিলো চারদিকে; আবার কখনো সেলভিশন দেখতে দেখতে ক'দছিলো, পরিঅন্ধ হয়ে উঠছিলো টেলিভিশনের সমস্ত আবর্জনা। কেঁদে কেঁদে ফিরোজা ঝুপসী হয়ে উঠছিলো, ঢেখে সৌন্দর্য ক্লোসল করছিলো।

ফিরোজার কান্নায়, দিন দশেকের মধ্যে আমি বিরক্তি বোধ করতে থাকি, বাসাটিকে আমার স্যাংস্কেতে মাগে; সব ইতে থাকে সব কিছু ভিজে যাচ্ছে, জানালায় পর্দায় আলনায় বিছানায় বালিশে ক্ষেত্রে শোকেসে পুতুলের মুখে যয়লা লাগছে; কোনো কিছু ছুঁতেই আমার মেঝে মাগতে থাকে। বাতে ঘুমোতে গিয়ে দেখি ফিরোজা ক'দছে, বালিশ থেকে মাথা ছুঁতে পারছে না, দিন দশেক ধ'রেই মাথা তুলতে পারছে না সে। প্রথম আমার দ্বিধা লাগছিলো, কোনো শোকার্তকে জড়িয়ে ধরা ঠিক হবে কি না, আমি একটি অপরাধ করতে যাচ্ছি কি না, এসব দ্বিধা আমাকে বিব্রত করছিলো; কিন্তু ফিরোজার কান্না সহ্য করা অত্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠছিলো আমার পক্ষে। আরো কান্না সহ্য করতে হ'লে আমার মাথার তেতুরটা পাথরের যতো নিরেট হয়ে উঠবে, ভারী হয়ে উঠবে, শূন্য হয়ে উঠবে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু ফিরোজাকে জড়িয়ে ধরলে আমাকে সে একটা বদমাশ ভাবতে পারে, যে পিতৃবিয়োগাত্মক কন্যাকেও রেহাই দেয় না, যার কোনো নৈতিকতা নেই; তবে আমি ফিরোজাকে জড়িয়ে ধরলে সে সাড়া দেয়, তাতে আমি বিব্রত হই, একটি হক বুলতে পারছিলাম না, কয়েকবার চেষ্টা করার পরও সেটি আটকে থেকে প্রাণপণে দায়িত্ব তার পালন করছিলো, হক নিয়ে আমি সব সময়ই সমস্যায় পড়ি, আমি বুব অস্বত্তি বোধ করছিলাম ফিরোজাকে পীড়িত করছি ভেবে, কিন্তু ফিরোজা আঙুল দিয়ে সেটি অবলীলায় খুলে দেয়, অন্যান্য খোলার কাজগুলোও সে নিজেই করে, আগে যা সে করতে চাইতো না। ফিরোজার কান্না ক'মে আসতে থাকে, আমি যতোই অগ্রসর হ'তে থাকি সে ততোই শোক থেকে উঠে আসতে থাকে, কমতে থাকে স্যাংস্ক্যাতে ভাবটি, ফিরোজার দীর্ঘশ্বাসগুলোর আয়তন ও উপ্তাপ বদলে যেতে

থাকে। স্যাংস্যাতে তাবটি, ফিরোজার দীর্ঘশ্বাসগুলোর আয়তন ও উত্তাপ বদলে যেতে থাকে। আমার ভয় হ'তে থাকে যে আমি সমাণ্ড হ'লে ফিরোজা আবার হয়তো কানায় ফিরে যাবে, আমার সমাণ্ড হওয়া চলবে না; ফিরোজারও বোধ হয় একই ভয় হ'তে থাকে।

‘কেমন আছো?’ খুব ক্লান্ত আমি জিজেস করি।

‘ভালো’, ফিরোজা বলে, ‘ভালো’; তাকে অক্লান্ত মনে হয়।

‘এবার রাখবো?’ আমি ভয়ে ভয়ে অনুমতি চাই।

‘না, না’, ফিরোজা বলে, ‘এতো তাড়াতাড়ি না।’

ফিরোজা আর কাদছে না, মাঝেমাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, তবে সেগুলোর রূপ বদলে যাচ্ছে, রঙ বদলে যাচ্ছে। আমি কোনো অনৈতিক কাজ করছি না, কোনো শোকাত্তুরের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছি না, আমি বরং তাকে শোক থেকে তুলে আনছি। ফিরোজাও বড়ো বেশি চাইছে শোক থেকে উঠে আসতে, তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ কান্না ভুলে যেতে চাচ্ছে, আমি তাকে পিতৃশোক থেকে উদ্ধার করছি, কোনো অনৈতিক কাজ করছি না। ফিরোজা ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়, তোমে আর কান্না বারবারে দেখায়, সে উঠে এসেছে, সে যে গভীর শোকের মধ্যে ছিলো এতো দিন তার কোনো ছাপ তার মুখে আমি দেখতে পাই না।

ফিরোজা আর আমার ব্রিজটি টিকে আছে, হয়তো টিকে থাকবে, একটা সময় এসেছিলো যে ব্রিজটি ভেঙেই প'ড়ে যাচ্ছিলো, যদিও ভেঙে ফেলার মতো সাহস হয়তো আমার হতো না; আমি সকলের চেয়ে ভালো থাকতে চাই, হেলেবেলা থেকেই, ভাঙ্গাতাঙ্গি এখানে কেউ পছন্দ করে না, সবাই ধ'সে পড়ার পরও ভাব করতে পছন্দ করে যে তাদের ব্রিজের গায়ে একটিও আঁচড় লাগে নি, ধ্বংসস্তূপের ওপরে ধ্বংসস্তূপের তেতরে থাকতে পছন্দ করে সবাই, আমিও করি। তখন অর্চি এসে ব্রিজটাকে রক্ষা করে। অর্চি যে এসে গেলো একটা খুবই আকস্মিক ঘটনা, কবন ঘ'টে যায় আমি টেরও পাই নি, ফিরোজা আর আমার মধ্যে যা ঘটতো তখন তা হতো খুবই আকস্মিক আর ক্ষণকালীন, দুজনের কেউই বুঝে উঠতে পারতাম না আমরা কিছু একটা করেছি। অবশ্য একেই, আকস্মিকতা আর ক্ষণকালীনতাকেই, আমি স্বাভাবিক ভাবতাম, এবং আমার ঘেন্নাও ধ'রে যাচ্ছিলো এর ওপর, তা ওঠা আর নামা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। উত্তেজিত থাকতাম আমি সব সময়, চারপাশে আমি নারীর শরীর দেখতে পেতাম, ব্রিজগুলোর দিকে তাকালে নদীকে গভীর খাপ মনে হতো, ব্রিজকে মনে হতো বিশাল তরবারি। বারবার মনে হতো খাপ আর তরবারি মিল হচ্ছে না, দুটি উল্টোপাল্টা প'ড়ে আছে। ব্রিজে ওঠার সময় ট্রাকগুলো যে-শব্দ করে, তাকে আমার গভীর ক্লান্তির শব্দ মনে হতো। ফিরোজা আর আমি তখনো একই বিছানায় ঘুমোতাম, কিন্তু পরস্পরকে ছুতে ইচ্ছে হতো না; ফিরোজা একবার খুব হতাশ হয়ে অন্য দিকে ফিরে উয়ে বলেছিলো, ‘না, তুমি ঠিক মতো পারো না’, আমার না মনে হতো বারবার; কে পারে,

কে পারে, এমন সব প্রশ্ন জাগতো। ওই অবস্থায়ই অর্টি এসে ব্রিজটাকে টেনে ধ'রে রাখে।

না পারা এক ধারাবাহিক জুরের মতো কাজ করে, আমি ওই জুরে বছরের পর বছর ভুগেছি, আমার সে-সময়ের সমস্ত কাজে তার ছাপ লেগে আছে। সমস্ত কিছুর ওপর আমার লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হতো তখন; চোখের সামনে যা কিছু পড়তো আমি চোখ দিয়ে, মনে মনে জিভ দিয়ে, চুষতাম। মাওয়া সড়কে কয়েকটি ব্রিজ আমি দেখাশোনা করছিলাম, সেখানে পাথর ভাঙতো যে-মেয়েরা তাদের দু-তিনটিকে আমি দূর থেকে, জিপের জানলা দিয়ে, আমার চোখ দিয়ে চুষতাম। ওরা আমাকে পছন্দই করতো, আমি গেলেই সামনে এসে দাঁড়াতো, জিপের সামনে এসে দাঁড়াতো কখনো, আমি মনে মনে শোষণ করতাম, তারা কেউ তা জানতো না। আমার প্রতিটি লোমকৃপ তখন শোষণের কৌশল শিখেছিলো। তারা কেউ যদি আমাকে ডাকতো, আমি সাড়া দিতে পারতাম না; প্রকৃতিকে ধন্যবাদ, তারা কেউ আমাকে ডাকে নি। কিন্তু মনে মনে আমি তাদের বারবার, দিনে দুপুরে সন্ধ্যায় ঘণ্টারাতে ঘৰের উচ্চতরে ঘৰের বাইরে, উপভোগ করেছি। একটি মিশমিশে কালো মেয়েটি আমার কালো আগুনের মতো মনে হতো, তার শরীর থেকে কালো শিখা উঠছে আমি দেখতে পেতাম, ফিরোজার পাশে তয়ে আমি ওই মেয়েটিকে রাতের পর রাত ভাসিষ্যে ধরেছি, তার পায়ের পাতা থেকে পুরু ক'রে তার প্রতিটি স্প্যান প্রতিটি স্থিতিক্রম লেহন করেছি। তার দুটি পুরু ঢেট ছিলো, ফিরোজার তিনটি ঢেট জোড়া দিলেও অতোখানি হবে না; কথা বলার সময় হলদে রঞ্জের একটি প্রচও জিভ বেরিয়ে আসছে তার গহ্বর থেকে। তাকে দেখলেই আমার মনে হতো একটা গোবরো বেরিয়ে আসছে তার গহ্বর থেকে। তাকে দেখলেই আমার মনে হতো একটি কয়লার পাহাড়ে ঝুঁকে লেগেছে, তার তাপ আমার মাংসে এসে লাগতো। আরেকটি মেয়ে ছিলো লাউয়ের ডগার মতো, ছেলেবেলায় আমি জাংলায় লাউয়ের ডগা দুলতে দেখেছি, ওই মেয়েটিকে দেখলে আমি জাংলাত্তরা লাউডগা দেখতে পেতাম; চারপাশ সবুজ মনে হতো। আমি তাদের কথা ভুলে গেলেও হঠাতে তারা আমার রক্তে এসে প্রবেশ করতো। একবার ডেন্টিস্টের চেয়ারে শয়ে আমি কাতরাছিলাম, আর সহজে করতে পারছিলাম না, তখন ওই মেয়ে দুটিকে আমি দেখতে পাই; তারা পাথর ভাঙছে দেখতে পাই কালো আগুন জুলছে, লাউডগা লকলক করছে; আমার যন্ত্রণা ক'মে আসে, আমার কেমন যেনো লাগতে থাকে রক্ত ঘোলা হয়ে উঠতে থাকে ডেন্টিস্ট যখন দাঁত ভুলছিলো আমি এক প্রচও পুলকে চেয়ার উল্টেপাল্টে দেয়ার উপক্রম করি। ডেন্টিস্ট বিব্রত হয়ে বলেন, ‘আমি খুব দুঃখিত’; কিন্তু আমি তখন চোখ আর মেলতে পারি নি।

ফিরোজা ঘরে ব'সে পচতে পছন্দ করে; একটা কলেজে সে পড়াতো বিয়ের আগে, বিয়ের পরেই ছেড়ে দেয়, কারণ তবিষ্যৎ তো ছেড়ে দিতেই হবে, সংসার দেখতে দেখতেই তার সময় কেটে যাবে; চাকুরি তার ভালো লাগে না। চাকুরি তার জন্যে জরুরি নয়, সেখান থেকে যা পাবে তাতে তার তেলের খরচও উঠবে না। বিয়ের

পর কিছু দিন ধ'রে আমি অবশ্য একটা জোকের মতো লেগেছিলাম তার শরীরে; অসভ্য কাজের পর অসভ্য কাজ ক'রে সাধ মিটছিলো না আমার ফিরোজারও অনেকটা ফিরোজার শরীরটিকে আমার কাছে একটি বিশ্বয়ের মতোই লেগেছিলো, তবে প্রতিবার অসভ্য কাজ ক'রে আমি যেনো প্রতিশোধ নিছিলাম কারো ওপর, হয়তো রওশনের ওপর, মনে মনে বলছিলাম, দেখো, আমি এখন অসভ্য কাজ করছি, আমি ফিরোজার শরীর দেখছি, ছুঁচছি, তার ভেতরে যাচ্ছি, তার ওপর ঘুমিয়ে পড়ছি, রওশন তুমি এখন কোথায়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরোজা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

‘এসব আমার আর ভালো লাগে না’, ফিরোজা বালিশ জড়িয়ে ধ'রে বলে, ‘ঘুমোতে ভালো লাগে আমার এর চেয়ে, আমাকে ঘুমোতে দাও।’

আমি হাত সরিয়ে নিই, দু-চার দিনের মধ্যে আর হাত বাড়াই না; বাড়াতে গেলেই আমার দ্বিধা লাগে, সাত-আট দিনের মধ্যে আর হাত বাড়াই না; বাসাতে গেলেই দ্বিধা লাগে, দশ-পনেরো দিনের মধ্যে আর হাত বাড়াই না। ফিরোজা সুবে ঘুমোতে থাকে। ফিরোজা কেনো এতো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তার কেনো ভালো লাগছে না? আমি কি পারছি না? আমি কি শুধুই বিরক্ত করি?

‘এই শোনো’, আমি ডাকি, ‘একটি রাবার নামাকেও।

‘ইচ্ছে হ'লে নামাক’, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বলল ফিরোজা, ‘বেশি বিরক্ত কোরো না।’

বাক্স থেকে একটি রাবার নিয়ে এসে টেবিল সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়েছে সে, আমিও শীতল হয়ে পড়েছি, সাপের রক্তের মতো ঠাণ্ডা আমার রক্ত; এখন আমাকে দশ হাজার ফিরোজা ডাকলেও আমি সাড়া দিতে পারবো না। বাথরুমে গিয়ে ফুশ ক'রে আমি রাবারটির তার থেকে ঘুর্ঞ হুক্সে।

কলেজের কাজটি ফিরোজা ছেড়ে দিয়েছিলো আগেই। এখন তার আছে কমহীন সুব, ঘুম, বেড়ানো, শাড়ির দোকান, বাপের বাড়ি, এই যাওয়া এই ফিরে আসা, আর আমাদের ক্ষণিক আকস্মিক ক্লান্তিকর পরম্পরাপীড়ন।

‘অধ্যাপনাটা তুমি না ছাড়ালেও পারতে’, আমি কখনো বলি।

‘ওসব আমার ভালো লাগে না’, ফিরোজা বলে, ‘পড়ানোটানো ভালো লাগে না।’

‘ওনেছি মেয়েদের কলেজে না পড়ালেও চলে, মাঝেমাঝে গেলেই হয়’, আমি বলি, ‘তুমি মাঝেমাঝে যেতে পারতে, অন্তত নতুন শাড়িগুলো দেখাতে পারতে মেয়েগুলোকে, ওরা ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হ'তে পারতো।’

‘তোমার বউ অধ্যাপিকা তুমি বলতে পারতে সকলকে’, ফিরোজা বলে, ‘বেশ লাগতো, কিন্তু আমার একদম ভালো লাগে না।’

‘তুমি ঠিক ধরেছো’, আমি বলি, ‘আমাদের এক আইএ ফেইল ঠিকাদারের একটি ডষ্টেরেট বউ আছে, ইকোনোমিক্সে পিএইচডি, ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়; ঠিকাদার হ'তে ইচ্ছে করে।’

‘তুমিও একটি ডষ্টেরেট বিয়ে করলে পারতে’, ফিরোজা বলে, ‘ইঞ্জিনিয়ার আর পণ্ডিতে বেশ মিল হতো।’

'তবন একথা মনে পড়ে নি', আমি বলি।

'তুমি বউটিকে দেখেছো?' ফিরোজা জানতে চায়।

'না', আমি বলি, 'তবে বউটির কথা আমি মাঝেমাঝে তাবি।'

'অন্যের বউয়ের কথা তাবাই তো তোমাদের কাজ', ফিরোজা বলে, 'কী তাবো তুমি তার সমস্কে?'

'ডেস্টেরেট বউটি আইএ ফেইল ঠিকাদারটির নিচে কীভাবে শোয়?' আমি বলি।

'শোওয়া ছাড়া আর তোমার কথা নেই', ফিরোজা বলে।

আমি আর কথা বলি না। ফিরোজা বেশ ঘোটা হচ্ছে, সে যে সুবে আছে তার পরিচয় তার মাংস ঠেলে বেরোতে চাচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে তার মগজেও মাংস জম্মাচ্ছে। আমি তাকে একটু ভয়ই পাচ্ছি মনে হচ্ছে, তাকে আমি এমন কিছু বলি না যাতে মনে হয় আমি তালো নেই, সব ঠিক আছে এটা আমি দেখাতে চাই। আমি বিজ তৈরি করি, আমার বিজ ভেঙে পড়ছে এটা কেউ জেনে ফেলুক আমি তা চাই না। ফিরোজা আমাকে বেশ বিব্রত করে মাঝেমাঝে।

'তোমার অফিসে আজ দশ বারো বার ফোন করেছি', ফিরোজা দুপুরে খাওয়ার সময় বলে, 'একবারও পেলাম না।'

'অফিসে ফোন লেগেই আছে', আমি বলি, 'কুন্তা না কারো সাথে কথা বলছিলাম হয়তো, তাই অ্যানগেইজড ছিলো।'

'কাজের ফোনে তো বেশি সময় লাগে কথা নয়', ফিরোজা বলে, 'অকাজের আলাপেই বেশি সময় লাগে।'

'তুমি কি মনে করো আমি অকাজে আলাপ করি ফোনে?' আমি বলি।

'আমার তো তাই মনে হয়' ফিরোজা বলে।

'আমিও তো মাঝেমাঝে সামায় লাইন পাই না', আমি বলি, 'তুমিও কি অকাজের আলাপ করো?'

ফিরোজা চুপ ক'রে যায়, আমার আর খেতে ইচ্ছে করে না; দুপুরে একটু বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে ছিলো, এখন আর ইচ্ছে করে না; খাওয়ার পরই অফিসে ফিরে যাই। আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না ফিরোজার কথাগুলো, আমি আজ যিসেস রহমানের সাথে একটু বেশিক্ষণ ধরেই কথা বলছিলাম, বলতে ভালো লাগছিলো, অনেক দিন আমি মন খুলে কথা বলি নি। ফিরোজার সাথে মন খুল কথাই হলো না কখনো, রওশনের সাথে সেই কবে বলেছিলাম। মাহমুদা রহমান দু-তিন সপ্তাহ ধরে ফোন করছেন, একটু একটু ক'রে আমাদের আলাপ বাড়ছে, তাঁর কথা তন্তে ভালো লাগছে আমার। তিনি কি হাফিজুর রহমানের সাথে এমন মধুর মিষ্টি ক'রে কথা বলতেন, যেমন আমার সাথে বলেন? আমরা কি সবাই বক্সের বাইরে গেলে মধুর হয়ে উঠি, তেতো হয়ে উঠি বক্সের মধ্যে? মাহমুদা রহমান, আমার মনে হয়, গত দেড় দশক এমন মধুরভাবে কথা বলেন নি, যেমন আমিও বলি নি। হাফিজুর রহমান আমার সহকর্মী ছিলেন, মাসছয়েক আগে সৌদি আরব চ'লে গেছেন, তাঁর বিদায়ের পার্টিতে আমরা গিয়েছিলাম, ফিরোজাও ছিলো। এ-মাসেই মাহমুদা রহমান আমাকে ফোন করেন, খুব

একটা দরকারে, হাফিজুর রহমান আল মদিনা থেকে আমারই সাহায্য নিতে বলেছেন, আমি তাকে সাহায্য করেছি, সাহায্য করতে অনেক দিন পর আমার তালো লেগেছে। মাহমুদা রহমান প্রতিদিনই একবার ফোন করেন। খুব অন্তর লাগছে আমার যে তার ফোন পেতে আমার ইচ্ছে করে, আমার ব্যক্তিগত নথরটিও আমি তাকে দিয়েছি, তিনি দশটা বাজলেই বেজে উঠেন। ওই সময় আমি আমার ঘরে কাউকে দেখতে পছন্দ করি না। তিনি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করেন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত, এ-সময়টাতে তাঁর কন্যা দুটি ইঙ্গুলে থাকে, ইঙ্গুলে দিয়ে এসেই তাঁর নিঃসঙ্গ লাগতে থাকে, আমাকে ফোন করে তাঁর মনে হয় তিনি নিঃসঙ্গ নন। আমারও তাই মনে হয়, মনে হয় আমিও নিঃসঙ্গ নই। অনেক বছর পর আমার তালো লাগছে তুচ্ছ কথা, সামান্য কথা, নির্ধন্ধক কথা।

‘হ্যালো’, আমি রিসিভার তুলি।

‘হ্যালো, আমি’, ওপার থেকে কষ্ট ভেসে আসে, তিনি একক হয়ে উঠেছেন।

‘অপেক্ষা করছিলাম’, আমি বলি।

‘কার?’ মাহমুদা রহমান বলেন।

‘আপনিই বলুন’, আমি বলি।

‘বলতে সাহস হয় না’, তিনি বলেন, হাসেন, হাসেন শব্দ শোনা যায়। আমি হাসি ওনতে থাকি, তিনি বলেন, ‘আজ আসবেন?’

‘ইচ্ছে হচ্ছে’, আমি বলি।

‘তবে সময় হবে না’, তিনি বলেন, তাহলে একটু বেশি করে কথা বলুন।’

‘কেনো?’ আমি বলি।

‘আপনার কষ্টস্বর ওনতে তালো লাগে’, তিনি বলেন, ‘আপনি কি গান গাইতেন, বা কবিতা লিখতেন?’ তিনি বলেন।

‘গান গাই নি কখনো, তবে একবার কবিতা লিখেছিলাম’, আমি বলি।

‘কী নিয়ে লিখেছিলেন?’ তিনি বলেন।

‘আর্কিটেকচারের ওয়াজেদা ঘনসুরকে নিয়ে লিখেছিলাম’, আমি বলি।

‘এখন কাউকে নিয়ে লিখুন না’, তিনি বলেন।

‘আমি আসতে চাই’, আমি বলি।

‘এখনই’, তিনি বলেন।

একটি সম্পর্ক গঠে ওঠে আমাদের, আমি একটা মুক্তির স্বাদ পাই, আমার চামড়ার তলে যে-জুরটি আমাকে পোড়াচ্ছিলো, সেটি ছেড়ে যায়; মাহমুদা রহমানকেও মুক্তির স্বাদে বিভোর চক্ষল মনে হয়। তাঁর শরীরটি এতো দিন যেনো একটা ঘয়লা ডোবায় ডোবানো ছিলো, সেখান থেকে উঠিয়ে সেটিকে ঝাকঝাকে করে মাজা হয়েছে, তার ভেতর থেকে একটা দৃঢ়ি বেরোচ্ছে। প্রথম যেদিন সাড়ে দশটায় আমি তাঁর উদ্দেশে বেরোই আমার মনে হচ্ছিলো সবাই আমাকে দেখছে, জ্ঞানিভাব ভেবেছিলো আমি মাওয়া সড়কে যাবো; সে একটু অবাক হয়, কিন্তু বিচলিত হয় না যখন আমি তাকে লালমাটিয়ার যেতে বলি। হাফিজুর রহমানের বাসা তার অচেনা নয়, অফিসের

গাড়ি নিয়ে সে বহুবার ওই বাসায় গেছে। আমরা একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। আমি কি মাহমুদা রহমানকে তালোবাসি, মাহমুদা রহমান কি আমাকে তালোবাসেন? প্রশ্নটিকে অবাস্তুর মনে হয় আমার, আমাদের সম্পর্কটাকে ওই আবেগের থেকে অনেক বেশি মনে হয় আমার; আমরা একে অন্যকে মুক্তি দিয়েছি, এটা অনেক বড়ো প্রেমের আবেগ আর বিবাহের সূল পথা থেকে। আমরা কি কয়েক ঘণ্টা টেলিফোনে বা মুখোযুবি ব'সে কথা ব'লে মুক্তি পেতে পারতাম, যদি না মুক্ত হতো আমাদের শরীর? মনের মুক্তির জন্যে শরীরের মুক্তি দরকার। মাহমুদা রহমানের শরীরটিকে যেদিন আমি প্রথম সম্পূর্ণ দেখি এক অলৌকিক অনুভূতি হয় আমার, চেষ্টের সামনে থেকে একটি পর্দা স'রে যায়, আমি দেখি সুন্দরকে। এ-শরীরের সাথে জড়িত হওয়ার জন্যে আমার কি তালোবাসা দরকার এ-শরীরের অধিকারীকে— এমন প্রশ্ন আমার মনে জাগে; এবং মনে হ'তে থাকে এ-শরীর, নারীর শরীর স্বত্ত্বাবতই সুন্দর, এর সাথে জড়িত হওয়ার জন্যে জন্মজন্মান্তরের তালোবাসা দরকার নেই, দরকার নেই কোনো পূর্ব-আবেগ, দেখামাত্রই একে তালোবাসা যায়, জড়িত হওয়া যায় এর সাথে। আমি জড়িত হয়ে পড়ি, আমরা জড়িত হয়ে পড়ি। মাহমুদা রহমানের সাথে যাদি আমার বিয়ে হতো, বা যদি তাকে এখন আমি বিয়ে করি, তাহলে আমরা পরস্পরের কাছে যা পাচ্ছি, পরস্পরকে যা দিচ্ছি, তা কি পেতাম, তা কি দিচ্ছি, তা কি পাবো, তা কি দিতে পারবো? আমরা দুজনের কেউই বিয়ের ক্ষেত্রে অভাব না, দুজনেই আমরা তা পরবর্তী ক'রে দেবেছি।

‘আমি আপনার উপপত্নী’, তিনি হসে বলেন।

আমি চমকে উঠে বলি, ‘মেমো?’

‘নিজেকে উপপত্নী করতে তালো লাগছে’, তিনি বলেন, ‘পত্নীর থেকে তালো।’

‘কারো উপপত্নি হ'তে আমার তালো লাগবে না’, আমি বলি, ‘আমি পতি আর পত্নীর সম্পর্কের বাইরে থাকতে চাই।’

‘তাহলে আমাদের সম্পর্কটি কী?’ তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক সম্পর্কেই একটি নাম থাকা দরকার।’

‘আমি নামহীন সম্পর্ক চাই’, আমি বলি।

আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, ফিরোজা বলেছে আমি ঠিক মতো পারি না, এখানেও পারবো না, মাহমুদা রহমানও বিরক্ত হয়ে উঠবেন, আমাকে আর টেলিফোন করবেন না, অন্য কাউকে করবেন, এমন একটি ভীতি আমার ছিলো। আমাকে পারতে হবে, এ-ব্রিজটির তিস্তিকূপ শক্তভাবে স্থাপন করতে হবে আমাকে, যাতে কোনো বন্যায় তেসে না যায়। আমি বিস্ময়করভাবে দক্ষ হয়ে উঠি, নদীর ওপর ব্রিজ বাঁধতে যেমন তেমনি শরীরের সাথে ব্রিজ বাঁধতে; আমার মনে হ'তে থাকে আবেগ হচ্ছে বন্যার মতো, তার কাজ কাঠামোর ওপর আকস্মিক অভাবি চাপ প্রয়োগ করা, যার জন্যে কাঠামোটি প্রস্তুত নয়, তার কাজ কাঠামোকে বিপর্যস্ত করা; সম্পর্কের কাঠামোর বেলাও তা সত্য, তাই আবেগের সমস্ত চাপকে পরিহার করতে হবে।

আমাকে হ'তে হবে দক্ষ প্রকৌশলী, কুশলী স্থপতি; নিকুত্তাপ, ঠাণ্ডা, লক্ষ্ম্যের দিকে স্থির। আমি তা-ই হয়ে উঠি। আগে আমার ধারণা ছিলো শরীরের সাথে শরীরে সম্পর্ক একটি প্রত্যঙ্গের সাথে আরেকটি প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক, এখন আমি আবিঙ্কার করি শেই সম্পর্ক একটির নয়, সর্বাঙ্গের, যা ফিরোজার সাথে আমার হয় নি, হবে না কথনো। ফিরোজার সাথে আমার যে-সম্পর্ক, আমরা যে বিবাহিত, এটাকেও আমার একটি বাধা মনে হয়; বিবাহ সব কিছু খুলে ফেলতে দেয় না, একটা সীমার মধ্যে আটকে রাখে আমাকে। যাহয়দা রহমানের সাথে সে-সীমাটুকু নেই, আমরা সীমাহীনভাবে অসভ্য হয়ে উঠতে পারি, যা আমি পারি না ফিরোজার সাথে, তার সাথে আমার সভ্য থাকতে হয়।

অর্চির সাথে দেখা হচ্ছে না আজকাল। অর্চি, আমার যেয়ে, বিস্ময়করভাবে বেড়ে উঠেছে যে কয়েক বছরে, যাকে দেখলে আমি প্রথম চিনতে পারি না, চিনতে পেরে বিস্মিত হই, তার সাথে এখন আমার দেখাই হচ্ছে না। ওকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বাসায় ফিরলে দেখি সে রঞ্জব স্যারের বাসায় গেছে~~নিউ~~লে আকাস আলি স্যারের বাসায় গেছে, নইলে পল্টু স্যারের বাসায় গেছে~~নিউ~~ গোপাল স্যারের বাসায় গেছে, স্যারদের দোকান থেকে মালের পর মাল কিনছে, ওই মাল না কিনলে চলবে না; অংক কেনার জন্যে দৌড়েছে হাতিরপুলে, ইংরেজির জন্যে মগবাজারে, বাঙ্গলার জন্যে আজিমপুরে, ইসলামিয়াতের জন্যে মক্কা না মদিময়; অর্চি শুধু দৌড়েছে আর দৌড়েছে। ফিরোজা হইশল দিচ্ছে, অর্চি~~দৌড়েছে~~; ফিরোজাও খুব খাটছে। আমার যেয়ে, অর্চি, দৌড়ুক; অনেক দৌড়ে~~জে~~ হবে ওকে, অনেক ইন্দুর দৌড়ে ওকে অংশ নিতে হবে। আমি যে দেখতে পাইছি ওকে, তালোই; ওকে জিততে হবে, আমার চোবের বাইরে থেকে হলেও খুজিতুক। ওর ঘরে সাধারণত আমি যাই না, ও পছন্দ করে না ওর ঘরে কেউ যাক। ওর ঘরে গেলে দেখি সব কিছু ছড়িয়ে আছে, বিছানায় টেবিলে যেবেতে ছড়িয়ে আছে মোংরা কাগজে ছাপা বই নিউজপ্রিন্টের খাতা ইংরেজি হিন্দি গানের ক্যাসেট, আর ও-ও সব সময়ই এলোমেলো হয়ে আছে।

‘সব কিছু এমন ছড়ানো কেনো?’ আমি ভয়ে ভয়ে জানতে চাই।

‘ছড়ানো না থাকলে আমি কিছু ঝুঁজে পাই না,’ অর্চি বলে, ‘সাজানোগোছানো ঘর আমি সহ্য করতে পারি না, যাচ্ছতাই মোংরা লাগে।’

‘আমরা তো সব গুছিয়ে রাখতাম’, আমি বলি।

‘তোমরা খুব গৈয়ো ছিলে’, অর্চি বলে, যাও তো আরো কথা বলার আমার একদম সময় নেই।’

‘তোমার কি কিছু লাগবে?’ আমি আরেকটুকু কথা বলতে চাই।

‘আহা, আমার কিছু লাগবে না’, অর্চি বলে, ‘লাগবে কি না আমার ভাবতে হবে, এখন আমার ভাবার সময় নেই।’

আমি আর কথা বলার সাহস করি না, ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, যদিও ওর সাথে আমার আরো কথা বলার ইচ্ছে করে। অর্চি কী পছন্দ করে, কীভাবে বেড়ে উঠেছে, ও কী স্বপ্ন দেখে, কোনো স্বপ্ন দেখে কি না আমি জানি না। ওকে দেখলে মনে হয় ও

কেন্দ্রে আছে, ওর বয়সে আমি কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ছিলাম, কেন্দ্র কোথায় আমি জানতাম না, কেন্দ্র যেতে হবে তাও কখনো মনে হয় নি, এখনো মনে হয় কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে আছি। অর্চির সাথে কথা বললে প্রতি মুহূর্তেই আমি বোধ করি ও আছে কেন্দ্রে, আমি আছি প্রত্যভাসলে। এই সেদিনও এতেটুকু ছিলো, আমার সাথে একটা সম্পর্ক ছিলো, এখন দশম শ্রেণীতে অর্চি, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক নেই, বা আছে যা আমি বুঝতে পারি না, কোনো দিন পারবো না। অর্চি যখন ছোট ছিলো, আমি ওর সাথে খেলতাম; ও একটা বিজকে জোড়া লাগিয়ে রেখেছে। ওর তখন নিঃসঙ্গ লাগতো নিজেকে, এখন লাগে না; এখন অন্যের সঙ্গই অসহ্য মনে হয় ওর।

ছোট বয়সে একবার অর্চি আমাকে নির্বাক করে দিয়েছিলো; সেদিন থেকে আমি ওর সামনে পাহাড়ের মতো দাঁড়াতে পারি না, আজকাল একেবারেই পারি না। অর্চি আমাকে বলে, 'আৰু, এসো আমরা ভাইবোন খেলি', আমি বিস্মিত হয়ে তাকাই, অসহায়ভাবে বলি, এসো, খেলি কীভাবে খেলতে হবে বলো'; অর্চি আমাকে চমৎকার চমৎকার আদেশ দিতে থাকে। সেদিন থেকে আমি আর তা খিতা নই, ওর থেকে ছোটো কেউ, যাকে অর্চি আদেশ দিতে পারে। তবে অর্চি আমাকে ভাই বলে মেহে করেছে অনেক দিন, তারপর তুলে গেছে; এখন অবশ্য আমার মনে হয় অর্চি আমাকে অমন কিছু বলুক, কিন্তু কিছুই বলে না। ওর দুঃখের কথা ছোটোবেলায়, বলতো আমাকে, এখন বলে না; ওর কি দুঃখ নেই দুঃখের কোনো কথা নেই? ফোরে পড়ার সময় ওর খুব ইচ্ছে হতো ক্লাশের ক্যাপ্টেন হতে, বারবার চেষ্টা করেও হতে পারে নি; ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্যে মাসে মাসে খুব তাশে পরীক্ষা হতো, যন দিয়ে অর্চি পড়তো, পরীক্ষা দিয়ে এসে একটু কষ্টের সাথে বলতো, হতে পারলাম না আৰু।' ওর কষ্ট দেখে আমার কষ্ট হতো, তালোও লাগতো এজন্যে যে কষ্টে অর্চি ভেঙে পড়ে নি। ওদের ক্লাশের প্রথম মেয়েটি বাবুর ক্যাপ্টেন হতো, তার সাথে পেরে উঠতো না অর্চি, সে-মেয়েটি নিচয়ই খুব মেধাবী ছিলো। একবার অর্চি প্রায় ক্যাপ্টেন হয়েই গিয়েছিলো, কিন্তু ওই মেধাবী মেয়েটি তা মেনে নিতে পারে নি, তাকে ক্যাপ্টেন হতেই হবে। অর্চি খাবার টেবিলে প্রায় কেঁদেই ফেলে, খুব কষ্টে চোখের পানি চেপে রাখে, আমি ওর জন্যে খুব হাঙ্কা একটু কষ্ট পাই। সবচেয়ে বেশি নমুন পেয়ে অর্চি ক্যাপ্টেন হয়ে গিয়েছিলো, আপা ঘোষণাও করে দিয়েছিলো; কয়েক মিনিট ক্যাপ্টেন থেকে খুব সুব লাগছিলো, অর্চির। অমন সময় নাশিন, সে-মেধাবী মেয়েটি, অর্চির খাতা জোর করে ছিনিয়ে নেয়, নিয়ে পড়তে থাকে; পড়ে এক সময় লাঞ্ছিয়ে চিংকার করে ওঠে, 'আপা, অর্চি বাঁকা বি লিখতে তুল করেছে;' দৌড়ে মেয়েটি খাতা নিয়ে যায় আপার কাছে। আপা এবার চশমা মুছে চোখে লাগিয়ে দেখতে পায় সত্যিই অর্চি বাঁকা বি লিখতে তুল করেছে, তাই আপা অর্চির ক্যাপ্টেনের পদ বাতিল করে দিয়ে নাশিনকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে। অর্চি কেঁদে ফেলে, আমি শনে তয় পাই।

'নাশিন কি তোমার বন্ধু?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ই, অর্চি বলে।

শনে আমি আরো তয় পাই, এমন ভয়ঙ্কর বন্ধুদের মধ্যে আছে অর্চি!

'নাশিনকে তুমি আর বন্ধু মনে কোরো না, আমি বলি ।

'আমার যে আর বন্ধু নেই', অসহায়ভাবে অর্চি বলে ।

'সে তোমাকে কোনো দিন ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে', আমি বলি ।

'তাহলে আমি আর বন্ধু পাবো কোথায়?' অর্চি কেঁদে ফেলে ।

অর্চি কি আজো ওই বন্ধুদের সাথেই আছে? না কি তার কোনো বন্ধু নেই? সম্পূর্ণ একাই আছে? ওর ঘরে সব সময় উচ্চ আওয়াজ হয়, মহাজাগতিক গোলমাল চলে, ক্যাসেট বেজেই চলে, ইংরেজি হিন্দি, চিংকার ওঠে, ওগলো অর্চি সহ্য করে কেমনে? ও কি আওয়াজের মধ্যেই থাকতেই পছন্দ করে, ওর মতো অন্যরাও? আমি আমার এক প্রিয় গায়িকার, যখন আমি গান শুনতাম, যখন আমি ছাত্র ছিলাম, একটি ক্যাসেট অনেক খুজে অর্চির জন্যে নিয়ে এসেছিলাম। অর্চি তার নাম শোনে নি, তার নাম শনেই বমি ক'রে ফেলতে চায়, শোনার মতোই ওর মনে হয় না, আর বাজানোর সাথে সাথেই যেনো বমি ক'রে ফেলে; আমার মনে হয় অর্চি আমার মুখের ওপরই বমি ক'রে দিচ্ছে। দূরে কোথাও রেকর্ড বাজতো, কোনো বিয়ে বাড়িতে, ওই স্ব কতো সন্ধ্যায় কতো রাতে গাছপালার তেতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার ততো এসে চুকতো, আমার রক্ত কাঁপতে থাকতো; অর্চির রক্ত কাঁপে না, অর্চির রক্ত বা বা করে ।

এ নিয়ে দুবার হলো, দিন সাতেক আগে একবার হয়েছিলো, আজ আবার হলো, ফোনটা আমি ধরলাম; ফোনটা আমার নয়, ফিরোজার; ফিরোজা বাথরুমে ব'লে আমি ধরলাম, ছেলেটি বেশ গভীর কষ্টে বলছে, 'তাবী, আমি ।' ছেলেটি নিশ্চিত যে ফিরোজাই ফোন ধরবে, আমি এ-সময়ে বাড়ি থাকি না, তাই সে হ্যালো' ব'লেও সময় নষ্ট করে নি, তাবীর কাছে তার একত্তা জানিয়েছে, একটা ঝলমলে সাড়া প্রত্যাশা করেছে। আমি কি এখন বলবে 'কাকে চান?' বলাটা কি শোভন হবে, বললে কি সে আমাকে বলবে কাকে শেষত? সে কি বলবে না, 'আমি দুঃখিত, রং নাম্বার ।' আমি বলি, 'ফিরোজা বাথরুমে আছে, আপনি একটু ধরুন।' শনেই টক ক'রে ছেলেটি ফোন রেখে দেয়; একটু বোকাই দেখছি ছেলেটি বা একটু বেশি ঘাবড়ে গেছে, আমাকে একটু ভুল নাম্বারও বলতে পারতো। বাথরুম থেকে কি ফিরোজা ফোনের শব্দ শনেছে? যদি ফিরোজা বুদ্ধিমান হয়, আমি আজো জানি না সে বুদ্ধিমান কি না, এবং ফোনের শব্দ শনে থাকে, তাহলে ফিরোজা একটু দেরি ক'রেই বেরোবে বাথরুম থেকে, যেনো আমি বুঝতে না পারি সে একটি ফোনের জন্যে উৎকৃষ্টিত ছিলো। ছেলেটি নিচয়ই পরে ফোন করবে, আমাকে নিয়ে একটু হাসাহাসিও করবে হয়তো, কীভাবে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে বলতে বলতে দুজনে হাসবে; কিন্তু ফিরোজা বাথরুম থেকে বেরোলে আমি কী বলবো? বলবো কি তার একটি ফোন এসেছিলো, আমার এক অচেনা অনুজ ফোন করেছিলো? ফোনটা যে নিশ্চিতভাবে ফিরোজারই তার আমি প্রমাণ করবো কীভাবে, আর না ব'লেই থাকবো কী করে? তার ফোন এসেছিলো, আমি ধরেছিলাম, এটা চেপে যাওয়া কি অসং কাজ হবে না, নিজেকে কি আমার একটা খুব দীর্ঘকার স্বামী মনে হবে না? ফিরোজা বেশ দেরি ক'রেই বেরোয় বাথরুম থেকে।

আমি কি ধরে নেবো ফিরোজা ইচ্ছে করেই দেরি ক'রে বেরিয়েছে বাথরুম থেকে, মুখ বারবার সাবান দিয়ে ধূয়েছে যাতে মুখে উৎকণ্ঠা উঘেগের কোনো ছাপ না থাকে?

‘তোমার একটা ফোন এসেছিলো’, আমি বলি।

ফিরোজা বিব্রত হচ্ছে, ফোনের শব্দ সে তনেছে মনে হয়। আসলেই কি বিব্রত হচ্ছে ফিরোজা? না কি তা আমার বোঝার তুল? ফিরোজা কোনো আগ্রহ দেখায় না। এ-ফোনটি আসবে ব'লে, ধরতে গিয়ে বিব্রত হবে ব'লেই কি ফিরোজা বাথরুমে ঢুকেছিলো? আমি ফিরোজার মুখ পড়তে পারি না, তার মুখটি আমার কাছে এক অচেনা লিপিখচিত পৃষ্ঠা মনে হয়।

‘তোমার একটা ফোন এসেছিলো’, আমি আবার বলি।

‘কে করেছিলো?’ ফিরোজা খুব আগ্রহহীন হ'তে চেষ্টা করে?

‘তোমার কোনো দেবর করেছিলো’, আমি বলি।

‘বাজে কথা বলো না’, ফিরোজা বলে।

‘বাজে কথা বলছি না আমি,’ আমি বলি, ‘ভাবীকে চাইছিলো সে।’

‘দেবো সবাইকে নিজের মতো মনে কোরো না’ ফিরোজা বলে, ‘তোমরা তো অফিসে গতা গতা মেয়েলোকের সাথে ফোন ক'রেই সময় কাটাও।’

‘তুমি রেগে যাচ্ছো’, আমি বলি, ‘আর ধরা পড়িড় যাচ্ছো।’

‘ধরা পড়ার কী আছে’, ফিরোজা বলে, ‘তাদের কাছে স্বামীরা ফোন করে না তাদের কাছে দেবররা তো ফোন করবেই।’

আমি আর কোনো কথা বলিনি, আমাকে বেরোতে হবে; বেরোনোর আজ ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু বেরোতেই হয়ে, আমার রক্ত এলোমেলো কাজ করতে শুরু করছে। বেরিয়ে কোথায় যাবো? অবস্থাই যাবো। আমি তো রাত দশ এগারোটা পর্যন্ত অফিসেই থাকি, আজ বাসায় থাকবো তেবেছিলাম, কিন্তু এখন আমাকে বেরোতে হবে। আমি অফিসে চলে যাই। ফিরোজাকে হয়তো তার দেবর আবার ফোন করেছে, আমি কি একবার বাসায় ফোন করে দেববো ফোন অ্যানগেজড কি না? না, অ্যানগেজড থাকলে আমার রক্ত আরো এলোমেলো হয়ে যেতে পারে; হয়তো অর্চি ফোনে কথা বলছে, আজকাল ওর খুব ঘন ঘন ফোন আসছে, তবু আমার মনে হবে ফিরোজা দেবরের সাথে কথা বলছে। নিজের কাছে নিজেকে ছোটো মনে হবে। না, আমি বাসায় ফোন করবো না; ফিরোজা কথা বলুক তার দেবরের সাথে। ফিরোজা কি দেবরের সাথে বেড়াতে যায়? কখন যায়? কোথায় যায়? কতো দিন ধ'রে যায়? কী করে? দেবরটি দেখতে কেমন? ফিরোজার সাথে বেশ মানায়? যেখানে ইচ্ছে যাক, যা ইচ্ছে করুক; আমি এখন কী করি? ফিরোজাকে কি এরই মধ্যে তার দেবরটি দেখেছে, সম্পূর্ণ দেবে ফেলেছে? ফিরোজা দেখতে দিয়েছে? মাঝেমাঝেই দেখে, আজো কি দেখার ইচ্ছে আছে? ফিরোজা কীভাবে সাড়া দেয়? আমি রওশনকে দেখতে পাচ্ছি, একটি হাত রওশনকে খুলছে, রওশনের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, রওশন কেপে কেপে উঠছে, রওশন শব্দ ক'রে নিশাস নিচ্ছে।

ফিরোজার একটি দেবর জন্ম নিয়েছে, ফিরোজা আমার স্তু, ধরে নিচ্ছ তারা
মাঝেমাঝে ঘুমোয়, আমি কি এখন তাদের দুজনকে খুন করতে বেরোবো, রক্তে
বিবাহকে পবিত্র করবো? বিয়েতে আমরা কোনো শপথ করেছিলাম পরস্পরের প্রতি?
আমার মনে পড়ছে না; যত্ত্ব আমদের পৃথক না করা পর্যন্ত আমরা একে অন্যের প্রতি
বিশ্বস্ত থাকবো, এমন কোনো শপথ আমরা করি নি, অন্তত আমার মনে পড়ছে না,
বিয়েতে আমি কী বলেছিলাম তা-ই আমার মনে পড়ছে না। আমি বিশ্বস্ত নই, ফিরোজা
বিশ্বস্ত নয়; কে কখন বিশ্বস্ত ছিলো? বিশ্বস্ত থাকতে হয় কেনো? আমি বাসায় ফিরে
আসার পর আমার শরীরে কি মাহমুদা রহমানের ছাপ থাকে; ফিরোজা যদি আজ রাতে
তার দেবরের সাথে মিলিত হয়, আমি ফিরে গিয়ে ফিরোজার শরীর তন্তু করে পরুষ
করি, তাহলে কি দেবরের কোনো ছাপ খুজে পাবো? আমি এখন কোথায় যাবো?
মাহমুদা রহমানের কাছে যেতে পারি, রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারি, তাঁর বাচ্চা দুটি
সারাক্ষণ পাশে বসে থাকবে আমার, ওদের জন্যে আইক্রিম কিনতে হবে, যেতে ইচ্ছে
করছে না; পবিত্র সুন্দরী মহীয়সী বিধবাটিকে মনে পড়ছে, অন্তক দিন ধরেই মনে
পড়ছে, বিধবা আমার মনে ঝিলিক দিচ্ছেন মাঝেমাঝে। অন্তক দিন তার বাসায় যাওয়া
হয় নি, তাঁর বাসায় যাবো? এখন কি তিনি বাসায় পৌছেন? তাঁর বাসায় কি খুব ভিড়
থাকবে? যে-কয়েকবার গেছি খুব বিখ্যাত মানুষদের সাথে দেখা হয়েছে, এক সোফায়
অতোগুলো বিখ্যাত আমি কখনো দেখি নি অতো বিখ্যাতদের পাশে আমাকে মানায়
না; আর বিখ্যাতদের মুখ থেকে কেমন ধূম? একটা গন্ধ বেরোয়, পাশে বসে কথা
বলতে থাকলেই আমি ওই গন্ধটা খেতে থাকি, সহ্য করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে।
সৌন্দর্যের পাশে ওই বিখ্যাত লোকগুলোকে আমার টাঙ্গালের মতো ঘিনঘিনে মনে হয়।
তাঁরা অবশ্য স্তবগান জানেন, অবশ্য স্তবগান তাঁদের মুখস্থ, তাঁরা রূপসী বিধবাটিকে
দেবী করে তুলতে চাচ্ছেন, আর চাচ্ছেন দেবীর সঙ্গে একটু-আধটু ঘুমোনোর। দেবী
চাইলে তাঁরা না করবেন না। আমি তাঁকে দেবী করে তুলতে পারবো না, স্তবগান
কখনো শিখি নি, কিন্তু তিনি দেবী দেবী বোধ না করলে কারো ডাকে সাড়া দেন না
মনে হয়। আমি কি সেই পবিত্র সুন্দরী মহীয়সীর কাছে যাবো, তাঁর করুণা চাইবো;
তিনি কি আমাকে উভার করবেন উদ্দেশ্যহীনতা থেকে?

এক বস্তুর সাথে প্রথম গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়, বস্তুটি কোনো পূর্বধারণা দেয় নি
আমাকে, শুধু বলেছিলো আমাকে সে একটি অপূর্ব বিধবা দেখাবে; তরুণী, রূপসী,
করুণাময়ী বিধবা, যা আমি আগে দেখি নি, পরেও দেখবো না। তাঁকে দেখে আমি মুক্ত
হই, তাঁর রূপ আর করুণা অপার বলেই মনে হয় আমার। খুব দামি সৌন্দর্য আর
বিষণ্ণতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ছিলো; তিনি একটি দামি শাড়ি পরেছিলেন, তবে তিনি
যে-বিষণ্ণতা আর সৌন্দর্য পরে ছিলেন, তার দাম আরো অনেক বেশি, কোটি মুদ্রার
বেশি। আমি তাঁর থেকে বেশ দূরেই বসা ছিলাম, তিনি আমাকে মাঝেমাঝে দয়া করে
দেখছিলেন, দূরক্ষেও তিনি অবহেলা করেন না, শ্বিত হাসিও বিলোচিলেন আমার
দিকে তাকিয়ে, যেমন অন্যদের দিকেও তিনি তাঁর করুণা বিতরণ করছিলেন। অনেক
তক্ষণ এসেছিলো তাঁর নিপারের তলে।

‘ভাবী, আপনাকে যতো দেবি ততোই মুক্ষ হই’, এক ষাট-বছর পেরোনো বিখ্যাত ওই তরুণী বিধবাটির স্তব করছিলেন, ‘কী ক’রে যে আপনি এমন বেদনার মধ্যে এমন স্থির থাকতে পারছেন। আপনাকে দেখা মানে স্বর্গকে চেথের সামনে দেখতে পাওয়া। একে আমরা ভাগ্য বলে মানি।’

‘কিন্তু এই রাষ্ট্ৰ’, আরেক ষাট-ছোয়া বিখ্যাত বলছিলেন, ‘ভাবীকে তাঁর প্রাপ্তি দিচ্ছে না। দাদা দেশের জন্যে যা করে গেছেন, তার জন্যে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঝুঁটী হয়ে থাকবো তাঁর কাছে, ভাবীর কাছে। অথচ ভাবীকে জিগাতলার এই ছেউ ফ্ল্যাটে (আট কামরার) প’ড়ে থাকতে হচ্ছে। ভাবীকে একটি ভবন বরাদ্দ করা উচিত ছিলো বনানী কি গুলশানে (দাদা দুটি বাড়ি রেখে গেছেন বনানী আর গুলশানে); আমি অবশ্য এর জন্যে লড়াই ক’রে যাবো।’

‘আর’, ভাবী বলছেন, ‘আমি একটু জাতিসংঘের বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধি হয়ে যেতে চেয়েছিলেন, নিউইঞ্জ শহরটা আমার ভালো লাগে বলে, কিন্তু তারা আমাকে দলে রাখতে চাচ্ছে না, এর আগে আমি মাত্র দু-বার গেছি বলে।’

‘এজন্যেই দেশটা ধৰংস হয়ে যাচ্ছে’, আরেক সুন্দর্যাত বলছেন, ‘দাদার কাছে দেশের যা ঝণ তাতে ভাবী দু-বার কেনো দুশো বার আবেন, তাতে কার কী বলার থাকতে পারে।’

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁদের জিত থেকে লালা ঝরছে, জিভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, স্তবগানের সাথে তাঁরা উপভোগ করে চলছেন বিধবাটিকে; বিধবাও জানেন আর জানাটা উপভোগ করেন যে কিছুটা পরোক্ষ সম্ভাগের সুযোগ না দিলে ভজ্জরা তাঁকে দেবী ক’রে তুলবেন না। তবে এ-ভজ্জরা কেন জৰণতলে থাকার মতো নয়, আরোহণের কামনা তাঁদের চোখেমুখে জুলজুল করছে, সে-ই ভাগ্যবান যাকে দেবী নিজের বক্ষে স্থান দেন। আমার ওই দেবীকে মনে ঢুকছে, আমার বজ্জনালি জুড়ে যে-কর্কশ একটা আগুন জুলছে, তা মিঞ্চ হয়ে উঠতে পারে শুধু ওই দেবীর বিষণ্ণ করণায়। কিন্তু আমাকে কি, যে একান্ত ভজ্জ হয়ে ওঠে নি দেবীর, যে পদতলে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র কয়েকবার, তাঁর করুণা বিলোবেন? তিনি কি এতো অপার করুণাময়ী হয়ে উঠতে পেরেছেন? একবার গিয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বোধ করেছিলাম, তিনি আমাকে বসার ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বারান্দায়, ছায়াধেরা সেই বারান্দা, আমি কয়েক মিনিট একান্ত একলা তাঁর মুখোমুখি বসার অধিকার পেয়েছিলাম; আমার মনে আরো অধিকার পাওয়ার সাধ জন্ম নিতে যাচ্ছিলো। তবন এক বলিষ্ঠ পুরুষ প্রবেশ করেন, তাঁর জুতোর শব্দও বলিষ্ঠতা প্রকাশ করে, বুঝতে পারি এ-বলিষ্ঠ পুরুষ সরাসরি প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত দেবীর কাছে। বলিষ্ঠের পাশে দেবীকে মনে হচ্ছিলো পৌরসভার ট্রাকের চাকার পাশে বসা এক প্রজাপতি বলে, চাকা যখন ঘুরতে শুরু করবে প্রজাপতি তখন কংক্রিটে মিশে যাবে। দেবী আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন বলিষ্ঠ পুরুষ জমশেদ মোল্লার সাথে, নাম শনে তাঁকে চিনতে পারি। দেশের এক প্রধান কালোবাজারির পাশে নিজেকে আমার খুবই অসহায় লাগতে থাকে।

'দু-তিন সপ্তাহ দেশে ছিলাম না', জমশেদ মোল্লা বললেন, 'তবে আপনার কথা সব সময়ই মনে হয়েছে।' জমশেদ মোল্লা পকেট থেকে একটি প্যাকেট বের ক'রে দেবীর হাত দিতে দিলেন।

দেবী হেসে সেটি গ্রহণ করতে করতে বললেন, 'ড, না ট?'

জমশেদ বললেন, 'ড।'

দেবী জানতে চাইলেন, কতো?'

জমশেদ বললেন, 'পাঁচ।'

দেবী হাসলেন, বললেন, 'এ-ধারণা শোধ করতে বছর খালেক লাগবে।'

জমশেদ বললেন, কেনো? আপনি অন্য কোথাও ধার করেন না কি?

দেবী বললেন, না করলে কি চলে?

জমশেদ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'দরকার হলে আমার কাছেই ধার করবেন, অন্য কোথাও আপনি ধার করেন আমার ভালো লাগে না।'

দেবী আমার দিকে তাকিয়ে মিটি হেসে বললেন, 'মাঝেমাঝে ধার করতে হয়, জমশেদ তাইর কাছেই বেশি ধার পাই। আপনার কাছেও আইবো কোনো দিন।'

আমি দেবীর খানিক করুণা লাভ করি; তিনি আমার কাছেও ধার চাইবেন, আমাকেও ধন্য করবেন দেবী, আমিও তাঁর বিবেচনায় বাইরে নই। দেবী বাইরে যাবেন, জমশেদ মোল্লার সাথে বাইরে একটা কাজ আছে দেবীর; না, দেবী আমাকে বিদায় করে দিয়ে কাজটি বাসায়ই সম্পন্ন করবেন তাঁ, দেবীর বিবেচনা রয়েছে, জমশেদ মোল্লার সাথে তিনি কাজ করতে চাইলেন, আমার দিকে তাকিয়ে করুণায় আমাকে সিক্ত ক'রে দিলেন। দেবী বোধহয় আজ রাতেই তাঁর ধারের অংশবিশেষ শোধ করবেন, জমশেদ মোল্লাকে ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে তাতে তিনি ধারের কিছুটা না তুলতে পারলে রাজ্ঞায় গিয়ে গোটা ক্ষয়েক মানুষ খুন করবেন। দেবী সবচেয়ে বেশি ধার পান জমশেদ মোল্লার কাছে, পাঁচ হাজার ডলার শোধ করতে তাঁর বছরখালেক সময় লাগে, কেননা তিনি অন্যদের কাছেও ধার করেন, সেগুলো শোধ করতে হয় তাঁকে, সবার ধার এক সাথে শোধ করা যায় না। তবে কিন্তিতে তিনি শোধ করেন পাঁচ হাজার ডলার? এক কিন্তিতেই? না কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিন্তি কম-বেশি হয়? মাসে দেবী একজনের কয় কিন্তি শোধ করবেন? জমশেদ মোল্লার পাঁচ হাজার ডলার কি দেবী পাঁচ কিন্তিতে শোধ করবেন? তাঁর মানে আড়াই মাসের কিন্তি? আমার কাছে যদি দশ হাজার টাকা ধার চান, দেবী আমার অবস্থা জানেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার কাছে এর বেশি ধার চাইবেন না, তাহলে তিনি তা কয় কিন্তিতে শোধ করবেন? এক কিন্তিতেই? এক কিন্তিতেই দশ হাজার টাকা? আমার মতো ব্রিজ বালানো ইঞ্জিনিয়ার কি বারবার ধার দিতে পারবে?

যদি আমি এখন দেবীর কাছে যাই, মনে করা যাক তিনি একলা আছেন, তিনি যদি আমার কাছে ধার চান, মাত্র দশ হাজার টাকাই ধার চান, আমি কি তাঁকে দিতে পারবো? আমার উচিত ছিলো বেশ কিছু টাকা বিশ হাজারের মতো, তুলে অফিসেই বেঁধে দেয়া; কে জানে কখন দেবী ধার চাইবেন, কে জানে কখন আমার ধার দিতে

ইচ্ছে করবে। যেমন এখন আমার ইচ্ছে করছে দেবীকে ধার দিতে। দেবীকে ধার দেয়ার অগ্রহটি আমার ভেতরে তীব্র হয়ে উঠছে, যদিও দেবী আজো আমার কাছে ধার চান নি, কিন্তু আমার ভেতরে ধার দেয়ার তীব্র কামনা জাগছে। আমি ধার দিতে চাই শব্দু দেবীর জন্যে দেবী কীভাবে ধার শোধ করেন। দেবীর ধার শোধ করার মূহূর্তলো আমি অনুভব করতে চাই, উপলক্ষ্য করতে চাই, অভিজ্ঞতার মধ্যে পেতে চাই। এখন কি সরাসরি চলে যাবো দেবীর মন্দিরে? দেবীকে কি সরাসরি গিয়ে ধার দেয়া যায় দেবী না চাইলেও? আর গিয়ে যদি দেখি জমশেদ ঘোষাকে নিয়ে তিনি কাজে যাচ্ছেন, পাঁচ হাজার ডলারের কোনো কিন্তি শোধ করতে যাচ্ছেন, বা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন তাঁর কামনাব্যাকুল শ্রবণানন্দ? ফিরোজা কি তার দেবরের টেলিফোন পেয়েছে? তাঁরা কি এখনো কথা বলছে? ফিরোজাও কি মাঝেমাঝে দেবরের কাছে থেকে ধার নেয়? ফিরোজা কীভাবে দেনা শোধ করে? দেবীকে আমি টেলিফোন করি।

‘তাবী, আমি মাহবুব’, আমি বলি, ‘আমাকে কি চিনতে পারছেন?’

‘আপনাকে চিনবো না তা কি হ’তে পারে!’ খিলখিল হাসেন দেবী, তাঁর খিলখিল হাসির একটা রঙ দেখতে পাই আমি, তার খিলখিল হাসি ওনে মনে হয় আমি কয়েক মাইল দূর থেকে টেলিফোন করছি না, তাঁর মুক্তের ওপর ওয়ে আছি, সেবান থেকে খিলখিল হাসিটা উঠছে। তিনি বলেন, আমি তো এলেন না।’

‘আসতে তো সব সময়ই ইচ্ছে হয়’, আমি বলি।

‘তাহলে আসেন না কেনো?’ দেবী বলেন।

‘অপেক্ষায় ছিলাম কোনো দিন আপনি আমার কাছে ধার চাইবেন’, আমি বলি, ‘তখন আসবো।’

আবার খিলখিল হাসেন হাসি, তাঁর হাসির রঙে দিকদিগন্ত ঢেকে যাচ্ছে, আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, তাঁর হাসির রঙ দেখতে পাচ্ছি, আশ্বিনের নদীর পারে কাশের মেঘ দেখতে পাচ্ছি।

‘আমাকে ধার দিতে কি আপনার বুব সাধ হয়?’ দেবী বলেন।

‘অনেক দিন ধ’রেই ধার দেয়ার স্বপ্ন দেখে আসছি’, আমি বলি।

‘তার সাথে আর কি স্বপ্ন দেখছেন? দেবী বলেন।

‘আপনি কীভাবে ধার শোধ করেন;; আমি বলি।

দেবী আবার খিলখিল হাসেন, শিশির পড়ছে তাঁর গুচ্ছগুচ্ছ হাসির ওপর, শিশিরে ভিজে যাচ্ছে তাঁর হাসি, তিনি বোধ হয় আর হাসতে পারবেন না।

দেবী বলেন, ‘আমাকে সবাই ধার দিতে চায়, আমি না চাইলেও।’

আমি বলি, ‘আপনি ভাগ্যবান।’

দেবী বলেন, ‘আর সবাই ধার দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে আমি কীভাবে ধার শোধ করি দেখাব জন্যে। আমি অবশ্য শোধ করে দিই। আপনি কি আজই আমাকে ধার দিতে চান?’

আমি বিপদগ্রস্ত, আমার পকেটে ছ-সাত হাজারের বেশি হবে না; কিন্তু দেবী কি এতো কম ধার নেবেন, তাঁকে কি এতো কম ধার দেয়া যায়?

আমি বলি, 'ভাবী আজই ধার দেয়ার মতো অবস্থা আমার নেই, দশের নিচে
কেমনে আপনাকে ধার দিই।'

দেবী আবার খিলখিল হাসেন; বলেন, 'আপনি তো জমশেদ মোল্লা নন যে পাঁচ
হাজার ডলার ধার চাইবো, চলে আসুন, আজ আমার যন ভালো নেই।'

দেবীর মন ভালো নেই, মন ভালো না থাকলেই দেবীদের বেশি ভালো দেখায়,
বেশি ভালো লাগে; বিষণ্ণতা যুবের তৃককে কোমল ক'রে তোলে, আজ দেবীকে আমার
আরো বেশি ভালো লাগবে। আমি আর দেরি করি না, জ্ঞাইতার প্রথমে ভেবেছিলো
বাসায় যাবো, তারপর মনে করেছে লালমাটিয়া যাবো, তাকে আমি জিগাতলা যেতে
বলি; দেবীর সত্যিই মন ভালো নেই, তিনি তৈরি হ'য়ে দরোজার পাশে দাঁড়িয়েই
ছিলেন। গাঢ়ি গিয়ে থামতেই তিনি আমার পাশে উঠে বসেন, তাঁর ডান হাতটি আমার
বাঁ হাতের ওপর এসে পড়ে, একবার তাকান আমার দিকে, সত্যিই বিষণ্ণতায় তিনি
আরো রূপসী হয়ে উঠেছেন। দেবীকে নিয়ে এখন কোথায় যাই? আমি সব সময়ই
এতো অপ্রস্তুত। দেবী আমাকে উদ্বার করেন এক পাঁচতার্বাহিনীটেলের নাম বলে।

'মন ভালো না থাকলে এই হোটেলটি আমার ভালো নাগে', দেবী বলেন, 'দশ^০
তলায় উঠলে মনে হয় আমি আবর্জনার মধ্যে নেই।'

'আপনি কি আবর্জনার মধ্যে আছেন?' আমি ক'রি।

'আপনি বুঝতে পারেন না?' দেবী বলেন, 'তার হাতটি খুব উষ্ণ মনে হচ্ছে
আমার, রওশনের হাতের মতো, মুঠোতেপ্তুতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ধরি না।

দশতলায় আমরা একটি কক্ষ বিলি কক্ষে প্রবেশ করি, দেবী আমার পাশে, দেবী
আমার সাথে, এখানে কোনো আবর্জনা নেই। দেবীর বিষণ্ণ শরীর থেকে আমি
বিষণ্ণতার সুগন্ধ পেতে থাকি, তাজা কাঠালচাপার গন্ধ, আমি বুঝে উঠতে পারি না
দেবীকে নিয়ে আমি কী করবো? আমি কি আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত দেখতে পাওয়াকে
সহ্য করতে পারবো, আমি কি পেরে উঠবো, যেমনভাবে পেরে ওঠে জমশেদ মোল্লা?
আমাকে কি এখন জমশেদ মোল্লা হয়ে উঠতে হবে? দেবী আমার থেকে কোনো ধার
নেন নি, আমি কি ক'রে তার কাছে থেকে ধার আদায় ক'রে নেবো? দেবী গিয়ে
বিছানার ওপর কাত হ'য়ে উঠেছেন, আমি এখনো দূরে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর বিছানার
পাশে যেতে আমার তয় লাগছে, যেনো আমি এক পশেরো বছরের বালক, আমি কিছু
পেরে উঠবো না। কিন্তু দেবী কি তা পছন্দ করবেন? তাঁর কি মনে হবে না জমশেদ
মোল্লারাই ভালো এই ইঞ্জিনিয়ারটিঞ্জিনিয়ারের থেকে? দেবী আমার দিকে শ্বিত হেসে
তাকিয়ে আছেন। আমি সামনের দিকে পা বাঢ়াতে পারছি না।

'আপনি ধার আদায় করতে জানেন না', দেবী শ্বিত হেসে বলেন, 'আপনাকে
আমার ছেলেবেলার সেই বালকটির মতো মনে হচ্ছে, সেও ধার আদায় করতে জানতো
না।'

'আমি তো এখনো ধার দিই নি', আমি বলি, যা দিই নি তা আদায় করবো
কীভাবে?'

'আপনি কি এখন ধার দিতে পারবেন', দেবী বলেন, 'যদি আমি বলি আমার

পর্যাশ হাজার টাকার খুব দরকার?' আমি দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর দেবী বলেন, 'মনে করুন আপনি ধার দিয়েছেন আমি নিয়েছি।'

দেবীকে আমি ধার দিয়েছি, এমন একটা বোধ হয় আমার, দেবী তা ভুলে নিতে বলছেন, আমি দেবীর দিকে এগিয়ে যাই, আমি আর বালক নই, আমিও পারি, ধার আদায় করে নিতে পারি, যা জমশেদ মোঘলা পারে আমাকে তা পারতে হবে, আমাকে হ'তে হবে জমশেদ মোঘলা। না, আমি হয়ে উঠবো শিল্পী স্বপ্নি, কবিও হয়ে উঠবো আমি, এমন কিছু আমি আজ সৃষ্টি করবো যা এ-বিষণ্ণ করণ সুন্দর রূপসী শরীরে আর কেউ সৃষ্টি করে নি। অন্যরা ঝণ আদায় করে নিয়েছে আমি ঝণ আদায় করবো না, তার কোনো অধিকার আমার নেই, আমি আমার ঝণ শোধ করবো এমন কিছু সৃষ্টি করে যা কবনো এ-শরীরে কেউ সৃষ্টি করে নি। আমি প্রথম দেবীর পদতল স্পর্শ করি, পদ্মের মতো দুটি পদতল, ওষ্ঠ দিয়ে চুম্বন করি, দেবী শিউরে ওঠেন, হয়তো কেউ এর আগে এখানে ওষ্ঠ রাখে নি; আমি তার প্রতিটি পদাঙ্গুলিকে জিভ ও ওষ্ঠের সাহায্যে পুজো করতে থাকি। তিনি আমার পুজো গ্রহণ করেন। আমি মনে ধীরে ওষ্ঠ ও জিভ দিয়ে পুজো করতে করতে পবিত্র দুটি জানু পাই, দুটি পদাঙ্গুলীপের মতো জানু, সেখানে আমি অনেকক্ষণ বাস করি, দেবী বারবার ক্ষেত্রে উঠতে থাকেন। আমার মনে হ'তে থাকে জাহাজভূবির পর আমি খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে দেবীর জানুধীপে এসে আশ্রয় পেয়েছি। এক সময় অনন্ত কাল পরে যেনো, আমি দেবীর মন্দিরের দ্বারে পৌছেই, দ্বায়াচন্দ্র মন্দির, বিশুদ্ধ তার জলচন্দ্রি, আমি মুক্ত হই, তার দরোজার পর দরোজার রঙিন আভায় আমার চোখ উত্তে যায়। আমি মন্দিরের দ্বারে এক পরম পুজোরীর মতো সাটাঞ্জে অবনত হই, এ-দরোজা দিয়ে অনেক আদিম জন্ম প্রবেশ করেছে আর বেরিয়ে এসেছে কেনো গোলাপ পাপড়ি পড়েনি। আমি আমার ওষ্ঠের আর জিতের গোলাপ ফেটিছে থাকি, গোলাপের পর গোলাপ ফেটাতে থাকি, ওষ্ঠ আর জিভ দিয়ে মন্দিরের দরোজা ঝুলতে থাকি, তেসে যেতে থাকি দেবীর অনন্ত ঝরনাধারায়। পৃথিবীতে কি তখন ভূমিকম্প হয়েছিলো, হোটেলটি কি তখন চুরমার হয়ে গিয়েছিলো? দেবী গলে সম্পূর্ণ অমৃতধারায় পরিণত হয়ে যান। আরো ওপরে, আরো ওপরে, আরো ওপরে; দেবীর যুগল চাঁদের জ্যোৎস্নায় আমার যুব আলোকিত হয়ে ওঠে। এখন আমার সামনে সম্পূর্ণ উন্ম্যাচিত দেবী। রওশনকে মনে পড়ছে, দেবীর চাঁদ নিয়ে আমি খেলা করি, খেলা করি, খেলা করি; দেবী আর আমি একাকার হয়ে যাই। অনন্ত চেউ উঠতে থাকে, মহাজগত তরঙ্গিত হয়ে উঠতে থাকে, প্রাবন্ধে সূর্যচাঁদতারা ডুবে যায়, দেবী আর আমি চরম অঙ্ককারের জ্যোতিতে মিশে যাই।

'এতো সুখ আছে', দেবী অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে বলেন, 'আমি জানতাম না।' দেবী লতার মতো পেঁচিয়ে আছেন আমাকে।

'আমি তো ঝণ আদায় করি নি, সুখ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম', আমি বলি।

'আপনার কি মনে হয় আমি সত্যিই ধার চাই?' দেবী বলেন, 'সত্যিই কি আমার টাকার খুব দরকার?

'তা আমি জানি না', আমি বলি।

'আমার টাকার বেশি দরকার নেই, কিন্তু আপনি তো দেখেছেন আমাকে ঘিরে সব সময়ই ওরা আছে', দেবী বলেন, 'আপনি তো বোঝেন ওরা আমার কাছে কী চায়?'

'তা আমি বুঝি', আমি বলি।

'ওরা আমার জন্যে সব করতে প্রস্তুত', দেবী বলেন, 'যদি আমি শুধু দেহখানি দিই। আমি তো সবাইকে দেহ দিতে পারি না। আমি যদি বিয়ে ক'রে ফেলতাম ওরা আসতো না, ওরা আমার জন্যে কিছু করতো না, ওরা আমাকে বিখ্যাত ক'রে তুলেছে, বিখ্যাত হ'তে আমার তালোই লাগে। আমি আবার বিয়ে করলে ওরা আমাকে বিখ্যাতও করতো না, ওরা আমাকে বেদনার দেবীরূপে দেখতে চায়, আমিও তাই হয়ে উঠেছি। আমার একটি দেবর তো লেগেই আছে আমাকে বিয়ে করার জন্যে, কিন্তু দেবরের সাথে ঘুমোছি তাবতেই আমার ঘেন্না লাগে।'

'আপনি ধার কেনো নেন?' আমি জানতে চাই।

'ওদের ঠেকানোর জন্যে। পৈয়াব্দিতি বছরের এক নামকরা বুড়ো আমাকে ভাবী ডাকে, আর ঘুমোতে চায় আমার সাথে। তার সাথে আমি কেন্ত্রো ঘুমোবো? জমশেদ মোঘো আমাকে ভাবী ডাকে, আর ঘুমোতে চায় আমার সাথে। তার সাথে আমি কেনো ঘুমোবো? সেজন্যেই আমি ধার চাই। বুড়ো বেশি টাকা দিতে পারবে না, আমি তার কাছে চলিশ হাজার ধার চাই, এবার সাধ মেটান্নার জন্যে সে চলিশ হাজার ধার দেয়, পরে আর তার সাধ থাকে না। কিন্তু জমশেদ মোঘোর টাকা আছে, সাধেরও শেষ নেই। তার থেকে আমি পাঁচ হাজার ডলারের কম্বল নিই না, আর তা শোধ করি দু কি তিনবারে।'

'আপনার ভক্ত অনেক, অনেকক্ষণে তৎপুর রাখতে হয় আপনাকে,' আমি বলি।

'আমি ওদের স্বত্ত্বাব বিষ্ণু' দেবী বলেন, 'একেকজনের স্বত্ত্বাব অনুসারে আমি খাদ্য দিই। একটি ভক্ত আছে সৌম্য কুকুরের মতো, ও বেশি কিছু চায় না, ওকে আমি ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি চুবতে দিই, চুবতে পেরে ওর সুখের শেষ থাকে না।' দেবী চুপ ক'রে থাকেন কিছুক্ষণ, তাঁর গভীর ঘূম পেয়েছে, তাঁর চোখ বুজে আসছে, চোখ বুজতে বুজতে বলেন, 'আরো কিছু সৃষ্টি করুন, যাতে আমি আবর্জনার কথা ভুলে যেতে পারি।'

আমি ধার দিই নি, আমি ধার আদায় করছি না; আমি সৃষ্টি করছি, আমিও কিছু ভুলে যেতে চাই, ফিরোজাকে তার দেবর ফোন করেছে কি না, তা ভাবতে চাই না, ভুলে যেতে চাই; আমি দেবীকে সৃষ্টি করতে চাই। এটা আমার সৃষ্টির রাত, আজ রাতে আমি স্বষ্টা। দেবী নিজেকে ভুলে দিয়েছেন আমার হাতে, নগ্ন বিষণ্ণ কাতর সুন্দর দেবী, তাঁর শরীর ধার শোধ করেছে এতো দিন, আজ রাতে ওই শরীর চায় কিছু সৃষ্টি। আমি তাঁকে আঙুলের ছোয়ায় সৃষ্টি ক'রে ভুলতে চাই। সুখের জন্যে, যখন আমি সুখ চাচ্ছি না আমি সুখ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি অন্যের শরীরে, তখন আমাকে হ'তে হবে সুরস্বষ্টা, যার হাতের ছোয়ায় বেহালা হাহাকার করে, বীণা বেজে ওঠে। আমি দশ আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে দেবীর দেহবীণা বাজাতে শুরু করি। তাঁর প্রতিটি তত্ত্বাতে আমার আঙুলের ছোয়া লাগে, তিনি বাজতে থাকেন, সুব উঠতে থাকে তাঁর গ্রীবা থেকে, বাহু থেকে, বগলের কৃষ্ণ রোমরাজি থেকে, চাঁদ থেকে, হৃদ থেকে। দেবীর ডান চাঁদের লাল চক্রে কয়েকটি

লাল রোম ঘাসের মতো জড়িয়ে আছে, বাহতে টিকার দাগ দুটি ঘূমন্ত অগ্নিগিরির মতো জুলজুল করছে। বাজাতে বাজাতে আমার আঙুল গিয়ে পৌছে বিশুদ্ধ গোলাপের ওপর, গোলাপের পাপড়ির ওপর, গিয়ে পৌছে গোলাপ বৌটার ওপর, পাপড়ি থেকে বৌটায় আর বৌটা থেকে পাপড়িতে আমার আঙুল বীণাবাদকের আঙুলের মতো সূর তুলতে শুরু করে, পাপড়ির পর পাপড়িতে আঙুল পড়তে থাকে, দেবী বেজে উঠেন, বাজাতে থাকেন, পাপড়ি পেরিয়ে আমার আঙুল গোলাপপেয়ালার ভেতরে প্রবেশ করে, যখুন উপচে পড়তে থাকে গোলাপপেয়ালা থেকে। দেবী চৈত্রের বাতাসে আনন্দানিত গোলাপের মতো কাঁপতে থাকেন, গোলাপ ভেঙেচুরে সমস্ত পাপড়ি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমি শধু ঝংকার শুনতে থাকি। তখন আমি প্রবেশ করি গোলাপপেয়ালার যত্নের, আমি ম'রে যেতে থাকি, আমি বেঁচে উঠতে থাকি, দেবী ম'রে যেতে থাকেন, দেবী বেঁচে উঠতে থাকেন, আমরা অনন্ত মৃত্যু আর পুনরুজ্জীবনের মধ্যে দূনতে থাকি।

আমি অন্তুত স্বপ্ন দেখছি আজকাল প্রায়ই, প্রায়ই বওশনক্ষে স্বপ্ন দেখছি, আর পরীক্ষার স্বপ্ন দেখছি। দুটিই অপ্রাসঙ্গিক আমার জীবনে কিন্তু ওই দুটিই ফিরে ফিরে দেখছি, আমার ঘূম ভেঙে যাচ্ছে, আর ঘুমোতে পারছি না। বওশনকে আমি আজকাল মনেই করতে পারি না, তার মুখ মনে করতে পারি না, কিন্তু স্বপ্নে তার মুখ অবিকল আগের মতো দেখতে পাই; শধু সে আগের যত্নে বাধানো কবরের পাশে দাঁড়ায় না, দেবি সে দাঁড়িয়ে আছে কোনো পাহাড়ের পাশে বা মাঠের মাঝাবানে, আমাকে দেখে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আমাকে ছিঁতে পারছে না, তার সাথে যারা আছে আমি তাদের চিনি না। আবার দেখতে পাই পরীক্ষা দিতে গেছি, অনেক দেরি হ'য়ে গেছে আমার, পরীক্ষা শেষ হওয়ার বাকি নেই, আমাকে কেউ প্রশ্নপত্র দিচ্ছে না, আমি চিৎকার ক'রে প্রশ্নপত্র চাচ্ছি, আমাকে বলা হচ্ছে আর প্রশ্নপত্র নেই। আমার ঘূম ভেঙে যাচ্ছে। দুটির কোনোটিই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, যা আমার জীবনে সম্পূর্ণ নিরর্থক তার স্বপ্ন আমি কেনো দেখি? আমি কি নিরর্থকতার স্বপ্ন দেখছি, এ-স্বপ্ন দুটি কি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার জীবন নিরর্থক হয়ে গেছে? আমি কি গোপনে গোপনে অনুভব করছি ওই নিরর্থকতা? কিন্তু কী অর্থপূর্ণ? আমি কোনো কিছুতেই কোনো অর্থ খুঁজে পাই না, বেঁচে থাকা আমার কাছে নিরর্থক, বেঁচে-না-থাকাও আমার কাছে নিরর্থক; নদীর ওপর ব্রিজ থাকা আমার কাছে নিরর্থক, না-থাকাও নিরর্থক।

ফিরোজার সাথে দেখা হচ্ছে না, অর্চির সাথে দেখা হচ্ছে না, যদিও আমরা একই ফ্ল্যাটে আছি, আমি অবশ্য বেশি সময় থাকার সুযোগ পাচ্ছি না; আমাদের সম্পর্ক পিতা, স্বামী, মাতা, স্ত্রী, কন্যার, কিন্তু দেখা হচ্ছে না। যতোটুকু দেখা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা হয় আমাদের অন্যদের সাথে। আমি যখন দুপুরে বাসায় ফিরি তখন অর্চি বাথরুমে, সে আর বাথরুম থেকে বেরোয় না। আমি ভেবে পাই না অর্চি বাথরুমে কী ক'রে, একজন মানুষের কেনো গোসল করতে এতোটা সময় দরকার হয়? অর্চি কি বাথরুমের বরনার নিচে থাকতেই পছন্দ করে? ওর শরীর জুড়ে কি ক্লান্তি নেমেছে, ঝরনাধারার নিচে থেকে কি অর্চি আবার তার শক্তি ফিরে পায়? আমি ওকে এ

সম্পর্কে প্রশ্ন করতে সাহস করি না। চারপাশের ময়লা ওর শরীরে হয়তো জমছে, অর্চি হয়তো ময়লা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে বাথরুমের বারনার নিচে চিরকাল ধরে দাঢ়িয়ে থাকতে চাচ্ছে।

অর্চিকে আমি জিজ্ঞেস করি, ‘অর্চি, তোমার কী ভালো লাগে?’

‘আমার কিছু ভালো লাগে না’, অর্চি বলে, ‘কিছু, ভালাগে না।’

‘নদী বা সমুদ্র দেখতে তোমার ইচ্ছে করে না?’ আমি জিজ্ঞেস করি।

‘না, ইচ্ছে করে না’, অর্চি বলে, ‘আমার কিছুই ইচ্ছে করে না।’

‘আমাদের যহাপুরুষদের কথা তুমি কখনো ভাবো?’ আমি বলি।

হাহাকার করে ওঠে অর্চি, আমি তয় পাই; অর্চি অবলীলায় বলে, ‘ওদের কথা তাবার আমার সময় নেই, ওরা বড়ো অকওআর্ড পিপল, ওদের থেকে পপ সিংগারস আর মাচ মোর অট্টাকটিত, আই অ্যাডোর দেম।’

ফিরোজাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অর্চির সাথে ইঙ্গুলে যাচ্ছে প্রাইভেটে যাচ্ছে আসছে, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মনে হয়। উদেশ্যহীনতার ক্ষতিতে ভুগছে ফিরোজা? অর্চির কিছুই ভালো লাগে না, তবে তার একটা উদেশ্য আছে, অনেক লেটারফেটার তাকে পেতে হবে, পাবেই, না পেলে তার চলবে না যে ফিরোজার চলবে না; ফিরোজার কিছু পাওয়ার নেই। অর্চির লেটারগুলো কি সার্থক করে তুলবে ফিরোজাকে? আমাকে করবে না, ফিরোজাকে কি করবে? করবে ব'লে মনে হচ্ছে। সে চাকুরিটা করতে পারতো। আমি আজ ইঙ্গুলাথেকে অর্চিকে আনতে গিয়ে ইঙ্গুলের সামনে রাশিরাশি সারিসারি ফিরোজাকে সাথে চমকে উঠি। অর্চির ছুটি হওয়ার বেশ আগেই আমি ইঙ্গুলে হাজির হই, দেবি সারিসারি ফিরোজা ব'সে আছে সামনের ফুটপাতে, মাঠের গাছের নিচে অনেক পাজেরোতে, আর ঝকঝকে টয়োটায়—আমার তয় লাগতে থাকে। তারা অসেক্ষা করে আছে তাদের কন্যা আর পুত্রদের জন্যে। প্রতিটি মাঘের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই তারা ক্লান্ত; তারা এসব সোনালি বাচ্চাদের গর্ভে ধারণ করেছে, গর্ভে নিয়ে বারবার ক্লিনিকে ছোটাছুটি করেছে, তারপর চিৎ হয়ে প্রসব করেছে, এখন বছরের পর বছর ক্লুলের সামনে ব'সে আছে। একটি মহিলা দু-পা ছড়িয়েই বসেছে, যেমন ছড়াতে হয় বিয়োনোর সময়; বিয়োনোর অভ্যাসটি তার যায় নি মনে হয়, হয়তো তার পেটে আরেকটি এসেছে, হায়রে ঝাত্রির খওকালীন উশ্চাদনা, তাই ঠিক যতো বসতে পারছে না। ওইটিকে নিয়েও তার এখানে আসতে হবে বছরের পর বছর। আমি এদের শরীরে জং দেখতে পাচ্ছি, শ্যাওলা দেখতে পাচ্ছি। ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত এরা। অনেক বছর ধরে হয়তো একটা ভালো পুলকও বোধ করে নি, কেঁপে ওঠে নি; নিয়মসম্মতভাবে নিচে শয়েছে। এদের স্বামীরা ঝকঝকে অশ্বের মতো বিচরণ করে চলছে নিশ্চয়ই, আমিও বিচরণ করছি; তারা ক্লান্ত নয়, না কি তারাও ক্লান্ত?

অনেকক্ষণ ধরেই তাবছি তয়ে পড়বো, কিন্তু বুঝতে পারছি না তয়ে পড়বো কি না; ফিরোজাও বুঝতে পারছে না ব'লে মনে হচ্ছে; টিভি থেকে ভিসিআরে যাচ্ছি, ভিসিআর থেকে টিভিতে যাচ্ছি, ফিরোজা কিছু বলছে না, আমি কিছু দেখছি না, ফিরোজাও কিছু

দেখছে না ব'লেই মনে হচ্ছে, নইলে টিভি থেকে ভিসিআরে আর ভিসিআর থেকে টিভিতে যাওয়া আসায় সে বাধা দিতো, বিরক্ত হতো, বাধা দিচ্ছে না, বিরক্ত হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি না, শয়ে পড়বো কি না। টিভির মেয়েগুলোর মেদের দাপাদাপি বিরক্তিকর লাগছে, বাসি মনে হচ্ছে, কিন্তু বক্ষ করে দিতে পারছি না, আমি জানি না বক্ষ ক'রে দেয়াটা ফিরোজার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না। বক্ষ ক'রে দেয়ার একটি তয়ানক পরিণতি হচ্ছে আমাদের পৌছেতে হবে এক অভিন্ন সিদ্ধান্তে যে আমরা দূজনই ঘুমোতে চাই, বিছানায় শয়ে পড়তে চাই। আমরা কি অমন অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছেতে পারবো? আমি অমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস পাচ্ছি না। আজ অবশ্য ফিরোজাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগছে, সে অন্যের বউ হ'লে সারা সংস্ক্যা আমি হয়তো অনবরত কথা ব'লে যেতে পারতাম, নিজের বউ ব'লে কিছুই বলতে পারছি না, তার সাথে আমি তো নদী, ব্রিজ, বাড়, বা জীবন নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। বাস্তবতা নিয়ে আর কতোক্ষণ কথা বলা যায়? চা খাবো, চিনি লাগবে কি না, আজ রাতে কী খাবার, অর্চির পড়াতনা কেমন এগোচ্ছে ধরনের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই হয় নি সারা সংস্ক্যা, এখন আর কথাই পাচ্ছি না। ফিরোজাকে আকর্ষণীয় লাগছে, তার ঠোট বেশ ভেজা দেখাচ্ছে, আমি তাতে আরো ভয় পাচ্ছি। ফিরোজা যনে করতে পারে আজ তাকে আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ব'লে আমি লস্পটের মাস্ক উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। না, আমি লস্পট নই। আমি টিভি থেকে ভিসিআরে ভিসিআর থেকে টিভিতে যাতায়াত করতে থাকি, এক সময় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। ফিরোজার হাতে এখন রিমোট কন্ট্রোল, ফিরোজা ভিসিআর থেকে টিভিতে টিভি থেকে ভিসিআরে যাতায়াত করতে থাকে, কিছুই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। আমি চোখ বোজার চেষ্টা করি, চোখ বুজে থাকি; চোখ বুজালে আমি সাধারণত অনেক কিছু দেখতে পাই, কিন্তু আজ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ফিরোজা টিভি আর ভিসিআর বক্ষ ক'রে তার বিছানায় গিয়ে শয়ে পড়ে। আলোটা নেতৃত্ব না, আলোটা নেতৃত্বের সাহস তার হচ্ছে না মনে হচ্ছে; আলোটা নেতৃত্বেই মনে হবে আমরা অভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে গেছি যে এখন ঘুমোতে হবে।

'আলোটা কি নিভিয়ে দেবো?' আমি এক সময় জিজ্ঞেস করি।

'না', ফিরোজা বলে।

উঠে গিয়ে সে আবার ভিসিআর থেকে টিভিতে যাতায়াত করতে থাকে, যাতায়াত করতে করতে ঝান্ত হয়ে পড়ে। সে শয়ে পড়তে চায়।

'আলোটা কি নিভিয়ে দেবো?' ফিরোজা আমাকে জিজ্ঞেস করে।

'না', আমি বলি।

উঠে গিয়ে আমি আবার টিভি থেকে ভিসিআরে ভিসিআর থেকে টিভিতে যাতায়াত করতে থাকি, যাতায়াত করতে করতে ঝান্ত হয়ে পড়ি। আমার শয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়।

'বাতিটা নিভিয়ে দিই?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'দাও', ফিরোজা বলে।

আমি গিয়ে আমার বিছানায় শয়ে পড়ি। এখন আমার একটি বড়ো দায়িত্ব ঘুমিয়ে পড়া, এখন ফিরোজার বড়ো দায়িত্ব ঘুমিয়ে পড়া; কিন্তু আমরা কি ঘুমিয়ে পড়তে

পারবো? অঙ্ককারে আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না ফিরোজা কীভাবে ওয়েছে, চোখ বন্ধ করেছে কি না, আমাকেও সে দেখতে পাচ্ছি না নিশ্চয়ই, হয়তো দেখার চেষ্টা করছে আমি কীভাবে ঘুমোচ্ছি, যেমন আমিও দেখতে চাচ্ছি। ফিরোজাকে কি আমি ডাকবো? ডাকা কি ঠিক হবে? সে তো উঠে এসে আমার পাশে ওতে পারতো। আমি কি গিয়ে তার পাশে ওয়ে পড়বো, সেটা কি নিজেকে ছোটো করা হবে না? পাশে ওয়ে পড়লেই কি আমি তাকে ছুঁতে পারবো? ফিরোজা যদি পছন্দ না ক'রে? ফিরোজা কি চাচ্ছে আমি তার পাশে গিয়ে ওই, তাকে জড়িয়ে ধরি, আমার যা ইচ্ছে করি? ঘড়িটা তার অন্তু সুন্দর আওয়াজ করছে, এখন রাত কতো হলো, কতোক্ষণ ধ'রে আমি ঘুমোনোর চেষ্টা করছি? ফিরোজা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সে একবার এদিক আরেকবার ওদিক ফিরে ওলো মনে হয়, সেও কি ঘুমোচ্ছে না? ফিরোজা কি জানে আমি মাহমুদা রহমানের সাথে মাঝেমাঝে ঘুমোই, আর দু-একবার ঘুমিয়েছি দেবীর সাথে তার জানার কথা নয়, তবে সে সন্দেহ পোষণ করে আমার সম্বন্ধে, যেমন আমি সন্দেহ পোষণ করি। আমি কি একটু উন্নেজিত? ফিরোজাও? আমার কি একটু প্রশংসন দরকার? ফিরোজারও? আমি জানি না। মনে করা যাক ফিরোজা আর আমার মধ্যে কেনে সম্পর্ক নেই, সে অন্য কারো স্ত্রী, দিনাজপুর থেকে ট্রেনে এসেছে, আমি অন্য কারো স্বামী, ট্রেনে এসেছি সিলেট থেকে, মধ্যরাত, কোনো রেলস্টেশনে একই বরে ঘুমোতে বাধ্য হচ্ছি, তাহলে এখন আমরা কী করতাম? নিজ নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তাম? যদি আমরা একই ঘরে ঘুমোতে রাজি হতাম তাহলে আমরা ঘুমেপ্তাম না, মুখোমুখি বসে চা খেতাম, সে আমাকে দিনাজপুরের গল্প শোনাতো, আমরা চা খেতাম, আমি তাকে সিলেটের গল্প শোনাতাম, আমরা চা খেতাম, অন্তত লাগতো আমাদের চা আর গল্প; সে আমার কাছে আমার বাল্যকালের গল্প ওনতে চাইতাম, আমাকে বাল্ল থেকে বিস্কুট বের ক'রে দিতো আমি তার কাছে তার বাল্যকালের গল্প ওনতে চাইতাম, বাল্ল থেকে তাকে চকোলেট বের ক'রে দিতাম। তারপর যদি আমাদের একটু শীতশীত লাগতো, যদি আমাদের একটু ঘুমঘুম লাগতো, আমরা প্রথমে একজন আরেকজনের আঙ্গুল ছুঁতাম, পরে গাল চিবুক ছুঁতাম, ঠোট ছুঁতাম, একজন আরেকজনের মূখের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর সব তাঁৰা ভুলে গিয়ে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস না ক'রে বাতি নিতিয়ে দিতাম, আমরা যাত্র একটি শয্যা ব্যবহার করতাম, আরেকটি শয্যা শীতে কাতর হয়ে একলা প'ড়ে থাকতো।

ফিরোজা আর আমি তা পারছি না, আমরা স্বামীস্ত্রী, আমরা কেউ কারো কাছে বাল্যকালের গল্প ওনতে চাই না; আমার বাল্যকালের গল্প ওনে ফিরোজার ঘেন্না লাগবে, ফিরোজার বাল্যকালের গল্প আমার বিরক্তিকর যনে হবে, ফিরোজা গল্প বলতে গেলে সব কিছু জড়িয়ে ফেলে, কিছু বাদ দিতে চায় না, শেষ ক'রে উঠতে পারে না, আমরা দুই শয্যায় পড়ে আছি। আমি জানি ফিরোজা উঠে আসবে না, মেয়েদের আশ্র্য সংযম আছে, ওরা যনকে চেপে রাখতে পারে যখন মন চায়, শরীরকে চেপে রাখতে পারে যখন শরীর চায়। আমি পারি না। এর আগেও এমন হয়েছে, ফিরোজা আশ্র্যভাবে চেপে রেখেছে নিজেকে, যদিও তারই দরকার ছিলো বেশি; কিন্তু আমি চেপে রাখতে

পারি নি, যদিও আমার কোনো দরকার ছিলো না। এখনো আমার খুব দরকার নেই, কিন্তু আমি ঘুমোতে পারছি না, ঘুমোতে না পারা খুবই জঘন্য ব্যাপার।

‘তুমি কি ঘুমোচ্ছা?’ আমি অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলি।

ফিরোজা কোনো উত্তর দিচ্ছে না। আমি কি আবার আমার স্বগতোক্তি করবো? আমার কঠশ্বর কি ওই বিছানা পর্যন্ত পৌছে নি?

‘তুমি কি ঘুমোচ্ছা?’ আমি আবার স্বগতোক্তির মতো বলি।

ফিরোজা এবার সাড়া দেয়, বলে, ‘কেনো, তাতে কী দরকার তোমার?’

আমি বিব্রত বোধ করি, বিছানায় উঠে বসি; বলি, ‘আমার ঘুম আসছে না।’

ফিরোজা বলে, ‘আমি তার কী করতে পারি?’

আমি বলি, ‘একটা রাবার নামাও না।’

ফিরোজা চূপ ক'রে থাকে, আমি আবার বলি, ‘একটা রাবার নামাও না।’

ফিরোজা বলে, ‘আমার সাথে শব্দ এটুকুই তো কথা।’

আমি আবার বিব্রত বোধ করি, কোনো কথা বলি না। অলকঞ্চণ নীরবতার পর পর ফিরোজা বলে, ‘দরকার হ'লে তুমিই নামাও।’

আমি বলি, ‘কোথায় আছে আমি তো জানি না।’

ফিরোজা বলে, ‘যেখানে থাকার সেখানেই আছে।’

অঙ্ককারে আমি সে-জায়গাটি হাতড়াচ্ছে ধাকি, প্রচুর কাপড় আর এলোমেলো জিনিশে ঢেকে আছে সব কিছু, যা খুঁজাই তো আমার হাতে লাগছে না। একটি বড়ো বাল্ল থাকার কথা। তাহলে কি সব কুকুরে গেছে? ফুরিয়ে যাওয়ার তো কথা নয়। এক সময় বড়ো বাল্লটিতে হাত লাগে, আমি ভেতরে হাত চুকিয়ে একটি ছোটো প্যাকেট বের ক'রে আনতে চাই। হাল্ট হোটি ছোটো প্যাকেট, আমার মনে হয়, থাকার কথা; কিন্তু দু-তিনটি প্যাকেট যাত্র প'ড়ে আছে। বাকিগুলো গেলো কই? আমরা আটাশ-ত্রিশটির মতো ব্যবহার করেছি, এ-কক্ষে, এতো সময় আমরা পেলাম কই? তাহলে ফিরোজা কি বাকিগুলো ব্যবহার করেছে? আমি একটু কেপে উঠি। ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করবো প্যাকেট এতো কমলো কী ক'রে? সে কি রেগে উঠবে না? কিন্তু প্যাকেট এতো কমলো কী ক'রে? আমাদের তো দশ পনেরো বিশ দিনেও কিছু হয় না। ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করবো? একটু হাঙ্কা ভঙ্গিতে?

‘এই’, আমি বলি, ‘প্যাকেট এতো কম কেনো! ’

ফিরোজা একটু রেগে ওঠে, ‘আমি ব'সে ব'সে বেয়েছি।’

আমি বলি, ‘মাঝেমাঝে বাইরেটাইরে নিয়ে যাও না তো।’

ফিরোজা রাগে না, বলে, ‘দরকার হ'লে তো নিইই।’

আমি বিব্রত হই, বলি, ‘মাঝেমাঝেই নাও মনে হয়।’

ফিরোজা বলে, ‘এরপর একটি খাতা বানিয়ে হিশেব লিবে রেখো।’

আমি একটু হাসার চেষ্টা করি, বলি, ‘একটা সেক্রেটারি নিয়োগ করতে হবে এর জন্য।’

ফিরোজা বলে, ‘একটা চেস্টেটি বেল্টও কিনে আনতে পারো।’

আমি বলি, ‘আজকাল বাজারে কি চেস্টেটি বেল্টও পাওয়া যায়?’

ফিরোজা বলে, ‘পাওয়া না গেলে ব্রিজট্রিজ রেখে তুমি একটা কারখানা খুলতে পারো। তোমার তো কোটিপতি হওয়ার সাধ আছে।’

ফিরোজার প্রস্তাৱটি চমৎকার; রিয়াদ, তেহেরান, ভাটিকান বা মতিঝিলের ধার্মিক ব্যাংকটির সাথে যোগাযোগ কৱলে আৱাপ হয় না, তাৰা এ-প্ৰকল্পে মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ কৱবে উৎসাহের সঙ্গে। সুদমুক্ত ঝণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি কি ফিরোজাকে চেস্টেটি বেল্ট পৰাতে পারবো? উল্টো দেখা যাবে মাহমুদা রহমানকে তাৰ আলহাজ স্বামী খান দুই চেস্টেটি বেল্ট পৰিয়ে গেছে, এমনকি জমশেদ মোল্লা আমারই কারখানায় উৎপাদিত চেস্টেটি বেল্ট পৰিয়ে দিয়েছে দেবীৰ কোমৰে।

ফিরোজা ভেঙ্গেৰে যাচ্ছে, আমাকে ঘেন্না ক'ৰে সে শক্ত হয়ে থাকবে ব'লে আমি তয় পাছিলাম, এখন সে এতো ভাঙ্গে যে আমি তয় পাছি, ফিরোজা কি এখনো মনে কৱে আমি ঠিক পারি না? আমি কি ফিরোজাকে জিজ্ঞেস কৰিসে, ফিরোজা কি উত্তৰ দেবে? এটা কি উত্তৰ দেয়াৰ সময়? ঘেন্নাটেন্নার মতো ~~ক্ষণী~~ ব্যাপারগুলো এ-সময় মনে থাকে না, ঘেন্নার কথা মনে থাকে আগে; এ-সময় ~~মানুষ~~ দেবতা হয়ে ওঠে; মানুষেৰ মন ঘেন্না কৱতে পারে, ঘেন্না ক'ৰে নানা সমস্যা ~~তৈরি~~ কৰে; কিন্তু শৰীৰ ঘেন্নাৰ উৰ্ধে, শৰীৰ কোনো ঘেন্না জানে না, ধৰ্ম জানে ~~না~~, দুশ্মন জানে না, রাজনীতি জানে না; শৰীৰ জানে জলেৰ মতো ঝৰতে মোমেৰ মতো গলতে ফুলেৰ মতো ফুটতে। শৰীৰেৰ কাজ শেষ হয়ে গেলে আবাৰ মন কাজ ~~কৰিবলৈ~~ তুল কৰে, মনেৰ কাজ সব সময়ই সমস্যা তৈৰি কৱা, খুব তেতৰ থেকে বুজে খুড়ে খুব মারাত্মক কিছু বেৱ কৱা। আমি মনেৰ কাজকে দমিয়েই রাখতে চাই, তবে ফিরোজা মনেৰ কাজ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না ব'লেই মনে হয়।

‘আমাকে দৱকাৰ তোমার শুধু এটুকুৰ জন্মে’, ফিরোজা বলে।

‘একে শুধু এটুকু বলছো কেনো?’ ‘আমি বলি।

‘এটুকু ছাড়া আৱ কী?’ ফিরোজা বলে।

‘এটাই তো বড়ো কাজ জীবনেৰ’, আমি বলি।

‘আমাৰ তো তা মনে হয় না’, ফিরোজা বলে।

‘তোমাৰ ভালো লাগে না?’ আমি বলি।

ফিরোজা কোনো উত্তৰ দেয় না। সে ঘূমিয়ে পড়তে চায়, আমি আমাৰ শব্দ্যায় এসে তয়ে পড়ি, এবাৰ আমাৰ ঘূম আসে, ফিরোজারও এসে গেছে মনে হয়।

মাহমুদা রহমান মারাত্মক ব্রিসিকতা কৱতে পারেন, নিজেকে নিয়েও, টেলিফোনেই অবলীলায় তিনি ভয়ঙ্কৰ ব্রিসিকতা ক'ৰে চলেন। আমাৰ তয় লাগে কখন কে আমাদেৱ সংযোগেৰ মধ্যে ঢুকে পড়ে, সব কিছু উল্টোপাল্টে যায়।

টেলিফোন বাজলে আমি ধ'ৰে বলি, ‘হ্যালো।’

তিনি এখন আৱ ‘আমি’ বলেন না, বলেন, ‘আপনাৰ উপপত্নী।’

আমি প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করতাম, এখন আব করি না, বরং তাবতে ভালোই লাগে যে আমার একটি উপপত্তি আছে। আমার পিতার একটি ছিলো, তাঁর পিতার হয়তো দুটি ছিলো, তাঁর পিতার হয়তো একগতা ছিলো। উপপত্তি কী, কী হলৈ কেউ উপপত্তি হয়, উপপত্তি হয়?

আমার বলতে ইচ্ছে হয়, ‘বনুন, উপপত্তি, আপনি কেমন আছেন?’ কিন্তু আমি বলতে পারি না, মনে মনে ভালো লাগলেও তা উচ্চারণ করার সময় আমার গলা বদ্ধ হয়ে আসে; আমি বলি, ‘আপনার রসিকতাবোধ ভয়ঙ্কর।’

তিনি আগে বলতেন, ‘আপনি ভাগ্যবান, একটি টাকা ব্যয় না করেও এমন একটি উপপত্তি পেয়েছেন।’

আমি বলতাম, ‘আপনি কী যে বলেন।’

তিনি বলতেন, ‘আমি সত্যিই বলি, তাবতে আমার ভালোই লাগে যে আমি আপনার উপপত্তি।’

আমি বলতাম, ‘আপনার ভালো লাগা খুবই সাংঘাতিক।

এখন আমিও রসিকতা করি, না করে উপায় নেই, সব কিছু গুরুত্বের সাথে নিলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

এখন যখন বলেন, ‘কী ভাগ্যবান আপনি! একটি পয়সাও ব্যয় না করে এমন একটি উপপত্তি পেয়েছেন।’

আমি বলি, কিন্তু যে-সেবাটি দিই ক্ষমতামাম?

তিনি হেসে বলেন, ‘মিলিয়ন ডলার।’

আমি বলি, ‘তিন মিলিয়ন।’

তিনি বলেন, ‘কীভাবে।’

আমি বলি, ‘পতির কাছে পেতেন একটি সেবা, আমি গরিব, কিছু দিতে পারি না, তাই আমি দিই তিনটি সেবা, প্রত্যেকটির দাম ভেবে দেশুন।’

মাহমুদা রহমান হাসেন, আমি তার শব্দ পাই।

তিনি একদিন বলেন, ‘একটি কথা কি আপনি কখনো ভেবেছেন?’ আমি বলি, ‘কী কথা?’

তিনি বলেন, ‘উপপত্তিকে পত্তী করে নিলে কেমন হয়?’

আমি শিউরে উঠি, কথা বলতে পারি না, বিজ ধসে পড়ছে দেখতে পাই।

তিনি বলেন, ‘তব পাচ্ছেন মনে হচ্ছে।’

আমি বলি, ‘হ্যা, পাচ্ছি।’

তিনি বলেন, ‘তব এখন থাক, চলে আসুন।’

আমি না করতে পারি না; না করলে তিনি মনে করবেন আমি, একটা আন্ত কাপুরুষ, শুধু ভয়ই পাই নি, পালিয়ে যাওয়ারও পথ খুঁজছি। হঠাৎ তার পত্তী হওয়ার সাধ জাগলো কেনো? তিনি তো একজনের পত্তী হয়ে দেখেছেন, তার সুব মহত্ব থেম কাম সবই দেখেছেন, তাহলে তাঁর এমন সাধ হলো কেনো? তিনি কি মনে করছেন হাফিজুর রহমানের পত্তী হওয়াতেই সব বা অনেকটা গোলমাল হয়ে গেছে, তার বদলে

তিনি যদি মাহমুদ হোসেনের বিবাহিত পত্নী হতেন বা এখন হন, সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি সুবে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন? আমার তা মনে হয় না; ফিরোজার সাথে জড়িয়ে গেছি ব'লে আমার গোলমাল হচ্ছে আমার মনে হয় না, মাহমুদ রহমানের সাথে বিয়ে হলেও একই গোলমাল হতো। তিনি ভাবছেন ব্যক্তিই মূল সমস্যা, যদি ঠিক লোকটিকে পাওয়া যেতো, সব ঠিক হয়ে যেতো, সব ঠিক থাকতো, অর্থাৎ আমি হাফিজুর রহমানের থেকে বেশি ঠিক মানুষ, — অন্তত এখন তার মনে হচ্ছে, আমার সাথে বিয়ে হলে তিনি আরো বেশি ঠিক থাকতেন; আমি ভাবছি অন্যরকম, আমার কাছে কাঠামোই মূল সমস্যা, ব্যক্তি গৌণ। নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে থাকা সম্ভব নয়, এটা ঠিক; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সাথেও থাকা অসম্ভব, কিন্তু আমরা থাকছি। এ-কাঠামো আমার সমস্ত কিছু হরণ করে নিজেকে টিকিয়ে রাখে। আমি বোধ করি আমাদের কেথাও একটা ব্যাপার আছে যে আমরা একে অন্যের প্রতি টান বোধ করবো কাম বোধ করবো প্রেম বোধ করবো, এটা চমৎকার ব্যাপার; তবে আরেকটা ব্যাপারও আছে আমাদের, সেটা চমৎকার নয়, বেশ খারাপই, তা হচ্ছে আমরা একে অন্যের প্রতি টান বেশি দিন ধরে রাখতে পারবো না। হাতপা বেঁধে সাঁতার দেয়া সম্ভব নয়, বিবাহ হচ্ছে হত্যা বেঁধে সাঁতার দেয়ার অসম্ভব চেষ্টা, যা কেউ পেরে ওঠে না। মাহমুদ রহমান আমি আমি সাঁতার দিই, তিনি ভাবছেন যদি আমরা একটি কাঠামো তৈরি করে মেলে বিবাহের কাঠামো, তাহলেও আমরা সাঁতার দিতে পারবো; কিন্তু আমি জানি তাঁর আমরা সাঁতার দিতে পারবো না। তিনি হাফিজুর রহমানের সাথে সাঁতার কাটার সুখ পান নি, আমি ফিরোজার সাথে পাই না, ফিরোজা আমার সাথে পায় না; ফিরোজা যদি মাহমুদ রহমান হতো আমার সাঁতারে সুবের শেষ থাকতো না।

তিনি বলেন, ‘উপপত্নী থাকতে আমার ভালোই লাগছিলো, কিন্তু এখন আর ভালো লাগছে না।’

আমি বলি, ‘আমি কখনো আপনাকে আমার উপপত্নী মনে করি নি। তাহলে আপনাকে গুলশানে বাড়ি ভাড়া ক'রে দিতাম, মাসে বিশ হাজার টাকা দিতাম ভরণপোষণের জন্য।’

‘ওসব আমার দরকার ছিলো না’, তিনি বলেন, ‘আগে আমাদের মাঝেমাঝে দেখা হলেই আমার হতো, এখন আমার সব সময় দেখার ইচ্ছে হয়। আমি শুধু আপনাকে পালিয়ে সকালবেলা পেতে চাই না, রাতের পেতে চাই।’

আমি বলি, ‘এমন হলো কেনো আপনার?’

তিনি বলেন, ‘গোপনে মিলিত হয়ে হয়ে এখন আমার মনে হচ্ছে আমি দেহ দিচ্ছি, এটা আমার ভালো লাগছে না; আমি একসাথে বেড়াতে যেতে চাই, দুপুরে বাসায় দেখতে চাই, রাতে একসাথে ঘুমোতে চাই।’

আমি বলি, ‘আপনার মধ্যে চিরভন্ন নারীত্ব জেগে উঠেছে মনে হচ্ছে, ওটিকেই আমি ভয় পাই বেশি।’

তিনি বলেন, ‘আমি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী হতেও রাজি আছি।’

আমি বলি, 'আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে পারি, সে আমাকে ছেড়ে দিতে পারে, তবে আর কেনো স্ত্রীর কথা আমি ভাবি না, দ্বিতীয় স্ত্রীর কথাই ওঠে না।'

তিনি বলেন, আপনি শুধু আমার দেহটিকেই ভোগ করতে চান। যদি আমি দেহ ভোগ করতে দিই, তবে শুধু আপনাকে কেনো, অন্য অনেককেও আমি দিতে পারি, তাতে আমার সুখ বাড়বে।'

আমি বলি, 'নারীদের নিয়ে এটি এক বড়ো সমস্যা, তারা মনে করে পুরুষরাই তাদের দেহ ভোগ করে, তারা পুরুষদের দেহ ভোগ করে না। আমি কি শুধু আপনার দেহ ভোগ করেছি, আপনি কি আমার দেহ ভোগ করেন নি? আমিই কি শুধু সুখ পেয়েছি, আপনি কি সুখ পান নি? আসলে আপনিই পেয়েছেন বেশি সুখ; আপনি পুলকের পর পুলকে তেজে পড়েছেন, আপনি যতো পুলক বোধ করেছেন আমি ততো বোধ করি নি। তবে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে কার সাথে আপনি জড়িত হবেন তা ঠিক করার।'

তিনি কেঁদে ফেলেন, 'আপনাকে যে আমি সম্পূর্ণ পেতে আছি।'

আমি জানি না সম্পূর্ণ পাওয়া কাকে বলে, তিনি বিজেতাই হয়তো ভাবছেন সম্পূর্ণ পাওয়া। আমি তো তাকে সম্পূর্ণ পেতে চাই না। কয়েক ঘাস আগে হাফিজুর রহমান দেশে বেরিয়ে গেলেন, তখন আমার মনে হয় নি যে হাফিজুর রহমানকে আমার সম্পূর্ণ পেতে হবে, হাফিজুর রহমান যাতে তার সাথে মিলিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বরং আমি একটু দূরে থাকতে পেরে স্বত্ত্বাই পেয়েছি। তখনও মাহমুদা রহমান আমাকে ফোন করেছেন, আমি বেশ কয়েক বার বেড়াতেও গেছি তার বাসায়, বুঝতে পেরেছি হাফিজুর রহমান যাইকৃতির পিপাসা নিয়ে দেশে ফিরেছেন, দিনরাত পান করছেন, খাচ্ছেন।

মাহমুদা রহমান ফোন করেছেন, 'ভদ্রলোকের ক্ষুধা মিটছে না। স্বামী বলে বাধাও দিতে পারছি না।'

আমি বলেছি, 'অনেক দিন ধরে ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত, তাই একটু বেশিই পান করবেন। খেতে দিন, পান করতে দিন, সওয়াব হবে।'

তিনি বলেছেন, 'কিন্তু উচ্চের যতো খায় আর পান করে, যাকে খাচ্ছে তার কথা তাবে না। আর সওয়াব? দিনে আশি লক্ষ বছরের সওয়াব আদায় করছে।'

আমি বলেছি, 'যে খায় সে নিজের কথাই ভাবে, নিজের পেট তরছে কি না, খেতে ভালো লাগছে কি না, সেটাই তার বিবেচনার বিষয়; তার খাওয়ার ফলে খাদ্যের কেমন লাগছে সেটা তার ভাবার বিষয় নয়।'

তিনি বলেছেন, 'কেউ কেউ তো তেমন নয়।'

আমি বলেছি, 'ওই কেউ কেউ শুধু খায় না, নিজেকেও খেতে দেয়।'

তিনি বলেছেন, 'ভদ্রলোক আমাকে প্রেগন্যান্ট ক'রে রেখে যেতে চায়।'

আমি বলেছি, 'অর্থাৎ তিনি নিজেকে আপনার ভেতরে রেখে যেতে চান, যাতে তাকে আপনি সব সময় বোধ করেন।'

তিনি বলেছেন, 'না না, তা হয় না; আমি আর ওই সব চাই না।'

তিনি এখন আমাকে সম্পূর্ণ পেতে চান, আমাকে সম্পূর্ণ পাওয়ার মধ্যে আমি কোনো মহিমা দেখতে পাই না, যেমন আমি মাহমুদা রহমানকে সম্পূর্ণ পাওয়ার মধ্যেও কোনো মহিমা দেখি না, বিপর্যয় দেখতে পাই। ফিরোজা বিপর্যয়ের একটা আভাসও দিয়েছে, সে আমার কাছে জানতে চেয়েছে মাহমুদা রহমান সম্পর্কে, তিনি কেমন আছেন সে-সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফিরোজার কি এটা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ আগ্রহ না কি এর ভেতর কোনো পাপ রয়েছে। ফিরোজা কি জানতে পেরেছে যে আমার সাথে মাহমুদা রহমানের একটা সম্পর্ক গঠড়ে উঠেছে, মাঝেমাঝে আমি তাঁর বাসায় অসময়ে যাই? কী করে সে জানবে? জানার হাজার পথ খোলা রয়েছে। ড্রাইভার জানিয়েছে, আমাদেরই কেউ জানিয়েছে? ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে অবশ্য আমি কিছু বুঝতে পারি নি; পারি নি বলৈই আমার সন্দেহ হচ্ছে তার মনে পাপ আছে, তার আগ্রহ নিষ্পাপ নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন কিছু বোঝা যায় না, তখন, আমার বিশ্বাস, বুঝতে হবে অত্যন্ত মারাত্মক কিছু রয়েছে অত্যন্ত গভীরে। ফিরোজার গভীরেও কিছু ধাকতে পারে, হয়তো আছেই, তা বাইরে দেখা দিতে বেশি সময় নেবে না। আমাকে তৈরি করতে হবে একটা সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্যে, কিন্তু আমি তো ফিরোজার মতো নিরীহ মুখে মারাত্মক ব্যাপারগুলো তেরে চেপে রাখতে পারি না। সংকট এসেই যায়, ফিরোজা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।

'মাহমুদ তাবীকে না কি তুমি আজকষ্ট শুব সাহায্য করছো?' ফিরোজা বলে।

'তুমি কোথায় শুনলে?' আমি বলি।

'কোথায় শুনলাম সেটা ভিন্ন কিন্তু, তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করছো কি না আমি তাই জানতে চাই', ফিরোজা বলে।

'তাঁর দরকার হ'লে মাঝেমাঝে সাহায্য তো করিই, তাঁর শ্বামী আমাদের বন্ধু ছিলেন', আমি বলি।

'যেমন তুমি বিদেশে গেলে তোমার কোনো কোনো বন্ধু আমাকেও সাহায্য করবে', ফিরোজা বলে।

'আমি অবশ্য কখনো বিদেশে যাবো না', আমি বলি।

'সাহায্য করার জন্যে কখন তাঁর বাসায় যাও?' ফিরোজা প্রচণ্ড প্রশ্ন করে।

'যখন দরকার হয়', আমি বলি।

ফিরোজা কি আরো এগোবে, সব সত্য আজ সন্ধ্যায়ই উদঘাটন করবে? ফিরোজা আর এগোয় না, আমি স্বস্তি পাই; তবে আজ রাতে ফিরোজার সাথে সম্পর্কের একটা বাসনা আমার ছিলো,— দু-সপ্তাহ কোনো সম্পর্ক হয় নি, সেটা নষ্ট হয়ে যায়; আমার পক্ষে আর তাকে ডাকা সম্ভব হবে না, সে তো ডাকবেই না। ফিরোজা কি আমার আর মাহমুদা রহমানের সম্পর্কের কথা জেনে গেছে, সে কি মনে করে আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে? আমার তা-ই মনে হয়। ফিরোজা মাঝেমাঝেই বলে বিবাহিত পুরুষগুলোই বেশি ইতর হয়, কুকুরের মতো, চল্লিশ বছর হয়ে গেলে তারা ইতরামো ছাড়া আর কিছুই জানে না, তাদের জিভ লকলক করতে থাকে সব সময়; কিছু না

পেলে তারা কাজের মেয়েগুলোর দিকেই হাত বাড়ায়, বড়য়ের থেকে কাজের মেয়েগুলোর স্বাদই তাদের বেশি ভালো লাগে। আমাকে নিয়ে ফিরোজা অবশ্য এ-সন্দেহটা পোষণ করে না, যদিও আমাদের বাসার কাজের মেয়েটি সুন্দরী; কারণ আমি বাসায়ই থাকি না, যতোক্ষণ থাকি ফিরোজাও থাকে। তবে আমার মনে হয় ফিরোজা মনে করে মাহমুদু রহমানের সাথে আমার একটা সম্পর্ক আছে, সেটা শারীরিক, কেননা এ-বয়সে অন্য কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। ফিরোজার সম্পর্কটি কেমন? টেলিফোন দেবরটি তার থেকে পাঁচ-ছ বছরের ছোট হবে, তবে ফিরোজাকে তার পাশে বালিকাই মনে হয়; একদিন দেবরটিকে আমি বাসায়ও দেখেছি, বিকেলবেলা আমি বাসায় থাকবো সে হয়তো ভাবতে পারে নি, আমাকে দেখে সে খুব বিব্রত বোধ করছিলো। খুব বিনয়ের সাথেই সে কথা বলছিলো ফিরোজার সাথে, আমার সাথেও, ফিরোজা তাকে 'তুমি' বলছিলো, সে ফিরোজাকে আপনি' বলছিলো, বিনয়ে সোফায় দু-পা আর দু-হাত জড়ে করে বসে কথা বলছিলো অবতারটি। অবতারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃত্য না কী পড়ায়, অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় পিএইচডিও এনেছে। তাবীর সাথে তার নিষ্পাপ নৃত্যাত্মিক সম্পর্ক? নিষ্পাপ সম্পর্কই যদি তাহলে অন্যের স্ত্রীকে তাবী ডেকে সম্পর্ক করার কী দরকার ছিলো, তাহলে একটা কবুতর বা দোয়েল বা শাপলা বা আকাশের মেঘের সাথে সম্পর্ক করবেন পারতো। মানুষের সাথে কেনো? মানুষের সাথে সম্পর্ক কখনো নিষ্পাপ হয়? নিষ্পাপ সম্পর্ক হয়? নিষ্পাপ সম্পর্ক কখনো টেকে? ফিরোজার সাথে তার সম্পর্ক কী? নিষয়ই নৃত্যাত্মিক। ছোকরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো চমে এখন দেখে চেতে চাচ্ছে। ফিরোজার মুখে একটা বয়সের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে, ছোকরাটির মুখে বালক বালক তাব এখনো রয়েছে, ফিরোজা কি এ-বালকটির নিচে নিজেকে সম্পর্ণ করতে পারে? হয়তো পারে, বালকের স্বাদ অপূর্ব মনে হতে পারে তার, আর বালকটির অসামান্য অনুভূতি হওয়ারই কথা, সব বালকই তার চেয়ে বয়সে ধড়ো কোনো নারীকে প্রাতৃত করার দিবাস্ত্রপু দেখে, আমিও দেখতাম। বালকটির বয়স যতো বাড়বে কচি লাউডগার জন্যে ততোই পাগল হবে; কিন্তু ফিরোজার সাথে বালকের কী সম্পর্ক?

বালকটি কি মুক্ত হয়ে শুধু ফিরোজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর কোনো দিকে তাকায় না, ফিরোজার গলার স্বর শুনে শুনেই বিভোর হয়ে যায়, অন্য কোনো সুর তার উনতে ইচ্ছে করে না? ফিরোজা আর বালকটির কি এখনো সোনালি রূপেলি গল্লের পর্ব চলছে? সে কি ফিরোজাকে শুনিয়ে যাচ্ছে শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের গল্ল, ফিরোজা বালিকার মতো শুনে চলছে? না কি তারা পরম্পরের শরীরের কাছাকাছি এসে গেছে? হয়তো এসে গেছে, এসে গেছে বলেই মনে হচ্ছে; ফিরোজা নিজের আর আমার শরীরের প্রতি এতো নিষ্পৃহ হয়ে পড়েছে হয়তো সে-জন্যেই, বালকটি তাকে পরিত্নক করে চলছে বলেই হয়তো এতো নিরাসক হতে পারছে সে আজকাল। তারা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিচ্ছে তো, না কি কাকের বাসায় একটি কোকিলের ছানা দেখা দেবে অচিরেই, এবং আমাকে সেটি নিজের বলে মেনে নিতে হবে, যদিও আমি অত্যন্ত সাবধান? আমার তো প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছে হবে না যে ওই ছানাটির জন্যে আমি

দায়ী নই, অন্য কেউ দায়ী। ছানাটি দেখে এমনও হতে পারে যে আমার ভালো লেগে যাবে, আমার খুব মায়া হবে, অনেক দিন পর একটি বাচ্চার মাংসের ছোয়া পেয়ে আমার তৃক শিউরে উঠবে, তখন নৃতাত্ত্বিক আর ফিরোজা আমাকে নিয়ে হাসবে। অন্য রকমও হতে পারে, ফিরোজা রক্ত দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে অবতারটির কাছে ছুটে যেতে পারে, তাকে বিয়ে করার জন্যে কান্নাকাটি করতে পারে, তখন অবতারটি ফিরোজাকে নাও চিনতে পারে; এবং হতাশ ফিরোজা একটি আত্মহত্যার উদ্যোগ নিতে পারে, সে সফল হতে পারে, ব্যর্থও হতে পারে। তখন দোষ হবে আমার, মানবতাবাদীরা সবাই চিংকার করে বলবে আমার পীড়ন সহ্য করতে না পেরেই ফিরোজা ট্রাকের বা ট্রেনের নিচে ঝাপিয়ে পড়েছে; আমার মতো পাষণ্ড হিতীয়াটি আর হয় না। রগরগে সাংবাদিকগুলো খুঁজে বের করবে যে আমি একটি অত্যন্ত লম্পট পুরুষ, নারী থেকে নারীতে ছুটে বেড়ানোই আমার কাজ, আমার এক ডজন উপপত্তি রয়েছে, আর সে-শোকেই ফিরোজা আত্মহত্যা করেছে। আমি কি ফিরোজাকে পরামর্শ দেবো সে যা-ই করক প্রতিরোধের ব্যবস্থাটি যেনো গ্রহণ করে? তবে ফিরোজা যদি আসলেই ঘুমোয় বালকটির সাথে, আর আমি যদি তা নিষিদ্ধভাবে জানতে পারি, আমার কেমন লাগবে?

ফিরোজাকে সন্ধ্যার একটু পরে ধানমণির আটনবর সড়কে দেখতে পাবো আমি ভাবি নি; আমার ধারণা ছিলো সে অর্চির সাথে অংকের মাস্টারের বাসায় আছে; অর্চি অংক শিখছে, ফিরোজা আর দশজন দারিদ্র্যশীল মাতার মতো মাস্টারের অপেক্ষাগারে বসে হিন্দি ছবি জীবন সার্থক করছে। দারিদ্র্যশীল মাতাদের চিন্তিবিনোদনের ব্যবস্থা না করলে ব্যবসা জমবে না, এটা দারিদ্র্যশীল মহৎ মাস্টার দোকানদাররাও বোঝে, আমি উনেছিলাম ফিরোজা বিকেলে সেখানেই থাকে, অংক শেষ হলে অর্চিকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। গর্জবতী হওয়ার কামুকাবহ পরিমাণ। আমি দেখলাম ফিরোজার গাড়িটি আটনবর সড়কের একটি বাড়ি থেকে দ্রুত বেরোলো হয়তো একটু পরেই অংকক্ষম শেষ হবে অর্চির, শেষ হওয়ার আগেই সে গিয়ে অপেক্ষাগারে বসবে, অর্চি বেরিয়ে দেখবে যা ব'সে আছে। সে বুঝতে পারবে না তার জননী ধানমণির আটনবর সড়কে একটু ভ্রমণে গিয়েছিলো। আমি যে এ সময় এ-পথ দিয়ে যাবো ফিরোজা ভাবে নি; আমি ড্রাইভারকে দ্রুত গাড়ি চালাতে বলতে পারি, গিয়ে উঠতে পারি অর্চির অংকের মাস্টারের বাসায়, কিন্তু আমি তা করবো না; তা ছাড়া অংকের মাস্টারের বাসাটা কোন দোজগে তা আমি জানি না। এ-সড়কে ফিরোজার কোনো আত্মীয় আছে ব'লে আমি শনি নি, তবে কোনো পরমাত্মীয় থাকতে পারে যার ঠিকানা আমি জানি না। নৃতাত্ত্বিক অবতারটি কি এখানে থাকে? অর্চি যখন অংক শেষে তখন কি ফিরোজা নৃত্ব শেষে? দুজনের ঘনিষ্ঠ একান্ত নগ্ন নৃত্ব? আমি তালো ক'রে ফিরোজাকে দেখতে পাই নি, তার চুলের অবস্থা বা শাড়ির ভাঁজ দেখতে পাই নি, পেলে আমি একটা ধারণা করতে পারতাম তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে; হয়তো তাও পারতাম না। আমি রক্তের উষ্ণতা টের পাই আমার, কিন্তু বেশি উষ্ণ হ'তে দিই না; অবতারটির যদি একটা বড় থাকতো আমি কিছুটা প্রতিশোধ নিতে পারতাম, বা পারার কথা ভাবতাম। ফিরোজাকে

যে আমি আটন্সর সড়কে দেখেছি, তাও আমি বলবো না, অন্তত আজই বলবো না, বললে নিজেকে আমার ছেটো মনে হবে, নিজেকেই আমি ঘৃণা করবো।

ফিরোজা ঘূমিয়েই থাকে যদি বালকটির সাথে আমি কেনো উত্তেজিত হবো (আমি একটু উত্তেজিত), কেনো আমার রক্ত বলক দিয়ে উঠবে (আমার রক্ত একটু ফুটছে), পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে থাকবে (একটু কাঁপছে)? আমি কি ঘুমোই না অন্য নারীর সাথে? আমি কি দু-গোলার্ধের নারীশরীরসংস্থান জানি না? আমি কি ব্যাংকক, তোকিও, লভন, নিউইর্ক, মদ্রাজ যাই নি? আমি কি মঙ্গোলীয় মসৃণতা, জাপানি গন্ধ, শ্যামদেশীয় বর্তুলতা, মার্কিন যুক্তাম্বারতা, কৃষ্ণাঙ্গিনী পেশলতা, আর তামিলনী কৃষ্ণ আঙনের স্বাদ পাই নি; এবং পাই নি মাহমুদা রহমান আর দেবীর শরীরের প্রসাদ? আর রওশনের স্বর্গথও? আমি যখন আমার জীবনের দিকে তাকাই ব্যাংকের হিশেব, উত্তরার বাড়ি, নদীর ওপর ব্রিজগুলোর কথা মনে পড়ে না, খিলিক দিতে থাকে ওই সব শরীর, ওই সব জ্যোতির্ময় বাঁক উচ্চতা গভীরতা, ওই সব হিরণ্যায় অবসাদ, যা আমাকে সুখে আনন্দে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছে। আমি জানি সবই নিরর্থক এই ব্রিজ নিরর্থক, সূর্য নিরর্থক, সব কাঠামোই ধ'সে পড়বে, আমি মাটিতে চিপ্পে যাবো, মাটি শূন্যতায় মিশে যাবো, মাটি শূন্যতায় মিশে যাবে। এর মাঝে অর্থপূর্ণ হচ্ছে ওই সব জ্যোতির টুকরোগুলো। আমার ইন্দ্রিয়গুলো প্রথর, আমি কেনো একটি ইন্দ্রিয় মাত্র একটি কাজ করে না, প্রত্যেকটি অসংখ্য কাজ করে, অটুটু করতে শেখাই। চোখ দিয়ে আমি শুধু দেখি না, চোখ দিয়ে আমি ছুই, চোখ দিয়ে আমি বাই, পান করি, এমনকি চোখ দিয়ে আমি মিলন করি। নিরর্থক এভরে আমার কাছে হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। ফিরোজা অন্য কারো সাথে মিলিত হ'লে আমি কেপবো কেনো? সে আমার স্ত্রী ব'লে? তার দেহের ওপর আমার সমস্ত অধিকার ব'লে, তার সমস্ত বাঁক সমস্ত রক্ত আমার ব'লে? সেখানে অন্য কেউ হাত দিলে আমার পুরুষতায় আঘাত লাগে ব'লে কিন্তু আমি কি কাঁপি না?

আশ্চর্য, বিস্মিত হই আমি, ওই সন্ধ্যায় ফিরোজাকে আমার বেশি আকর্ষণীয়, বেশি আবেদনময় মনে হয়। আমাকে হঠাতে বাসায় দেখতে পেয়ে প্রথম একটু বিচলিত হয় সে, কিন্তু জুলজুল করতে থাকে, মনে হয় ফিরোজার তেতরে কোনো তীব্র আলো ঢুকেছে, যা তার তুক ভেদ ক'রে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে। এখন আমি আটন্সর সড়কের কথা তুললে সমস্ত আলো নিতে যাবে, অঙ্ককার নেমে আসবে, তার মাংস আর আস্তা কালো হয়ে উঠবে। কালো হয়ে উঠবে আমার মাংসও। ফিরোজাকে বেশ চঞ্চল মনে হয়, সে বাতাসে ভাসছে; একটি বালক তাকে একটি লাল নীল বেলুনের মতো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

‘তোমাকে আজ বালমলে মনে হচ্ছে’, আমি বলি।

‘তাহলে তুমিও আমার দিকে তাকাও?’ ফিরোজা বলে, ‘তাকানো উপযুক্ত মনে করো!'

‘সবাই আজ তোমার দিকে নিশ্চয়ই ঝুঁক বেশি ক'রে তাকিয়েছে’, আমি বলি।

‘তাকাক, তাদের ভালো লাগলে নাওক’, ফিরোজা বলে, ‘কারো যদি ভালো লেগে থাকে আমার তাতে আপনি নেই।’

‘আমি আপনির কথা বলি নি’, আমি বলি, ‘তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।’

‘তোমার অভিযোগের কী আছে?’ ফিরোজা বলে, আর আমার দিকে ত্রিখণ্ড চোখে তাকায়। ফিরোজা সম্ভবত আমার চোখে ঈর্ষা দেখতে চায়।

আমি আর কোনো কথা বলি না, ভালো নিভিয়ে দিই; ফিরোজা বিশ্মিত হয়। আমি তাকে টেনে এনে জোর করি, এমন জোর কখনো করি নি, কখনো করবো ভাবি নি; কিন্তু জোর করতে আমার আশ্চর্য ভালো লাগে। ফিরোজা প্রথম বাধা দিতে চেষ্টা করে, নখ দিয়ে খামচি দেবে বলে মনে হয়, কিন্তু সে অবিলম্বে সাড়া দিতে থাকে, আমি অবাক হই। আমার আজকের আচরণ সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার, ফিরোজার তো অবশ্যই; আমার অন্তর্ভুক্ত লাগতে থাকে যে ফিরোজা আমার প্রতিটি নতুন উদ্যোগে প্রথম একটু বাধা দিয়ে তারপরই উপভোগ করতে থাকে। আমি রক্তের স্বাদ টের পাই, লবণাক্ত স্বাদ; মানুষের রক্তের আশ্চর্য স্বাদ রয়েছে; বিভিন্ন রক্তের রক্ত বিভিন্ন রকম মনে হয় আমার। আমি এমন সব পথে যাত্রা করতে থাকি যে-পথে কখনো ভ্রমণ করি নি, ফিরোজা প্রথম বাধা দেয়, কিন্তু আমার জোর-ভ্রমণ তার কাছে চমৎকার লাগতে থাকে। দুর্গম দুর্গহ দুর্গত পথ, আমি ঝুঁড়িয়ে চলি, ঝুঁড়িয়ে চলি, দস্যুর মতো চলি। আমি ফিরোজাকে চিনতে পারি না, মনে হ'তে পারে আমি ফিরোজার সাথে নেই, কোনো ক্রীতদাসীর সাথে আছি; কালো, অশ্রুকরের মতো কালো, আওনের মতো প্রচণ্ড ক্রীতদাসী, যাকে হনন করার সমষ্টি অধিকার আমার রয়েছে। আমি হনন করতে থাকি, ফিরোজা হননে আনন্দ পেতে থাকে, ক্রীতদাসীর কঠের রক্তের মাংসের শব্দে গঞ্জে রঙে আমার অঙ্ককার পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে; আদিম অঙ্ককারে আমরা আর বিধিবিহু কাঠামোয় আটকে থাকি না, রক্তাক্ত গলিত উদ্বেলিত পাপবিহু সুব্রহ্মত প্রভুদাসী হয়ে উঠি।

আমাদের খালে বাঁশের পুল, মাঠের পথে ডেবার ওপর ভেঙে পড়া কাঁঠাল গাছ, পাথরের গৌঢ়নি সেতু, দো-আশলা গৌঢ়নি সেতু, প্রিস্টেসড কংক্রিট, স্টিল ট্রাসেড, ক্যান্টিলিভার সেতু, ঝুলন্ত সেতু, ধারাবাহিক সেতু, বিলান সেতু, পিয়ার, ওপরকাঠামো, অবকাঠামো, পিলপালা, রওশন, ফিরোজা, মাহমুদা রহমান, আমি, দেবী, বাঁশের পুল, ভেঙে পড়া কাঁঠাল গাছ, পাথরের গৌঢ়নি, দো-আশলা গৌঢ়নি, ঝুলন্ত, প্রিস্টেসড, বিলান, ক্যান্টিলিভার, কিন্তু আমি কোনো সেতু দেখছি না, আমার সাথে আর কারো কোনো ব্রিজ তৈরি হয় নি, আমি সেতু বাঁধতে পারি নি, কেউ পারে না। মাহমুদা রহমানের বাসায় কয়েক দিন যাই নি, তিনিও এখন দশটা বাজলেই বেজে উঠেন না; আমি কোনো কোনো দিন ফোন করেছি, অনেকক্ষণ ধরে বাজে, তিনি ধরেন না। বাইরে তাঁর কাজ পড়েছে হয়তো, না কি বাসায় থেকেও ওই সময়ে ফোন ধরেন না, ফোন তাঁকে বিরুদ্ধ করে। আমি সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবো, নিতে ইচ্ছে করছে আমার; আর মাহমুদা রহমান নয় দেবী নয়, ফিরোজাও নয়, আমি একা, সম্পূর্ণ

একা। আমি বোধ করি আমার সময় বড়ো বেশি বেড়ে গেছে, একঘণ্টা আর ষাট মিনিট নেই, হাজার হাজার মিনিট হয়ে উঠেছে, আমার ওই সময়টা ত'রে রাখার মতো কোনো সম্পদ নেই। জীবন আরো নির্বর্ক আরো শূন্য হয়ে উঠেছে। আমি যদি আরো তিরিশ বছর বেঁচে থাকি, আমার তয় লাগতে থাকে, তাহলে এতেওলো বছর আমি বহন করবো কীভাবে? আমার যা কাজ তা শেষ ক'রে আমি আর কিছু পাই না। মাহমুদা রহমানের কাছে যাচ্ছি না, যাবো না; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমার তাঁকেই মনে পড়ছে, আমার এখন পান করতে করতে আরো বেশি মাহমুদা রহমানকে মনে পড়ে; তাঁকে টেলিফোন করবো না, কিন্তু পানের টেবিলেই যদি একটি টেলিফোন থাকতো তাহলে এখনি তাঁকে ফোন করতাম। পান করতে করতে আমার ক্ষেত্রটা কেটে যায়, পান করলে আমি অনেক বেশি সরল হয়ে উঠি, দেবতা হয়ে উঠি, মানুষের ঘৃণা ক্ষেত্র পাপগুলো থাকে না, আমি শেষ ক'রে উঠে দাঢ়াই। মাহমুদা রহমানকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে ছুঁতে ইচ্ছে করছে; এতো বেশি আর কখনো দেখতে আর ছুঁতে ইচ্ছে করেনি।

মাহমুদা রহমানের বাসায় গিয়ে আমি কলিংবেল রাজস্ব, আমি নিজেই অবাক হই এখানে আমার আসার কথা ছিলো না, আমি আসতে চাইলোনি, ইচ্ছে ছিলো বিজ দেখতে যাবো, কাজ কেমন হচ্ছে দেখবো বা নদী দেখবো। তার বদলে আমি মাহমুদা রহমানের ফ্ল্যাটের কলিংবেলে আঙুল রেবে দু-মাস চাপ দিই। আমি মাতান হই নি কখনো হই না অতোটা আমি কখনোই ধোকানা; শুধু একটু গঙ্গ ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না একটু আগে আমি পান করেছি। মাহমুদা রহমান আমাকে দেখে অবাক হন, বিব্রতও হন; আমি বুঝতে পারি তিনি বিব্রত, তাতে আমি অবাক হই;- এসময়ে আমাকে দেখে তাঁর শুধুই অবাক হওয়ার কথা ছিলো, বিব্রত হওয়ার কথা ছিলো না। অন্য দিন হ'লে তিনি আমাকে সরাসরি শব্দ্যাকঙ্ক নিয়ে যেতেন, সেটাই আরামদায়ক ও অন্তরঙ্গ, আজ ড্রয়িংরুমে ঢুকতে হলো তাঁর সাথে, ঢুকে আমি একটু আহত হলাম সেখানে যুগ্ম জিল্লার রহমানকে দেখতে পেয়ে। আমি জানি না তিনি জিল্লার রহমান কি না, তিনি যুগ্মসচিব কি না, মাহমুদা রহমান তাঁর এ-পরিচয়ই দিলেন; পরিচয়টি ঠিকই হবে, আমার কাছে তাঁকে লুকোতে চান নি মাহমুদা রহমান, আমার যে-পরিচয় দিলেন তাঁর কাছে, সেটা ঠিকই। 'যুগ্ম' শব্দটি সব সময়ই আমার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু লাগে, প্রথম যখন পেয়েছিলাম তখন থেকেই, শব্দটি শুনলেই লেগে থাকার গৈথে থাকার সেইটে থাকার ভাব মনে আসে, আর আমি দু-একটি যুগ্ম দেখেছি, সেগুলো অন্তর্ভাবে লেগে থাকতে গৈথে থাকতে পারে; আমি বুঝতে পারি এ-যুগ্মটি লেগে আছেন গৈথে আছেন মাহমুদা রহমানের পশ্চাতে। তাঁর কোনো উপসচিবের বাসায় থাকার কথা ছিলো, তিনি এখন মাহমুদা রহমানের বাসায়। আজই কি তিনি প্রথম মাহমুদা রহমানের যুগ্ম হয়েছেন? না কি কয়েক দিন ধ'রেই হয়েছেন, আসছে? তিনি বুব টানটান হয়ে আছেন, তাঁর সারা দেহখানি দোড়িয়ে আছে; কোনো শিথিলতা ফ্লাঙ্গি নেই তাঁর শরীরে চোখেমুখে, মনে হচ্ছে এখনি ফেটে পড়বেন; তাহলে তিনি লেগে থাকার পূরক্ষার পান নি এখনো। আমি কি চ'লে যাবো, তাঁদের কথা আর কাজে অসুবিধা হচ্ছে সম্ভবত,

আমি কি চ'লে যাবো? মাহমুদা রহমান আমাদের দুজনকে নিয়ে কী করবেন? একটি যুগ্ম আরেকটি ক্যান্টিলিভার তাঁর একসাথে দরকার পড়বে না। মাহমুদা রহমানই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ভার নিলেন, তিনি আমাকে এখনো পরিত্যাগ করেন নি।

তিনি বললেন, ‘আপনাকে কয়েক দিন ধ'রেই ফোন করছি। (সত্য নয়), পাছে না (সত্য নয়), আপনাকে আমার খুব দরকার (হয়তো সত্য নয়)।

আমি কী বলবো, বলবো কি আমি ঢাকায় ছিলাম না, তাই পান নি; আমি তা বলতে পারি না, কী বলতে হবে বুঝতে পারি না, ওধু বলি, ‘আজ আমি যাই, আরেক দিন আসবো।’

মাহমুদা রহমান আরো বিশ্বিত হয়ে পড়েন, আমার চ'লে যাওয়া সুন্দর দেখাবে না ব'লে আমার মনে হয়, এবং তাঁরও মনে হয় ব'লে আমার মনে হয়।

তিনি বলেন, ‘আপনাকে আমার খুব দরকার (সত্য নয়), দয়া ক'রে একটু বসুন।’

তিনি এভাবে কথা বলছেন কেনো? আমি চ'লে গেলে তাঁর কী আসে যায়?

আমি মাহমুদা রহমানের দিকে তাকাই, আমার মনে কিছু কিছুক্ষণ আগে তাঁকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করছিলো, ছুঁতেও খুব ইচ্ছে করছিলো; এখন আমার কিছুই ইচ্ছে করছে না, দেখতেও ইচ্ছে করছে না, ছুঁতেও না, পান করার সময় তাঁকে আমার কবৃতর মেঘ টুনটুনি জলপাই মনে হচ্ছিলো। এখন তাঁকে মিসেস রহমান মনে হচ্ছে, যাকে দেখার কিছু নেই ছোয়ার কিছু নেই যুগ্মাতি সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন আজ আর কোন কাজ হবে না, একটা বাজে গুড় দেয়া দিয়েছে; তিনি উঠে দাঢ়ান, তাবীকে আশ্বাস দিতে থাকেন শিগগিরই আরো আসবেন, তাঁর আজ অনেক কাজ, নইলে আরো কিছুক্ষণ থাকতেন; মাহমুদা রহমান তাঁকে দরোজা পর্যন্ত দিয়ে আসেন। আমি মাহমুদা রহমানকে আবার দেখি, তাঁকে আমার কবৃতর মনে হয় না মেঘ মনে হয় না টুনটুনি মনে হয় না জলপাই মনে হয় না, তাঁকে দেখার কিছু নেই ছোয়ার কিছু নেই। তিনি হয়তো আমার চোখ দেখে তা বুঝতে পারেন, তাঁকে এতো অসহায় দেখাতে থাকে যে এবং এমন অসহায়ভাবে আমার পাশে এসে বসেন যে আমার মায়া হয়। তাঁর মুখটি অত্যন্ত ছোটো দেখায়, তাতে রঙ নেই ব'লে মনে হয়।

তিনি বলেন, ‘যুগ্মসচিব আমাকে বিয়ে করতে চান, পরিচয়ের পর থেকেই প্রস্তাৱ দিচ্ছেন, আংটিও কিনেছেন, বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছেন।

আমি তাঁর ঘুৰের দিকে তাকাই, কিছু বলি না।

তিনি বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই আমার রূপের খুব প্রশংসা করছেন, বাহু গাল ঠোঁটও বাদ দিচ্ছে না, ভদ্রতা ক'রে হয়তো বুকটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, খুব শুতে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হই নি’ এখন বিয়ে ক'রেই শুতে চান।’

আমি বলি, ‘প্রেম ও ধর্ম দুটিই কাজে লাগাতে চান, যেটিতে কাজ হয়। আমাদের আমলারা বেশ নীতিপরায়ণ পরহেজগার মানুষ, এখনো বিয়েশাদিতে তাঁরা বিশ্বাস হারান নি।’

তিনি বলেন, ভদ্রলোকের বউ অতিরিক্ত সচিবের সাথে পালিয়েছে কয়েক মাস আগে। শোকেদুঃখেঅপমানে কাতর হয়ে আছেন, আমাকে বিছানায় তুলে শোকদুঃখঅপমান ভুলতে চান।'

আমি বলি, 'তাঁর কোনো উপসচিব নেই?'

তিনি বলেন, 'তা আমি জানতে চাই নি। আমি তাঁকে একটি অবিবাহিত মেয়ে বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিলাম, চারপাশে মেয়েগুলো বিয়ে করতে না পেরে শুকিয়ে মরছে, এম এ পাশ মেয়েগুলো রিয়াদের ঝাড়ুদার বিয়ে করছে, কিন্তু তিনি অবিবাহিত মেয়ে বিয়ে করতে চান না, বিধবা বিয়েও করতে চান না, কারো বউ ভাগিয়ে বিয়ে করতে চান মনে হয়।'

আমি বলি, 'কারো বউ ভাগিয়ে বিয়ে করায় গৌরব আছে, আর তাতে দ্রুত পদ্ধতি হয়।'

তিনি বলেন, 'আমার একটি স্বামী আছে, একটি উপপত্তি আছে, আমি কেনো তাঁকে বিয়ে করতে যাবো। আমি আমার ধরনে সৎ থাকতে চাই।'

মাহমুদা রহমান তাঁর বাচ্চাদের ইস্কুল থেকে আসতে যাবেন, তাঁর শুধু প্রেম করলে চলে না, শুধু নিজের শরীরের কথা তাবলে চলে না। শরীরের ভেতর থেকে যাদের বের করেছেন তাদের কথাও ভাবতে হয়। আমার তাঁকে ভাবতে হয় না, ফিরোজা ভাবছে এসব। ফিরোজা যদি এখন নৃতাত্ত্বিকটির সাথে যাকে, সেও এখন উঠছে, তার পক্ষেও আর নৃত্ব চর্চা সম্ভব হচ্ছে না, শরীরের ভেতর থেকে যাকে বের করেছে তার কথা ভাবতে হচ্ছে। ফিরোজাও নিজের ভূজনে সৎ থাকছে; কিন্তু আমি কি সৎ থাকছি আমার নিজের ধরনে? সততা কাকে বলে আমি বুঝতে পারছি না, কারো প্রতি একনিষ্ঠ থাকাই কি সততা? দুজনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা সততা নয়? তিনজনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা সততা নয়? আমি বুঝি না। আমি বিজের দিকে বেরিয়ে যাই বিজ দেখি, মদী দেখি; বিকেলে অফিস শেষ হওয়ার একটু আগে অফিসে ফিরি, দেখি আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে, আমাকে দেবে সে আলোকিত হয়ে ওঠে। বেশি দিন হয় নি সে আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী হয়েছে, তালো করে দেখিও নি, আজ দেবে মনে হয় সে একটা ছোটোখাটো আগুন লাগাতে পারে, আমাকে ঘিরেও তা লাগাতে পারে। তার এ-জুলে ওঠার মধ্যেই আমি একটা বিপথে ছুটে যাওয়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই।

সে বলে, স্যার, যা উদ্বেগের মধ্যে ছিনাম: কোথায় গেলেন কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।'

মেয়েটি 'উদ্বেগ' উচ্চারণ করতে পারে, অর্থ বোঝে! তার কথা ওনে আমার বেশ ভালোই লাগে, তার কঠিনের একটা কবুতরের ওড়ার আর পাখা ঝাপটানোর শব্দ আছে,

আমার ভালো লাগে, তবে আমার জন্যে উদ্বেগবোধের অধিকার তাকে এতে তাড়াতাড়ি কী করে দিই।

আমি বলি, 'উদ্বেগবোধ কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? আমাকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকার জন্যে সম্ভবত আপনাকে নিয়োগ করা হয় নি।'

মেয়েটি নিষ্প্রত হয়ে যায়, মাথা নিচু করে থাকে; বলে, 'আমার তুল হয়ে গেছে, স্যার।'

আমার আবার ভালো লাগে, অনেক দিন ধরে আমার সাথে কেউ বিনয়ের সাথে কথা বলে নি, তোষামোদের ভঙ্গিতে অনেকেই বলে, আমি মেয়েটির কষ্টস্বরে একটা ভীত দোয়েলের গলা শুনতে পাই, ডালিমগাছের ডাল থেকে এইমাত্র একটা দোয়েল উড়ে গেলো। কিন্তু মেয়েটিকে এতেটা অপ্রস্তুত করে দেয়া ঠিক হয় নি, রাতে হয়তো ঘুমোতে পারবে না; বিবাহিত হলে বা বয়ক্রেড থাকলে আজ কিছু করতে পারবে না। আমার সম্পর্কে একটা ঝারাপ ধারণা হয়ে যাবে, কোনো দিন যদি আমাকে চুমোও থায় তাহলেও এটা তার ওপর ছায়া ফেলবে। ঠিক আছে ছায়া ফেলুক, আমি না হয় কারো কারো ঠোটের ওপর বাহুর ছায়াই হয়ে থাকবো।

আমি তাকে বলি, 'ঠিক আছে, তো উদ্বেগের কারণ নেই আপনার, আমি এসে গেছি, অফিসও ছুটি হয়ে গেছে, আপনি বাড়ি যান।'

মেয়েটি বেরিয়ে যায়, তার বেরিয়ে যাওয়া দেখতে আমার ভালো লাগে।

অর্চির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তয় লাগছে; অর্চি কি খুশি হবে আমার ফোন থেকে?

অর্চি হয়তো আমার গলা চেনে না, কেননে ওর সাথে কথাই হয় না, আমার গলা ও নাও চিনতে পারে।

'অর্চি', আমি বলি, 'অর্চি, আমি আকুৰু।'

অর্চি বলে, 'আকুৰু? তুমি কি সময়?' গভীর হতাশা আৱ বিৰক্তিৰ স্বর তেসে আসতে থাকে মহাজগতের দশ দিক থেকে।

'তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করলো', আমি বলি, 'অনেক দিন কথা বলি নি।'

অর্চি বলে, আহ, আকুৰু, তোমার সাথে কথা বলার মতো সময় আমার আছে, বলো! আমি ভাবলাম কোনো বক্স ফোন করেছে।'

আমি বলি, 'তুমি কী নিয়ে এতো ব্যস্ত অর্চি?'

অর্চি বলে, 'তুমি বুঝবে না আকুৰু, আৱ আমার অকাজে কথাই বলতে ইচ্ছে করে না, আমার ঘেন্না লাগে।'

আমি বলি, বক্সদের সাথে তুমি কি শুধু কাজের কথাই বলো?'

অর্চি বলে, 'কাজের কথাই বলি, আমি প্ৰেমট্ৰেমেৰ কথা বলি না আকুৰু, আমোৱা কয়েক বক্স স্টেটসে চলে যাবো, নানা জায়গায় চিঠি লিখছি সে-কথাই বলি।'

আমি বলি, 'আমাকে তো কখনো বলো নি।'

অর্চি বলে, 'বলার কিছুই নেই, যখন যাবো তখন বলবো তেবেছিলাম, তবে আজ তোমাকে বলে ফেললাম।'

আমি বলি, ফেইভৱেবল চিঠিপত্ৰ কি পাচ্ছো?'

অর্চি বলে, 'বেশ তো পাছি শুধু মাধ্যমিকটার জন্যেই কিছু করতে পারছি না; পরীক্ষাটা হয়ে গেলে বাঁচি।'

আমি বলি, 'তুমি তাহলে চলে যাবে?'

অর্চি বলে, আবু, তুমি এখনি কাদতে শুরু কোরো না। আমি আজই যাচ্ছি না।'

আমি কথা বলতে চাই, অর্চি বলে, 'রাখি, আবু, রাখি।' অর্চি টেলিফোন রেখে দেয়।

আমি একটা শূন্যতা বোধ করি। এমন নয় অর্চিকে আমি প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে ধরি, আদর করে কপালে চুমো থাই, ঘুম পাড়াই; এমন নয় ও আমার কন্যা বলে আমি একটা শুরুগঠনীর পিতৃত্বের বোধের মধ্যে থাকি, আমি যে ওর পিতা আমার মনেই থাকে না, কিন্তু ও হয়তো আমার ভেতরে কোথাও রয়েছে, আর থাকবে না। আমি ওর ভেতরে নেই, ফিরোজাও ওর ভেতরে নেই কেউ ওর ভেতরে নেই। অর্চি কেন্দ্রে আছে আরো কেন্দ্রে চলে যেতে চায়, চলে যাবে; আমি বাধা দিতে পারবো না। কিন্তু আমার শূন্যতা আমাকে বইতে হবে, কেউ জানবে না আমি পাথরে থেকেও তারী একটি শূন্যতা বয়ে চলছি।

ফিরোজা বেশ চাকচল্যের মধ্যে আছে, এতো চাকচল্যে আছে যে আমার সাথেও সারাক্ষণ কথা বলতে চায়, এমন সব কথা সোজেই কথনো বলে নি, কিন্তু এখন বলার জন্যে ব্যগ্র। কোথা থেকে উৎসারিত হচ্ছে ফিরোজার ঝরনাধারা? আমি তার উৎস নই, আমি তাকে বিরহিত কলকল করে রাখাই না, আমি তাকে বাতাসে পালকের মতো ওড়াচ্ছি না, কিন্তু ফিরোজা বইত্বে উভয়ই।

আমি টিভির দিকে তাকিয়ে আছি, প্রাণভৰে একগাদা ন্যাংটো মেয়ে দেখছি, কতোটা ন্যাংটো হ'তে পারে সেখানে, শিল্পকলা কতোটা ন্যাংটো হ'তে পারে দেখছি, ন্যাংটো কতোটা শিল্পকলা হ'তে পারে দেখছি; ন্যাংটো, শিল্পকলা, মেয়ে দেখছি; শিল্পকলা, মেয়ে ন্যাংটো দেখছি; মেয়ে, ন্যাংটো, শিল্পকলা, দেখছি, আমি দেখছি ন্যাংটো ন্যাংটো, আমি দেখছি শিল্পকলা শিল্পকলা শিল্পকলা। আমি দেখছি মেয়ে মেয়ে মেয়ে ; ফিরোজা তখন এসে পাশে বসে।

'এসব দেখতেই তোমার ভালো লাগে', ফিরোজা বলে। আমাকে একটা বড়ো অপবাদ দেয়ার জন্যে কথাটি বলে নি, আমি বুঝি, একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বেছে নিয়েই সে কথা শুরু করতে চেয়েছে।

'আমার সময় চায় আমি এসব দেখি', আমি বলি, 'আমার সময় চায় আমি এসবের মর্য উপলব্ধি করি, আমি আমার সময়ের দাবি পূরণ করছি।'

ফিরোজা বিব্রত হয়, এসব নিয়ে আর তর্ক করতে চায় না; এক্সএক্সএক্স সেও উপভোগ করে মাঝেমাঝে, এখন সে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে চায়।

'সেদিন তুমি অভ্যন্ত আচরণ করেছো', ফিরোজা অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে বলে, 'আমার মনে হচ্ছিলো তুমি।' ফিরোজা আর এগোয় না।

আমি বলি, 'তোমার কী মনে হচ্ছিলো?'

ফিরোজা বলে, তুমি আমাকে রেইপ করছো।'

আমি বলি, 'তাহলে তোমার উচিত ছিলো চিংকার করে গঠা, যাতে পাশের বাড়ির সবাই জেগে উঠে তোমাকে রক্ষা করতে আসতে পারতো, তোমার কর্তব্য ছিলো আমার মুখে নথ বসিয়ে দেয়া; প্রমাণ থাকতো।'

ফিরোজা বলে, 'কিন্তু তুমি আমাকে পীড়ন করতে চেয়েছিলে তাতে সন্দেহ নেই।'

আমি বলি, 'কিন্তু তুমি পীড়ন উপভোগ করলে কেনো?'

ফিরোজা বলে, 'মনে হলো প্রতিরোধ করতে যেহেতু পারবো না তখন উপভোগ করাই ভালো।'

আমি বলি, 'সত্যিই কি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে পীড়ন করতে চেয়েছিলাম?'

ফিরোজা বলে, 'হ্যাঁ, আমি আজো ঠিকমতো হাঁটতে পারি না।'

আমি বলি, 'আমি দৃশ্যবিত, সচেতনভাবে আমি অমন কিছু করতে চাই নি।'

ফিরোজা বলে, 'তাহলে অসচেতনভাবে করতে চেয়েছিলেন।'

আমি বলি, 'হয়তো তা হবে, তার জন্যেও আমি দৃশ্যবিত।'

ফিরোজা বলে, 'আমার তয় হয় অসচেতনভাবে কিছু কোনো দিন আমাকে কিছু একটা করে ফেলতে পারো।'

আমি বলি, 'তুমি কি খুন বোঝাচ্ছো?'

ফিরোজা বলে, 'হ্যাঁ, ও রকমই কিছু থাক্টা।'

আমি বলি, 'আমি কি এতোটা করতে মানুষ?'

ফিরোজা বলে, 'আমার মনে হয় এরপর সাবধান হতে হবে, খুন না করলেও আমাকে তুমি বিকলাঙ্গ করে দিব্বত পারো।'

আমি বলি, 'তুমি কি এর বিকলাঙ্গ বোধ করছো?'

ফিরোজা কোনো কথা বলে না, হয়তো সে সত্যিই বিকলাঙ্গ বোধ করছে; আমি তার কোনো খবর নিই নি, দরকার পড়ে নি, ফিরোজার হয়তো দরকার পড়েছে।

ফিরোজা কি তার অঙ্গ ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে এর মাঝে, এবং ব্যর্থ হয়েছে? বিকলাঙ্গতার জন্যে কি তার দুটি তিনটি লাল লাল বিকেল অপচয় হয়ে গেছে, যার চমৎকার ব্যবহার তারা চেয়েছিলো? নৃতাত্ত্বিকটিকে মনে পড়ে আমার। আমি কিছুটা তাপ বোধ করি।

আমি বলি, 'তুমি কি পরব্রহ্ম করে দেখেছো কোথাও?'

ফিরোজা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'সবাইকে নিজের মতো মনে কোরো না।'

ফিরোজা এখন নিজেকে দেবী আর আমাকে পিশাচ ভাবছে; শুধু ভাবছে না নিজেকে দেবীর সিংহাসনে বসাচ্ছে, আমাকে নামিয়ে দিচ্ছে পিশাচপাতানে; সে আমার মতো নয়, সে পবিত্র, তার শরীর পবিত্র, আমিই শুধু অপবিত্র, পিশাচের শরীর আমার। আমি কি বলবো যে ধানমন্ডির আটনশৰ সড়কে সেদিন সন্ধ্যায় তাকে আমি দেখেছি, একটা পাঁচতলা বাড়ির দরোজা দিয়ে তার গাড়ি বেরিয়ে এলো, আমি দেখলাম? বলবো কি আমি গাড়ির পেছনে ছুটতে পারতাম, কিন্তু আমি ছুটি নি? বলতে আমার ভালো

লাগে না, কিন্তু ফিরোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমি নিশ্চুপ হয়ে গেছি, আমি পরাজিত হয়ে গেছি তার দেবীত্বের কাছে, সে তা উপভোগ করছে। কিন্তু দেবীটেবী দেখতে আমার ভালো লাগছে না।

'তুমি মাঝেমাঝে ধানমণির আটলম্বর সড়কের একটি পাঁচতলা বাড়িতে যাও?'
আমি বলি।

ফিরোজা চমকে ওঠে, কোনো কথা বলে না।

আমি বলি, কোনো কথা বলছো না যে?

ফিরোজা বলে 'যাই কিন্তু আমি তোমার মতো নই; কাউকে দেহ দিতে আমি সেখানে যাই না।'

আমি বলি, 'আমার মতো তুমি নও, তা জানি; আর তুমি সেখানে কাউকে দেহ দিতে যেতে না পারো, তবে কেউ তো তোমাকে দেহ দিতে পারে।'

ফিরোজা কোনো কথা বলে না। ফিরোজা আমার থেকে শুন্দ, সব সময়ই; সে দেহ দেয় না, দেহকে সে অপূর্ব বীতিতে শুন্দ রাখে, পুরুষের সন্তুত্য তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে; দেহ দিলেও সে অশুন্দ হবে না, দেহ সামান্য ক্ষেত্র, অসামান্য হচ্ছে মন হৃদয় আঝা, সেগুলো সে দেবে না, পবিত্র রাখবে, আমার সে-সক্ষি নেই, আমি পারি শুধু অশুন্দ হতে। এ-মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একটি স্পন্দন হয়ে যেতে পারতো, ওসব আমার ভালো লাগে না; আমি ফিরোজার দেহ নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, দেহে আমি পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই দেখি না, দেহ হচ্ছে দেন্ত, যা বিষাক্ত হতে পারে, মধুর হতে পারে, কঠিন হতে পারে, গলতে পারে। দেহ আমার চোখে সুন্দর আকর্ষণীয় বস্তু, যদিও এখন ঘেন্নার বোধ জাগাচ্ছে আমার, ক্ষেত্র দেহের থেকে সুন্দর কিছু আমি দেখি নি। এ-দেহ শুধু মানুষের নয়, সব কিছুরই ক্ষেত্রের দেহের দিকে আমি সারা সকালবেলা তাকিয়ে থাকতে পারি, যেমন পারি ইত্তুরহানার দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে, ছেলেবেলায় আমি আমাদের শাদা গাড়ীটির দেহের দিকে মুক্ষ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম, ঘুরতে ঘুরতে যে-ষাঢ়টি আমাদের গোয়ালের পাশে এসে হাঁক দিতো, তার দেহের সৌন্দর্য তো অবগন্নীয়। আমার যদি অমন একটি দেহ থাকতো, অমন অও অমন অজগর। মানুষের শরীর আমার চোখে সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর নারীশরীর। আমি ওই সৌন্দর্যে বারবার মুক্ষ হয়েছি, চিরকাল মুক্ষ হবো; ওই শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি সৌন্দর্য বুঝেছি; ওই শরীর ছোয়ার সাথে সাথেই আমি ভালোবাসতে পেরেছি, চিরকাল পারবো; ওই অপূর্ব বস্তুকে ভালোবাসার জন্যে কোনো পূর্বভালোবাসার দরকার আমার কখনো পড়ে নি। আমি যাকে ঘেন্না করি, তার দেহকেও তীব্রভাবে ভালোবাসতে পারি; যেমন ফিরোজাকে আমার ঘেন্না লাগছে, কিন্তু তার দেহকে ঘেন্না লাগছে না; যদি ওই দেহের সাথে আজ রাতে আমি জড়িয়ে পড়ি, পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে আমি তার প্রতিটি খণ্ডকে ভালোবাসতে পারবো। শরীরই আমার কাছে স্বর্গ আর নরক, আমি অবশ্য স্বর্গের বিশ্বাস করি না; তবে শরীর আমাকে স্বর্গের অভিজ্ঞতা দিয়েছে, নরকের অভিজ্ঞতা দিয়েছে; শরীর আমাকে বেঁচে থাকার অমৃত দিয়েছে মৃত্যুর বিষও পান করিয়েছে। আর আমি শরীরের সীমাবদ্ধতায় সব সময়ই পৌঁছিত বোধ করেছি; আমি যতোটা উপলক্ষ

করতে চাই, আমি দেবেছি আমার শরীরের, আমার ইন্দ্রিয়গুলোর সে-শক্তি নেই; আমার শরীর আমার ইন্দ্রিয়গুলো বুবই সীমাবদ্ধ। আমার ওষ্ঠ একটি নির্দিষ্ট সীমার পর আর কাজ করে না, আর অনুভব করে না; আমি যখন ওষ্ঠ দিয়ে চরমতমকে উপলক্ষ্য করতে চাই, তখন ওষ্ঠ নির্বোধ তুকমাংসের সমষ্টি থেকে যায়; আমি যখন গভীর থেকে গভীরতমে পৌছে ভেঙে যেতে চাই ফেটে পড়তে চাই পরমতমকে ছুঁতে চাই, তখন আমি সীমাবদ্ধ একটি মাংসের ফলক রয়ে যাই। শরীর শরীর চায়, এবং একটি শরীর শুধু আরেকটি শরীর নিয়েই চিরকাল সজীব থাকতে পারে না, তার সীমাবদ্ধতা আরো বাড়াতে থাকে; ওই অবস্থায় মরে যেতে থাকে, আর বেঁচে থাকার জন্যে তিনি শরীরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফিরোজা তিনি শরীর চায়, যদিও সে স্বীকার করছে না; আমার শরীরের থেকে নৃতাত্ত্বিকটি শরীর তার শরীরকে বেশি আলোড়িত করছে এখন; যেমন ফিরোজার শরীরের থেকে দেবীর আর মাহমুদা রহমানের শরীর আমার শরীরকে বেশি আলোড়িত করে। শরীর পুরোনো হয়ে যায়, তা নতুন হয়ে উঠতে পারে নতুন শরীরের স্পর্শে; তা আমার ফিরোজার মাহমুদার দেবীর ও অন্য সবার জন্যেই সত্য, কারো জন্যেই মিথ্যে নয়। সমাজ চায় শরীর পুরোনো হয়ে যাবে, তার সজীবতা লুণ্ঠ হয়ে যাক, কিন্তু শরীর তা চায় না।

কয়েক দিন ধরে ভোরে ঘুম ভাঙ্গে আমার জ্বর হওয়ার অনেক আগেই চোখের ওপর একটা স্বপ্নের মতো কী যেনো টের পাইছি, বুব হাঙ্কা লাগছে, অনেকক্ষণ ধরে একটি সুখের মধ্যে পড়ে থাকছি। পাশের পরিচানায় ফিরোজার কেমন লাগছে, আমি জানি না; সেও তার বিভোরতার মধ্যে থাকতে পারে, সেটা তার ব্যক্তিগত; আমার ব্যক্তিগত বোধ এক হাঙ্কা আচ্ছাতালি রওশনের সাথে প্রথম দেবী হওয়ার সময় এমন হয়েছিলো, এখন তেমনি হচ্ছে যখেমাঝে মনে রাখতে পারছি না আমি কোথায় শয়ে আছি, ঢাকা শহরে না গ্রামে আমার বয়স কতো, পনেরো না পঁয়তাল্লিশ, আমি মনে রাখতে পারছি না; বেশ কিছুটা সময় ভাবার পর আমি আমার বাস্তবতা স্থির করতে পারছি। হয়তো শরীরের বয়স বাড়ে, মনের বয়স বাড়ে না, অন্তত ভোরগুলোতে আমার তা-ই মনে হচ্ছে। বেশ একটা তার আমি বোধ করছিলাম কয়েক মাস ধরে, ওই ভারটা কেটে গেছে; ফিরোজার সাথে আমার ভারী সম্পর্কটির কথাও মনে থাকছে না। আমি আরো সজীব হয়ে উঠছি, নতুন মাটিতে একটি নতুন কলাগাছের চারা মনে হচ্ছে নিজেকে। আমি এতো দিন বুঝতে পারি নি যে আমি বয়স্কদের দলে পড়ে গেছি, আমি যাদের সাথে জীবন যাপন করছি, ঘূমোচ্ছি, তাদের চমৎকার শরীর আর মুখ্যবয়ব থাকলেও তারা বয়স্ক; তাদের জগত তিনি তরুণ জগত থেকে। আমার গাড়ির সামনেই ঘটনাটি ঘটে, তরুণীটির রিকশা উল্টে পড়ে বেবিট্যাক্সির ধাক্কায়; তরুণটি নিচে পড়ে যায়, তার ভাগ্য ভালো পেছনের গাড়িগুলো থামে, কিন্তু কেউ তাকে টেনে তোলার সাহস করে না; মৃত্যুর থেকে নৈতিকতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে সম্ভবত মনে হয় তাদের। আমি লাক্ষিয়ে নামি গাড়ি থেকে, রিকশা সরিয়ে তরুণীটিকে দু-হাতে জড়িয়ে দাঁড়া করাই; একটু ভয় ছিলো আমার স্পর্শে তার সতীত্ব ছিড়ে যাওয়ার তয়ে সে ক্ষেপে উঠতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেপে না, ভয় পেয়ে আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে;

আমি তার শক্ত জড়ানোর কোমলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই, সে হাসপাতালে যেতে চায় না; তার বেশি কিছু হয় নি, সে বাড়ি যেতে চায়। গাড়িতে উঠে সে আমার থেকে একটু দূরে সরে বসে, কিন্তু আমার মনে হতে থাকে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। তাকে আমার ভালো লাগে;— সে সুন্দর সজীব, তরুণ, সপ্রতিভ; এবং তেতরে তার একটি সুন্দর শরীর রয়েছে।

‘আমার নাম অনন্যা, অনন্যা আহমেদ’, সে বলে, ‘আপনাকে কি আমি ধন্যবাদ জানাবো?—আমি বুঝতে পারছি না।’

আমি বলি, ‘না, না, এখন ধন্যবাদের দরকার নেই; পরে কখনো জানাবেন।’

সে পঁচিশ ছাবিশ বছরের একজোড়া চোর মেলে বলে, অস্তুত লাগছে আপনার কথা, অস্তুত লাগছে আমার।’

আমি বলি, ‘আপনি এখন ধন্যবাদ চাচ্ছেন না, কিন্তু পরে কখনো চাচ্ছেন।’

আমি বলি, ‘সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরই ধন্যবাদ জানানো ভালো।’

সে বলে, ‘কিন্তু আপনার সাথে আর নাও তো দেখা হতে পারে।’

আমি বলি, ‘হবে।’

সে বলে, ‘আপনি এতো নিশ্চিত কেনো?’

আমি বলি, ‘আমি কখনো কখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি।’

আমার এভাবে কথা বলা উচিত হয় নি; আমি বয়স্ক মানুষ, পৈয়তাত্ত্বিকের কাছাকাছি এসে গেছি, তার আরো আমর ট্যারিচয় পেলে হয়তো সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়াতো, আঠারো বছর বয়সে যদি এমটি সংসার শুরু করতাম তরুণী আমার কন্যাও হতে পারতো, আমার এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি। তাকে নামিয়ে দিয়ে এসে আমার বারবার মনে হতে থাকে আমি এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি; নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখানো উচিত ছিলো আমার, এমনভাবে কথা বলা উচিত ছিলো যাতে গাড়ি থেকে নামার সময় সে আমাকে পা ছাঁয়ে সালাম করতো। আমি কেনো গল্পীর হতে পারি নি, কেনো আমি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারি নি? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছিলো ওই তরুণীর সহপাঠী হওয়ার? আমি তাকে আমার কার্ড দেয়ার পর সে প্রায় কোলাহলের মতো ঝলমল করে উঠেছিলো, বলছিলো সে বুঝতে পারছে না আমি কতো বড়ো, সব দিকেই, যদিও আমাকে দেবে তার অমন বড়ো কিছু মনে হয় নি। অনেক দিন পর আমি কোনো তরুণের পাশে অর্থাৎ তরুণীর পাশে বসেছি বলেই কি আমার অমন হয়েছে? কার পাশে বসছি, তার একটা চাপ পড়ে আমাদের ওপর; কয়েক বছর আগে আমি একটি বুড়োর সাথে বসে ব্রিজের পর ব্রিজ পরিকল্পনা করেছি, এক দিন আমি টের পাই বুড়োটি ব্রিজের থেকে বেশি পছন্দ করে আমার সঙ্গ, আমার সঙ্গ তাকে শীত থেকে তুলে আনে, সে আমার তাপ শোষণ করে, তখন আমি তার সঙ্গ ছেড়ে দিই। বুড়োটি তারপর আর বেশি দিন বাঁচে নি। না, আমি তরুণীর শরীরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি নি, ওই মুহূর্তেই আমার মনে তার শরীর তোগের কোনো পরিকল্পনা জেগে ওঠে নি; বরং উল্টোটিই ঘটে, ওই প্রথমে আমি কোনো নারীর পাশে বসি, কিন্তু আমার তেতর কেনো ক্ষুধা দেখা দেয় না। অনন্যাকে কি আমি নারী মনে করি নি, অবচেতনায় তাকে কি

আমি অচিহ্ন মনে করেছি, মনে করেছি সে আমার কল্যাই? তাও মনে হয় না, কোনো সম্পর্ককেই আমি জৈবিক আত্মীয়তার সম্পর্কে দেখতে পছন্দ করি না, এবং দেখি না; আমার কোনো কোনো বন্ধু একেকটি বিজ বানিয়ে বলেন এটা তাঁর সন্তান, খুব সুব পান বিজকে সন্তান মনে করে, তাঁর ওরস কোনো বিশাল নারীর গর্ভে জন্ম দিয়েছে এ-সন্তান, যদিও বিজ আমাকে মনে করিয়ে দেয় আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা শিশু ও যৌনিকে, যাদের কখনো যিনি ঘটবে না; জৈবিকভাবে তাঁরা জড়িয়ে পড়েন তাঁদের সৃষ্টি বস্তুর সাথে, আমি তা করি না। জৈবিক সম্পর্ক থেকে আমি অনেক দূরে সরে গেছি, বংশানুকূল আমার কাছে মূল্যবান নয়। আমি ওই তরুণীকে নারীই মনে করেছি কল্যানে করি নি, তবে তার দেহ আমার মাঝে কোনো তোগপিপাসা জাগায় নি, যদিও তা কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারপর মনে হতে থাকে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ হতে চাই নি অনন্যার কাছে, নিজেকে গুরুগল্পীর আর ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেখাতে চাই নি দেশের একটি বড়ো নির্মাণ লিমিটেডের, তালোই করেছি; আমি চলিশোভরতার তার অনেকটা কমাতে পেরেছি, অনেকটা হাঙ্কা হয়ে গেছি। এজন্যেই আমার খুব ভোরে ঘুম ছাড়ে, ঘুম ভাঙ্গার সময় বুঝাতে পারছি না আমি কোথায় কোনো গ্রামে না শহরে কোথায়, বুঝাতে পারছি না আমি কে, কোনো কিশোর না যুবক না বৃক্ষ, এটা অঙ্গকে সুখ দিছে। পর দিনই অনন্যা টেলিফোন করেছে; এটা অন্য এক জগতের টেলিফোন, তার কঠিন ভিন্ন, অভিধান আর বাক্য ভিন্ন, যার সাথে খাপ খাওয়াতে আমার বেশ কষ্ট পেতে হচ্ছে। আমি বিস্মিত হয়েছি যে শুধু আমারই ক্ষেত্রে নি, আমার ভাষারও বয়স বেড়েছে, আমার মতো আমার ভাষারও বয়স বৃঞ্জাতে হবে, যদি আমি অন্য জগতের সাথে কথা বলতে চাই। আমি তাকে টেলিফোন করি নি, আমার সাহস হয় নি; বয়স হলে নানা রকম ভয় দেখা দেয়, আমারও তাই হয়েছে; কিন্তু কম বয়সের দারুণ দুঃসাহস রয়েছে, অনন্যা পরপর চারদিন ধরে টেলিফোন করছে, আমি অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছি। আমি আজকাল আটটার মধ্যে অফিসে পৌছে যাচ্ছি, আটটা দশের মধ্যেই তার টেলিফোন বেজে উঠেছে, পনেরো মিনিটের মতো কথা বলছি আমরা; এর মধ্যে সে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে গেছে, আমি শুধু একটি বৃত্তান্তই জেনেছি সে এক কলেজে এক বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছে। টেলিফোনে আমরা কী কথা বলতে পারি? অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা, ছেলেমেয়ের অসুখ, খুনজবৰ্ম, আধুনিক সাহিত্য, সমাজরাল সিনেমা ধর্মণ, ব্ল্যাক হোল, মেয়েমানুষের মন্ত্রীত্ব, পুরুষের পুস্তকতা? না কি কাতর কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা মেঘলা পানি পানি পচে-যাওয়া শবরি কলা ধরনের কথা? আমাদের দুজনেরই মনে হয় বিষণ্ণ হওয়ার, টেলিফোনে, সবচেয়ে তালো উপায় হচ্ছে লম্বু পরিহাসে ভেসে যাওয়া। আমি তার সমাজসংস্কার বংশ পিতামাতা সম্পর্কে কিছুই জানতে চাই নি, ওগুলোতে আমার কোনো আগ্রহ নেই; এবং আমি জানতে চাই নি সে বিবাহিত কিনা। এতে সে বিস্মিত হয়েছে; তার সাথে দেখা হওয়ার পরই নাকি লোকেরা তার যে-সংবাদটি জানতে চায়, যে-সংবাদটি না জানলে তাদের কিছুই জানা হয় না বলে মনে হয়, তা হচ্ছে সে বিবাহিত কিনা। আমি যে ইচ্ছে করে ওই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছি, এমন নয়, আমার

সব কিছু ভেড়ে পড়ে-৮

মনেই পড়ে নি; মানুষের যে একটি বিবাহগত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি থাকে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তা আমার মনে পড়ে নি।

একদিন অনন্যা হেসে বলে-বিষণ্ণ হওয়ার এটা তার প্রিয় পদ্ধতি, ‘আপনি কিন্তু আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জানতে চান নি, দেখা হ’লেই যা সবাই জানতে চায়।’

আমি বলি, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ? আমি বুঝতে পারছি না, সেটা কী?’

অনন্যা বলে, ‘আমার বিয়ে হয়েছে কি না? না হ’লে কেনো হচ্ছে না?’

আমি বলি, ‘এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ?’

অনন্যা বলে, ‘হ্যা, মেয়েদের সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।’

আমি বলি, ‘যে-পদাৰ্থবিজ্ঞান পড়ায় তার সম্পর্কেও এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ?’

অনন্যা বলে, ‘মেয়েদের বেলা পদাৰ্থবিজ্ঞানে আৱ গাৰ্হণ্য অধ্যনীতিতে কিছু আসে যায় না, আসে যায় বিবাহে ও অবিবাহে।’

আমি বলি, ‘তুমি কী উত্তর দাও?’

অনন্যা বলে, ‘আপনি কি আজই আমার উত্তুটি জনতে চান?’

আমি বলি, ‘যদি কোনো অসুবিধা না পাকে—

অনন্যা হাসে, এবং বলে, ‘আগে কন্তু আমি বিয়ে করবো না—বলা উচিত ছিলো বসবো না; তাতে ঝামেলা বেড়ে যেতে, কেনো বিয়ে করবো না অর্থাৎ বসবো না তা সবাইকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হত।’

আমি বলি, ‘এখন কী বলো?’

অনন্যা বলে, ‘এখন জাতি পাত্র পাচ্ছি না। আৱ অমনি নতুন ঝামেলা বেধে যায়, কেউ সেনাবাহিনী থেকে অ্যাজার, কেউ হাইকোর্ট থেকে বিপন্নীক বিচারপতি ব্যারিস্টার নিয়ে আসে; কলেজের আয়ারাও পাত্র নিয়ে আসতে থাকে, মধ্যপ্রাচ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান।’

আমি বলি, ‘চমৎকার পাত্র’, এবং একটু থেমে বলি, ‘উচ্চরক্ষচাপসম্পন্ন হৃদরোগসমূহ দু-একটি কি আমিও নিয়ে আসবো?’

অনন্যা বলে, ‘ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ;’ সে হাসে, আমি কান পেতে শুনি, এবং বলে, ‘ইউনিভার্সিটিতে আমার তিনচারটি বঙ্গ ছিলো, ওদের সাথে আমি কার্জন হলের ঘোপের পাশে বসতাম, ওৱা গৌজা খেতো, আমি পড়তাম।’

আমি বলি, ‘পড়তে কেনো, গৌজা খেতে পারতে।’

অনন্যা বলে, ‘আমি খেতে চাইতাম, ওৱা দিতো না। বলতো মেয়েমানুষের গৌজা খাওয়া ঠিক না। কলেক্টা পুরুষের। ওৱা প্রত্যেকেই মনে করতো একদিন আমি তাকে নিয়ে সংসার করবো, স্তৰী গৌজা খাবে এটা ওদের ভালো লাগতো না বোধ হয়।’

আমি বলি, ‘শতো হ’লেও তারা সমাজপতি পুরুষমানুষ।’

অনন্যা বলে, ‘পাশ করার পর ওৱা আমাকে বলতো তুই আমাদের কাউকে বিয়ে কর। আমি বলতাম তোদের চারজনকেই আমার বিয়ে করা উচিত, তোদের

চারজনকেই আমি বিয়ে করতে চাই। ওরা রেগে উঠতো। তখন আমি বলতাম আমি বিয়ে করবো না। ওরা চেপে ধরতো, ক্যান তুই বিয়া করবি না। আমার কেনো কথাই ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না। শেষে রেগে বলতো, তোর তো একটা দ্যাহ আছে, তুই দ্যাহের ক্ষুধা মিটাবি কেমনে? আমি বলতাম, কেনো, তোদের মতো ব্রোথেলে গিয়ে। ওরা চিল্লাপাল্লা তরু ক'রে দিতো।'

আমি হেসে বলি, 'তাহলে ব্রোথেলেই যাচ্ছা?'

অনন্যা হেসে বলে, 'একবার যেতে চেয়েছিলাম। যে-রিকশাজলা আমাকে নিয়ে যেতো আসতো, সে একদিন কই যাইবেন আফা বলতেই আমি বলি, বাদামতলির পাড়ায় যাবো, সেখানে চলো। রিকশাজলা আমার দিকে পাগলের মতো তাকায়, শেষে আমার পায়ে প'ড়ে বলে, এমন কথা কইবেন না আফা, আপনারে আমি পাড়ায় লইয়া যাইতে পারুম না। তাই আমার আর ব্রোথেলে যাওয়া হয় নি।'

আমি বলি, 'বড়ো দুঃখের কথা।'

অনন্যা হাসতে থাকে, আমি তার মুখ দেখতে পাই না। কিন্তু তার হাসি দেখতে পাই; অনেকক্ষণ ধ'রে আমি তার তরুণ হাসি শুনতে পাব। দেখতে থাকি, তার হাসির সুগন্ধ গ্রহণ করতে থাকি। যখন আমি অনন্যার সাথে টেলিফোনে কথা বলি তখন সিগারেট খাই না।

একদিন আটটা দশে টেলিফোন বাজে। আমি একটু উৎকৃষ্ট হই; ওই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী তাকে নিয়ে অন্তর্মান কক্ষে ঢেকে। আমি বিব্রত হ'তে পারতাম, হওয়ারই কথা ছিলো, কিন্তু আমি বিব্রত হই না আমি হঠাতে আলোর ঝলকানি বোধ করি, দাঁড়িয়ে অনন্যাকে অভ্যর্থনা করি। আমি কী ক'রে পারলাম? আমার সহকারিণী অবাক হয় মর্মান্তিকভাবে, একটি তরুণীকে আমি এমন অভ্যর্থনা করতে পারি, সে কখনো ভাবতে পারে নি; তাই সে সম্ভবত অনন্যাকে কোনো দেশের রাজকন্যা ব'লে মনে করতে থাকে, তার মাথায় একটা মুকুট খুঁজতে থাকে। সে কোনো মুকুট দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়, কিন্তু আমি মুকুট দেখতে পাই। আমার কক্ষে সাধারণত ঢেকে দর্প অর্থ শক্তি দাস, সৌন্দর্য আর কোমলতা ঢেকে না; এই প্রথম সৌন্দর্য কোমলতার স্যান্ডলের স্পর্শে আমার কক্ষ শিউরে ওঠে, তাঁতের শাড়ির শোভায় বদলে যেতে থাকে। আমার চেয়ারটিতে আমার বসতে ইচ্ছ করে না, ওটাকে কোনো হাবশি বাদশার সিংহাসন ব'লে মনে হয়, ওটিতে আমি অস্বীকৃতি বোধ করতে থাকি; মনে হ'তে থাক চেয়ারকার্পেটের জগত থেকে অনেক দূরে কোনো ঘাস বড় কাশবন ফড়িঙ্গের জগতে যেতে পারলে আমি স্বত্ত্বিতে বসতে পারতাম। সে সুন্দর, সেটা সুন্দরীর থকথকে সৌন্দর্য নয়, তার সৌন্দর্য চারপাশের কদর্ঘতার উন্নাসকে শান্ত ক'রে আনে, তাকে দেখার পর সব ধরনের বাড়াবাড়িকে মনে হয় হাস্যকর। আমার কেনো যেনো নির্মলতা নিষ্পাপত্তা ব্যাপারগুলো মনে পড়ে, যদিও আমি ঠিক নির্মলতা নিষ্পাপত্তায় বিশ্বাস করি না, ওগুলোকে ভাবালুতাই মনে করি, তবু আমার ওগুলোর কথাই মনে পড়ে। এখন আর কারো ছোয়ায় মৃত প্রাণ ফিরে পায় না, কুঠরোগী সেবে ওঠে না; কিন্তু আমার মনে হ'তে থাকে সে যদি এখন কোনো মৃতকে ছোয়, তবে মৃত

প্রাণ ফিরে পাবে; যদি কোনো কৃষ্ণরোগীর দিকে তাকায়, তবে ওই অভিশণ্ড দেবদূতের মতো কান্তিমান হয়ে উঠবে। আমিও তার করণা লাউ করি, আমার বয়স ক'ব্যে যেতে থাকে ওই প্রায়-অপার্থিব উপস্থিতিতে; অপার্থিব বলছি এজন্যে যে তার উপস্থিতি আমার ভেতরে কোনো কামবোধ সৃষ্টি করে না, যদিও অমন কোনো বোধের উল্লেষ ঘটা বেশ স্বাভাবিক ছিলো; যেমন আমার ব্যক্তিগত সহকারিণী তরুণীটি বেশ চমৎকার তরুণী, কোনো বাড়াবাড়ি করে না, কিন্তু সে যতোবারই আমার কক্ষে ঢোকে, আমি তার দিকে না তাকালেও লঘু একটা কাম বোধ করি।

অনন্যা বলে, 'আপনি এতো উচ্ছুতে থাকেন, মাটি ঘাস নদী থেকে এতো উপরে।'

আমি হেসে বলি, 'পারলে আমি যেমনে থাকতাম।'

অনন্যা বলে, 'কিন্তু সাততলায় উঠতেই আমার মাথা ঘোরাচ্ছে, লিফ্ট আমি ভীষণ ভয় পাই, যেমনে থাকলে আপনার সাথে আর দেখা হতো না।'

আমি বলি, 'তখন তোমার দুটি ডানা থাকতো, কোনো কষ্ট হতো না।' ডানার কথায় সে বেশ প্রফুল্ল বোধ করে, এবং আমি আরো বলি, 'মনে কি সতেরো তলায় থাকার একটি সন্তান্য উপকারিতা আছে।'

সে জানতে চায়, 'উপকারিতাটি কী?'

আমি বলি, 'প্রয়োজনের মুহূর্তে লাফিয়ে প্রক্রিয়াজ্ঞত সমাধানে পৌছা যায়।'

সে ভয় পায়, আতকে উঠে বলে, 'স্মারণের লাফিয়ে পড়ার প্রবণতা আছে না কি?'

আমি বলি, 'কতোবার আমি লাফিয়ে পড়েছি।'

সে ভয় পায়, আর আমি তার ক্ষেত্রে বিশ্বায় ছড়ানো দেখতে পাই; এতো বিশ্বিত হয়েছে যে ভয় পেয়ে যাচ্ছে, যেনো এই সব আসবাবপত্র টেলিফোনদঙ্গল শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র পিলিভিজন চিসি তাকে গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছে।

অনন্যা বলে, 'আমার ভয় লাগছে।'

আমি জানতে চাই, 'কেনো?'

অনন্যা বলে, 'আমি কখনো এতো কিছু দেখি নি, এতো বাকমকে কিছু দেখি নি। আমি একা হলে ভয়ে চিন্তার করে উঠতাম। আপনি ভয় পান না?'

আমি বলি, 'এগুলো না থাকলেই আমি ভয় পেতাম, এগুলোই আমাকে সাহস দেয়, বারবার বলে ভয় পেয়ে না তোমার পেছনে আমরা সবাই আছি।'

অনন্যা বলে, 'কিন্তু আপনার এখানে যে আমার আর আসার সাহস হবে না, এসবের কথা মনে হলেই আমার মাথা ঘোরাবে। আপনাকে আমি আর দেখতে পাবো না।'

আমি বলি, 'কিন্তু এসব পদাৰ্থকে আমি ভয় পাই। আমার বোধ হয় উচিত ছিলো আমে খালের পারে একটি কুঁড়েঘরে থাকা, মরিচ আৱ লাউ বোনা, একটি ছাগল পোষা।' অনন্যা নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

কোনো নারীর মুখোমুখি হলে আমি প্রথমেই একটি জরিপ করে নিই, ব্রিজ তৈরি করতে হলে যেমন জরিপ করি, কয়েক মুহূর্তেই তার অবয়ব সম্পর্কে আমার একটি

স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়। তার পাড় কেমন, মাটির অবস্থা কী, ভিত্তিকূপ তৈরিতে কতোটা বিপর্যয় দেখা দেবে, এমন একটা জরিপ কয়েক মুহূর্তেই আমার করা হয়ে যায়, যেমন অন্য পুরুষরাও করে; কিন্তু অনন্যার বেলায় তা হয় না, আমার মন কোনো জরিপ করতে রাজি হয় না। তার কোনো দেহ আছে, দেহের সংস্থান অন্য নারীদের মতোই, সে-সংস্থান থেকে একই রকমে মধু উৎসারিত হতে পারে, এটা তাবতে ঘেরা লাগে আমার। অনন্যা ওঠার জন্যে প্রস্তুত হয়। আমি তাকে চাও দিতে পারি নি; কী খাবে তাও জিজ্ঞেস করতে পারি নি। তবে আমার ব্যক্তিগত সহকারীর দক্ষতা অসীম, সে কোনো কিছুই বাদ রাখে নি, পাঁচতারা থেকে বাছাই করে সে সব নিয়ে এসেছে-তাকে একটি প্রোমোশন দেয়া উচিত ছিলো; কিন্তু অনন্যা কিছুই ছুঁতে চায় না। মধু এক টুকরো চকোলেট কেক আর লাল চা। আমি তাকে নিচে নায়িয়ে দিয়ে আসি, লিফ্ট সে তয় পায়, তার মাথা ঘোরে; তবে লিফ্টে সে মাথা ঘুরে আমার ওপর পড়ে যায় নি, আমাকে বিব্রত করে নি। আমি তাকে পৌছে দেয়ার প্রস্তাব করতে পারি নি, সেটা বাড়াবাড়ি মনে হয় আমার; এমনকি পথ পর্যন্তও দিয়ে আস্তে পারি নি, সেটাও মনে হয় বাড়াবাড়ি।

ফিরোজা বোধ হয় বেশ এগিয়ে গেছে, নৃতাত্ত্বিক সাথে এক চাইনিজে তাকে দেখেছে আমার এক বক্সু, মোসলেম আলি, ফিরোজা এক অপ্রকাশিত অনুরাগী; আমাকে টেলিফোন না করে উত্তেজিত হয়ে আমার অফিসে এসেছে এক সংক্ষ্যা একরাত কষ্টে নিজের উত্তেজনা চেপে রেখে। তার প্রত্যেক মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো তার বউ ড্রাইভারের সাথে পালিয়ে গেছে, সে নায়িয়ে পড়তে পারে সাততলা থেকে। ফিরোজা তাকে চিনতে পারে নি, না চেন্স জান করেছে, এতে সে আরো বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এবং আমার জীবনে যে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এতে সে কাতর হয়ে পড়েছে। মোসলেম আলিকে আমি পছন্দ করি; সে আমার একনিষ্ঠ অনুরাগী নজরুল ছাত্রাবাসে ঢোকার পর থেকেই;- আমি যদি মহাপুরুষ হতাম তাকে পেতাম প্রথম বিশ্বাসীরূপেই;- সে আমার কাছে নিয়মিত স্বীকারোক্তি করে চলতো তার সমস্ত পাপের, যেনো আমি কোনো পুরোহিত, তাকে পাপমুক্ত করার জন্যে প্রার্থনার অধিকার আমার রয়েছে। সে একদিন এসে কাঁদতে থাকে আমার কাছে, বুব গোপনে; বারবার মাফ চাইতে থাকে। আমি তার কাছে জানতে চাই সে এমন কী অপরাধ করেছে, যে এতেটা ভেঙে পড়েছে, মাফ চাচ্ছে; সে পাপীর মতো জানায় সে আর সহ্য করতে পারে নি, মাসের পর মাস সহ্য করেছে, আত্মদমনের অনেক চেষ্টা করেছে, শয়তানটিকে পাজামার রশি দিয়ে বেঁধেও রেখেছে, আর পারে নি, শেষে আর্কিটেকচারের ওয়াজেদাকে ভাবতে ভাবতে বিছানায় তয়ে একটি কাজ করে ফেলেছে। তার পাপের শেষ নেই। তার দু-একদিন পরই মোসলেম আলি তবলিগে যোগ দিয়ে এক মাসের জন্যে টঙ্গি চলে যায়, এবং তিন মাসের মধ্যে মামাতো বোনকে শাদি করে এবং দশ মাসের মধ্যে প্রথম পুত্রটি পয়দা করে। ফিরোজার যে সে অপ্রকাশিত অনুরাগী, এটা সে কখনো আমাকে বলে নি, ফিরোজাই বলেছে আমাকে; আমি বুঝি ফিরোজাকে মনে রেখেও মাঝেমাঝে সে তার স্ত্রীর সাথে কাজটি করে। মোসলেম আলি আমার জন্যে

তয়াবহ সংবাদ নিয়ে এসেছে; সে নিশ্চিত আমার জীবনে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

‘ভাবী আমারে চিনতে পারল না’, মোসলেম আলি বলে, ‘তাইতেই আমি বুঝছি এইতে একটা কিন্তু আছে।’

‘তোমার কী মনে হয়?’ আমি বলি।

‘যা মনে হয়,’ মোসলেম আলি বলে, ‘তা আমি তোমার স্ত্রী আর আমার ভাবীর সম্পর্কে বলতে পারব না।’ মোসলেম আলি বিষর্ষ হয়ে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর বলে, ‘তোমাগো সংসার কি ভাল যাইতেছে না?’

আমি বলি, ‘তালোই তো যাচ্ছে, কোনো মারামারি নেই।’

মোসলেম আলি বলে, ‘আমার কথা শুন্যা আইজ মারামারি করবা না?’

আমি বলি, ‘না।’

মোসলেম আলি বলে, ‘এইর লিগাই মাইয়ালোকগুলি এমন হইয়া যাইতেছে। আমি হইলে আইজ বানাইতাম, পরপুরুষের লগে চাইনিজে যাওয়া দেখাইতাম।’

আমি বলি, ‘এতো উভেজিত হওয়ার কী আছে?’

মোসলেম আলি বলে, ‘তুমিও আবার পরের মাইয়ালোকের লগে যাও কি না কে জানে।’

মোসলেম আলি চলে যায়, আমি একটু বিষর্ষ ব্যাখ্য করি; আমার ইচ্ছে হয় অনন্যার কলেজের গেইটে গিয়ে দাঢ়িয়ে থাকি। আমি যদি একটি রিকশা নিয়ে ওর কলেজের গেইটে গিয়ে দাঢ়াই, অনেকক্ষণ দাঢ়াই, দাঢ়িয়ে এবং দাঢ়িয়ে থাকি, কলেজ থেকে বেরোতে গিয়ে অনন্যা যদি দেখে আমি দাঢ়িয়ে আছি সে কতোখানি চমকে উঠবে? কতোখানি বিহ্বল হবে? কলেজটা তব পাবে? আমাকে কি চিনতে পারবে? আমি কি কলেজের গেইটে গিয়ে দাঢ়াতে পারি? গাড়ি নিয়ে গেলে লোকজন ভাববে আমি আমার কন্যাকে নিতে এসেছি; কন্যাকে নেয়ার জন্যে কেউ কি এতো আগে গিয়ে গেইটে বসে থাকে? আমি কি সেখানে গিয়ে দাঢ়াতে পারি না? কিন্তু আমি বেরোবো কেমনে? অনেকগুলো শেকল খুলে আমাকে বেরোতে হবে; ব্যক্তিগত সহকারিগীর শেকল খুলতে হবে, তিনজন অধ্যক্ষনের শেকল খুলতে হবে, তা আমি খুলতে পারবো; কিন্তু ড্রাইভারের শেকল খুলবো কীভাবে? যদি আমি আমার গাড়িতে না উঠি, পথের দিকে হাঁটতে থাকি, প্রথম আমার ড্রাইভার পাগল হয়ে যাবে, সাথে তার আরো দশটি সঙ্গী পাগল হবে, ওরা সবাই মিলে আমাকে পাগল ঘনে করবে। ঘনে করবে আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছি; একটি মেয়ে যে আমার কাছে এসেছিলো এটা সম্ভবত এখন তাদের আলোচনার বিষয়, এবং তারই ফল ফলছে ঘনে করে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। নানা দিকে সংবাদ পৌছে যাবে, আমার বাসায়ও পৌছেবে। আমি এমন সংবাদের বিষয় হয়ে উঠতে পারি না। অনন্যার কলেজের গেইটে আমার যাওয়া হবে না, আমি এতোটা সাহসী হতে পারবো না। তখন মাহমুদা রহমানের ফোন বাজে;— অনেক দিন পর মাহমুদা রহমান, তিনি জিল্লার রহমান হয়ে গেছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁর ফোন উদ্ধারের মতো ঘনে হয়। আমি কি খুব শূন্যতার মধ্যে আছি, কোনো কৃক্ষণ গহ্বরে পড়ে গেছি? নইলে ওই ফোনকে উদ্ধার ঘনে হচ্ছে কেনো? কিন্তু না, উদ্ধার নয়, বরং

মাহমুদা রহমানই আমাকে অনুরোধ করছেন তাঁকে উদ্ধার করতে। আমি তাঁকে উদ্ধার করবো? তিনি কি আরো গভীর গর্তে পড়েছেন? এখনই তাঁর বাসায় যেতে হবে আমাকে; তাঁর কর্তৃত্বের পৃথিবীর সমস্ত হাহাকার, সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ঘৃণা।

মাহমুদা রহমানের বাসায় গিয়ে দেবি হাফিজুর রহমান ফিরেছেন আল মদিনা থেকে; তিনি আমাকে দেবে বসা থেকে উঠলেন না, আমি যে হাত তুললাম তার কোনো উন্নতির দিলেন না, একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। তিনি কি জেনে গেছেন তাঁর স্ত্রীর সাথে আমার একটা শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই ছুটে এসেছেন সৌন্দি থেকে? কিন্তু তাঁর মূখে কোনো ক্রোধ দেখছি না, আমাকে দেবে ফেটে পড়ার ভাব দেখছি না, এখনই যে উঠে স্ত্রীকে চুল ধরে টেনে আমার সাথে ঘরের বাইরে বের করে দেবেন, তাও মনে হচ্ছে না; বরং তাঁকেই মনে হচ্ছে অপরাধী, তিনি মাথা নিচু করে বসে থাকার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে কুশল জিজ্ঞেস করি, তিনি মাথা নিচু রেখেই উন্নতির দেন; আমার সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দেখান না। তাহলে উদ্ধার করতে হবে কাকে, মাহমুদা রহমান না হাফিজুর রহমান না আমাকে!

মাহমুদা রহমান চিৎকার করে বললেন, দেখুন এই লোচ্চো সৌন্দি থেকে কী করে এসেছে।

হাফিজুর রহমান সব সময়ই গভীর প্রকৌশলী তার তেতরটা মুখে প্রকাশ পায় না; মাহমুদা রহমানের অভিধায় তাঁর ভেতরে কী ঘটলো বুঝতে পারলাম না। মাহমুদা রহমান বারান্দা থেকে টেনে কলাপাতার ছান্তো একটি বালিকাকে আমার সামনে ছুড়ে দিলেন। বালিকা মেঝেতে পড়ে গেলো ভারপুর উঠে একপাশে বসলো, ঘোষটা দিতে চেষ্টা করলো, তার গাল থেকে একটি সারাঞ্চক খিলিক এসে আমার চোখে চুকলো।

আমি বললাম, ‘মেয়েটি কে?’

মাহমুদা রহমান বললেন, ‘কে আর, এই লোচ্চার দুই নম্বর বউ, আমার সত্তিন। লোচ্চাটাকে আমি জেলের ঢাত খাওয়াবো।’

আমি বলি ‘কখন বিয়ে করলেন?’

মাহমুদা রহমান বললেন, ‘বিয়ে এখনো করেন নি, করার পরের কাজটি করে এসেছেন, পেট বালিয়ে নিয়ে এসেছেন। এখন আমার কাজ দুজনকে সোহাগে নিয়ে বিয়ে পড়িয়ে আনা।’

আমি কিছু বুঝে উঠতে পারি না। সৌন্দিতে হাফিজুর রহমান কোথায় পেলেন এ-কলাপাতাটিকে? মাহমুদা রহমান চিৎকার করে ছিড়ে ছিড়ে সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করলেন, যা তিনি সারা সকাল ধরে উদ্ধার করেছেন হাফিজুর রহমানকে ছিড়েফেড়ে। হাফিজুর রহমানের মাস আটেক আগে একবার দেশে আসার কথা ছিলো, কিন্তু আসেন নি; তাঁর কাজ বেড়ে গিয়েছিলো, তাই তিনি তখনকার ছুটি নেন নি (মাহমুদা রহমানের তাতে কোনো আপত্তি হয় নি, বরং হাফিজুর রহমান আসেন নি বলে তিনি কতোটা আনন্দিত ছিলেন, তা আমি জানি)। তখন আরব মরাবুমিতে এ-কলাপাতাটি দেখা দেয়। কলাপাতাটির একটি ভাই হাফিজুর রহমানের অধীনে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করে, সে খুবই ভক্ত তার মনিবের। প্রভুর থাকতে থেকে খুব অসুবিধা হচ্ছিলো, একটি

কাজের মেয়ের খুব দরকার হচ্ছিলো; তাই ইলেক্ট্রিশিয়ানটি হাফিজুর রহমানকে একটি পরিচারিকা এনে দেয় দেশ থেকে। সে নিজের ছেটো বোনকেই নিয়ে যায়, হাফিজুর রহমানই সমস্ত ব্যয় বহন করে; এবং হাফিজুর রহমান কলাপাতাটিকে পেয়ে কাজ বাড়িয়ে দেন, দেশে আসার সময় পান না, চিঠি লেখা কমিয়ে দেন, টেলিফোন করা তো বন্ধই করে দেন। কলাপাতাটির বয়স কতো হবে? ঘোলো? হাফিজুর রহমান আট মাস ধরে বেহেল্তে ছিলেন, মরুভূমিতে তার জন্যে একটি কলাপাতা সবুজ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো, আমি বুঝতে পারি যখন আমি আরেকবার কলাপাতাটির দিকে তাকাই। কলাপাতাটি কালবিলম্ব না করে গর্তবতী হয়ে পড়ে-মরুভূমিতে হয়তো রাবার নেই, বা হাফিজুর রহমান জুতো পরে পুরুরে নামতে পছন্দ করেন না। এতো দিন চেপে ছিলেন, এখন তাকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছেন, হয়তো সেখানে কলমাও পরেছেন, এখানে শীকার করছেন না। তিনি কলাপাতাটিকে বিয়ে করবেন, মাহমুদা রহমানকে তিনি একথা জানিয়েছেন; এবং মাহমুদা রহমান তাকে জানিয়েছেন তিনি হাফিজুর রহমানের দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি দিবেন না, তাকে জেলে পাঠাবেন। আমি কীভাবে উদ্ধার করবো মাহমুদা রহমানকে?

হাফিজুর রহমান জানতে চাইলেন, ‘চাকায় না কি এমআর করার জন্যে এখন রাস্তায় রাস্তায় ক্লিনিক হয়েছে?’

আমি বলি, ‘আমি ঠিক জানি না।’

‘মাহমুদা রহমান বলেন, ‘রাস্তায় রাস্তায়, তাহলে নিজেই খুঁজে পাবে।’

এমআর কথাটি এই আমি প্রথম শ�্দ, এর পূরোটা কী তাও জানি না, তবে হাফিজুর রহমানের প্রশ্ন থেকে কাজটি বুঝতে পারি, উত্তরও দিই; হাফিজুর রহমান তাতে সুড়সের পরপারে কেবৈ ভালো দেখতে পান না। আমি কীভাবে উদ্ধার করবো এদের? আমাকে কি বালিকমাটিকে নিয়ে ক্লিনিকে ছুটতে হবে, একটা চমৎকার সহদয় তলপেটের ডাক্তার খুঁজে বের করতে হবে? গিয়ে যদি বলি আমার এক বন্ধু কাজটি করে ফেলেছেন, তাকে উদ্ধার করুন; ডাক্তার কি আমার দিকে তাকিয়ে সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ হাসিহাসবে না? কিছু উপদেশ দেবে না, শেলফ থেকে দু-চারখানি ধর্মগ্রন্থ (আজকাল না কি এগুলোই থাকে তাদের শেলফে) বের ক'রে প'ড়ে শোনাবে না? তারপর রারার ব্যবহারের উপকারিতা ব্যাখ্যা করবে না? আমার আর ভালো লাগছে না, আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমার বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কলাপাতাটির দিকে চোব পড়তেই আবার একটি বিলিক অনুভব করি, হাফিজুর রহমান একে হারাতে চাইবেন না; কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখন তিনি এটিকে হারাতে প্রস্তুত। আমি মেয়েটির মুখের দিকে আবার তাকাই, তার মুখে এবার আমি মৃত্যুর উজ্জ্বল উদ্ধারের ছায়া দেখতে পাই। আমি কাউকে উদ্ধার করতে পারবো না, নিজেকেও না, আমি বেরিয়ে পড়ি। ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে আমি পথে হাঁটতে থাকি। অনন্যার কলেজ কতো দূর? এখন তার ছুটি হয়ে গেছে? আমি কি হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গিয়ে উঠতে পারি? কতোক্ষণ লাগবে যদি আমি হাঁটতে থাকি? তাকে কি আমি সেখানে খুঁজে পাবো? গেইটে দাঢ়িয়ে থাকবো? শিক্ষকদের বসার ঘরে

গিয়ে তার বৌজ করবো? সে কি আমাকে চিনতে পারবে? এখন আমি হাটছি, আমাকে কেউ চিনতে পারবে না।

নিজেকে আমার অচেনা মনে হচ্ছে, শহরটাকে অচেনা মনে হচ্ছে। অনেক বছর ধরে আমি শহরটাকে উঁচু থেকে বসা থেকে কাচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখে আসছি, দাঁড়িয়ে হেঁটে দেখি নি, সরাসরি দেখি নি; আমার ভালো লাগছে। কেউ আমাকে চিনতে পারছে না, আমিও চিনতে পারছি না, একটা পানের দোকান থেকে একটি মোটা লোক চমৎকার ঘন পিক ছুঁড়েছে, আমার গায়ে এসে পড়তে পড়তে নিচে পড়ে গেলো, লোকটি আর আমি হাসলাম। গায়ে পড়লে কেমন লাগতো আমার ভাবতে ইচ্ছে হলো। বজ্রপাতের মতো একটা বাস এসে দাঁড়ালো আমার পাশেই, ওপরেও দাঁড়াতে পারতো, ছোট ছাই দিয়ে তৈরি হেঁস্তারটি আমাকে ধরে টানাটানি শুরু করলো তার গেইট লক সিটিং সার্ভিসে ওঠার জন্যে, আমি উঠে পড়লাম। পেছনের দিকে একটি সিটে বসলাম আমি। আমি মাছের গন্ধ পাচ্ছি, আমার পাশের লোকটির গেজি থেকে সুন্দর একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি, একবার তার গেজিতে নাক লাগিয়ে উঁকতে ইচ্ছে হলো আমার। বাস চলছে আর খামছে, খামছেই আমার ভালো লাগছে। অনন্যা কি এ-বাসে উঠতে পারে? এ-বাসে উঠে। তার পাওয়ার কথনো দরকার পড়ে না? আজই দরকার পড়তে পারে না? আমার মতো উঠে বসতে পারে না? সামনের দিকে যে-মেয়েটি বসে আছে, সে কি অনন্যা? একটি লোক তার পলিথিনের ব্যাগটি আমার ডুরুর ওপর রেখেছে, তেতর হয়ে আবের গুড় রয়েছে, আমি আবের গুড়ের গন্ধ পাচ্ছি, আমার ভালো লাগছে। অনেক দিন ধরে আমি আবের গুড় খাই না, আবের গুড়ের গন্ধ পাই না। বাস এখন চলছে না, একটি গে সেন্টুন দেখতে পাচ্ছি, গে লর্ড সেন্টুন? ঢাকায় গেদের জন্ম মিডায় সেন্টুনও রয়েছে? নাপিতগুলোকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার ওদের ঠোটে লিপস্টিক আছে কি না, ওরা বক্ষবন্ধনি পরে কি না দেখতে ইচ্ছে করছে। বাস বোধ হয় আর চলবে না, এখানেই থেমে থাকবে। আমি কি নেমে যাবো? এবার বাস চলতে শুরু করেছে। ব্রিজ, এ-ব্রিজটা একদিন ভেঙে পড়বে, তেতরে তেতরে এর ভাঙ্গার কাজ চলছে, আজই ভেঙে পড়বে না, ভেঙে পড়বে, শব্দ শুনছি। বাস কি এখন ঝাপিয়ে পড়বে ডানের পানিতে বায়ের পানিতে? যদি ঝাপিয়ে পড়ে, তাহলে আমার লাশ পাওয়া যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না আমি কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি একটি রহস্য হয়ে উঠবো। ড্রাইভার বলবে স্যার তাকে মাহমুদা রহমানের বাসা থেকে বিদায় দেয়, তারপর আর কিছু সে জানে না। আমার লিমিটেড একটা প্রকল্প নেবে আমি কোথায় যাচ্ছিলাম বের করার জন্যে। ফিরোজা ভাববে গামে আমার একটি উপপত্তি আছে, তার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। অনন্যা কী ভাববে? মাহমুদা রহমান? দেবী? সাংবাদিকগুলো? তারা কোনোদিন জানবে না আমি কোথায় যাচ্ছিলাম, আমি নিজেও জানি না। আমার ওপাশের সিটে দুটি মেয়ে, ওরা বোধ হয় দেহ বিক্রি করে, সিগারেট টানছে, ওদের কর্কশ ধূয়োর গন্ধ পাচ্ছি, বেশ লাগছে; ওরা গালি না দিয়ে কথা বলছে না, বেশ লাগছে আমার। বাস এবার খামলো, ছাদের ওপর থেকে জেলেভাইদের চাঞ্চারি প'ড়ে গেছে, তুলতে হবে। এবার একটা ব্রিজ, বেশি দিন টিকবে না, নিচে নদী,

খালের মতো। কী নাম? মেঘবতী? মেঘেশ্বরী? সামনের চাকা খুলে বাস এবার হমড়ি
বেয়ে পড়লো একটা গাছের গায়ে। খালে প'ড়ে যেতে পারতো, পড়ে নি, আমি নিচে
নেমে আসি।

হাঁটতে ইচ্ছে করছে আমার, খালি পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে; জুতো খুলে লাল
মাটি আর ঘাসের ওপর দিয়ে আমি হাঁটতে থাকি, জুতো জোড়া আর বইতে ইচ্ছে
করছে না, রাত্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিই। অনেক বছর আমার পায়ের নিচে ঘাস পড়ে
নি, মাটি পড়ে নি, এখন আমার পায়ের নিচে ঘাস, আমার পায়ের নিচে মাটি; আমার
ভালো লাগছে। কাঠালগাছগুলো সবুজ হ'তে হ'তে কালো হয়ে উঠেছে, কলাপাতাটিকে
আমার মনে পড়ছে, মৃত্যুর সুন্দর মূৰ মনে পড়ছে, সব কিছু ভালো লাগছে। আমি
একটি কাঠালগাছের নিচে বসি, গাছটিকে ঘিরে সবুজ ছায়া, গাছের ছায়ার বাইরে
পানীয়ের মতো সুন্দর রৌদ্রের আওন। আমি একবার এমন ছায়ায় এমন আওনে নিচের
ভেতর থেকে সুখ বের করেছিলাম, আমি সেই সুখ অনুভব করছি। আমি ঘাসের ওপর
ওয়ে পড়ি, আমার ঘূম পাচ্ছে। একটি হলদে কাঠালপাতা ক'রে পড়লো আমার মুখের
ওপর, আমি হাতে নিয়ে দেখি পাতাটিকে, রওশনের হাতচুতালুর মতো পাতাটি,
যেহেদিপুরা হাতের মতো। অনন্যার হাত কেমন? আমি এখন কোথায়, কেউ জানে না,
আমি জানি না। আমার ঘূম পাচ্ছে, রওশনের মুক্তে ঘূম, অনন্যার মতো ঘূম,
কাঠালপাতার মতো ঘূম, কলাপাতার মতো ঘূম। আমি ঘূমিয়ে পড়ি, বহুদিন আমি
ঘূমোই নি। যখন ঘূম ভাঙে আমার মনে ক'রে জুতোর হলো, মা এখনি আমাকে ইঙ্গুলে
যাওয়ার জন্যে ডাকাডাকি করবে; কিন্তু এখন ভোর হলো কি না আমি কার কাছে
জিজ্ঞেস করবো? ভোর কি হলো, নাস্ক্যা হচ্ছে? একটু পরেই আমি বুঝতে পারি
সন্ধ্যা হচ্ছে, ভোর হচ্ছে না। আমার পায়ে জুতো নেই, আমি কী করে ফিরবো শহরে?
বাসে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার, কিন্তু মনে পড়ছে বাসে করে আসতে আমার
ভালো লাগছিলো, মাছের গন্ধ পাই আমি, আমার বমি আসে। আমি বাসে উঠতে
পারবো না। আমি একটি বেবিট্যাঙ্গি নিই, শহরে এসে একটি জুতোর দোকানে ঢুকি,
আমার অফিসে যাই।

‘আশু আজ রাতে ফিরবে না’, খাবার টেবিলে অর্চি বলে; আমি অবাক হই অর্চি
আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে ব'লে; তাৰ আশু ফিরবে না, তাতে আমার কোনো
প্রতিক্রিয়া হয় না, জানতেও ইচ্ছে করে না কেনো ফিরবে না, সে বোধ হয় আমার
জীবনে আৱ উদ্দীপকৱণে কাজ কৰে না।

‘নানুৱ বাসায থাকবে’, অর্চি অতিরিক্ত ও প্ৰযোজনীয় সংবাদটুকু দেয়।

আমি বলি, ‘তুমি তো আগেই বেয়ে নিতে পারতে।’

অর্চি বলে, ‘আজ তোমার সাথে থেতে ইচ্ছে হলো, কতো দিন থাই না।’

আমি বলি, কেনো এমন ইচ্ছে হলো তোমার?’

অর্চি বলে ‘আমি স্টেটসে চলে যাবো যে।’ আমি একটু চমকে উঠি।

আমি বলি, ‘সব কাগজপত্ৰ পেয়ে গেছো?’

অর্চি বলে, সব পেয়ে গেছি, আমৰা তিন বাস্তবী এক সাথে যাবো।’

আমি বলি, 'কবে যাবে?'

অর্চি বলে, 'যাত্র সাত দিন সময় দিয়েছে, এর মাঝেই সব কিছু শেষ করতে হবে-ভিসা, টিকেট।'

আমি বলি, 'ঠিক আছে, দু-তিন দিনের মধ্যেই ক'রে দেবো।'

অর্চি বলে, 'আমি যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে আছি।'

আমি বলি, 'কেনো এতো পাগল হয়ে আছো?'

অর্চি বলে, 'দেশে আমার একদম ভালো লাগছে না।'

আমি বলি, 'পড়া শেষ ক'রে দেশে ফিরবে তো?'

অর্চি বলে 'না, আমি আমেরিকান হতে চাই; সেখানেই থাকতে চাই। আমার বাস্তবীরাও ফিরবে না।'

আমি বলি, 'তোমার আশ্চুর বলেছো?'

অর্চি বলে, 'না, তোমাকেই আগে বললাম।'

অর্চি চলে যাবে, আমার একটু কষ্ট লাগছে; ওকে মাঝেমধ্যে দেখতে পাই, সাত দিন পর পাবো না, ওর ঘরে তখন যখন ইচ্ছে যেতে পারবো, ও রেগে উঠবে না, বলবে না, আমাকে ডিস্টাৰ্ব কোরো না। ওর মুখটি আমি মনে করতে পারবো না; শুধু ওর কৌকড়া চুলগুলোর কথা মনে পড়বে, ওর কানের বাজবে, হঠাৎ হয়তো গাঢ়ির হৰ্ণ মনে মনে হবে অর্চির কষ্ট শুনছি। এ-ঘরে ফিরোজা ছিলো, সে আজ রাতে ফিরবে না, মাঝের কাছে থাকবে; হয়তো নৃতাত্ত্বিকটির সাথে থাকবে, হয়তো সারারাত থাকবে না, নৃতাত্ত্বিকটি তাকে মাঝেরাতে নামিয়ে নিয়ে যাবে। ফিরোজা কি এখন নৃতাত্ত্বিকের সাথে শয়্যায়? ঘরটি বেশ শূন্য লাগছে, এখন শূন্য আর কখনো লাগে নি। ফিরোজা হয়তো কাল ফিরে আসবে, পরে হয়ে আর ফিরবে না। শূন্যতা থাকবে আমার জন্যে, অসীম শূন্যতা, তা সহ্য করতে হবে আমাকে। কিন্তু ফিরোজার জন্যে আমার কষ্ট লাগছে না, অর্চির জন্যে লাগছে, অর্চিকে আরেকবার আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার কি অর্চির ঘরে গিয়ে অর্চিকে দেখে আসবো? অর্চি কি বিরজ হবে? অর্চি কি ভাববে আমি কাঁদছি? অর্চি কি আমাকে করুণা করবে? না, অর্চিকে এখন আমি দেখতে যেতে পারি না, অর্চি আমাকে দেখে কষ্ট পাবে।

অনন্যা ফোন করে বলে, 'জানেন, এখন পর্যন্ত আমার মাঝে ঘোরাচ্ছে।'

আমি বলি, 'তোমার বোধ হয় হাই-সিকনেস লিফ্ট-সিকনেস আৰ ফ্লাস্ট্ৰোকেবিয়া রয়েছে।'

অনন্যা বলে, 'কোন রোগ যে আমার নেই, তাই ভাবি, আমি বেশি দিন বাঁচবো না। বেশি দিন না বাঁচতে আমার খুব ভালো লাগবে।'

আমি বলি, 'সুন্দরের আয়ু সব সময়ই কম, সকাল থেকে দুপুর।'

অনন্যা বলে, 'আমি তো সুন্দর নই।'

আমি বলি, 'তুমি তা জানো না, তোমার চারপাশ জানে।'

অনন্যা বলে, 'চারপাশ তাহলে অঙ্গ।'

আমি বলি, ‘গতকাল তুমি কলেজ থেকে বেরোনোর সময় যদি দেখতে আমি গেইটে দাঢ়িয়ে আছি, তোমার কেমন লাগতো?’

অনন্যা বলে ‘আমি একটুখানি পাগল হয়ে যেতাম, একটুখানি পিছলে পড়তাম, একটুখানি অঙ্ক হয়ে যেতাম। তবে একটি কথা কী জানেন?’

আমি বলি, ‘না তো।’

অনন্যা বলে, ‘গতকাল আমার বারবার মনে হচ্ছিলো আপনাকে যদি বেরোনোর সময় দেখতে পাই, যদি আপনাকে বেরোনের সময় দেখতে পাই, আপনাকে কলেজ থেকে বেরোনোর সময় দেখতে পাই যদি।’

আমি বলি, ‘এমন মনে হচ্ছিলো কেনো?’

অনন্যা বলে, ‘মাঝেমাঝে আমার অসন্তুষ্টিকে পেতে আর দেখতে ইচ্ছে করে।’

আমি বলি, ‘আমি অসন্তুষ্ট নই।’

অনন্যা বলে, ‘অসন্তুষ্ট ছাড়া আমার কিছুই ভালো লাগে না। যা আমার ভালো লাগে, তাই অসন্তুষ্ট; আপনাকে আমার ভালো লাগে, তাই আপনি অসন্তুষ্ট।’

আমি বলি, ‘যুব ভালো লাগছে শুনতে।’

অনন্যা বলে, ‘আমি অসন্তুষ্টকে ঘিরে ঘূরতে আশোবাসি। গতকাল কলেজ থেকে ফেরার সময় আমি চারবার রিকশা নিয়ে আশোবাসি অফিসের চারদিকে ঘূরেছি, কী যে ভালো লেগেছে।’

আমি বলি, ‘আমি তখন সাভাদ্রে একটি কাঠালগাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে ছিলাম।’

অনন্যা বলে, ‘অসন্তুষ্ট।’

আমি বলি, ‘সত্য।’

অনন্যা বলে, ‘তাহলে আপনি বোধ হয় আমার থেকেও বেশি অসন্তুষ্টকে পেতে চান।’

আমি বলি, ‘আমি কিছু পেতে চাই না।’

অনন্যা বলে ‘আপনি বোধ হয় অনেক পেয়েছেন।’

আমি বলি, ‘তোমার কলেজ কখন শেষ হয়?’

অনন্যা বলে, ‘দুটোয়।’

আমি বলি, ‘তুমি আজ কলেজের গেইটে এক স্কুল অসন্তুষ্টকে দেখতে পাবে।’

অনন্যা বলে, ‘আমার সুখের শেষ থাকবে না।’

আমি কলেজের গেইটে গিয়ে দাঢ়িয়ি, পাঁচ মিনিটকে আমার পাঁচবার মহাজগত ধ্বংস আর সৃষ্টির সমান দীর্ঘ ব'লে মনে হয়; আমার মুজো ঘেমে ওঠে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ব'লে হয়; একটি ছেলে আমার কাছে দেশলাই চায়,— পাঁচ-সাত বছরেই সে হয়তো একটা দুর্দান্ত যাননীয় মন্ত্রী হবে,— আমি দেশলাই বের করে তার সিগারেট ধরিয়ে দিই, সিগারেট চাইলেও পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে দিতাম। ছেলেটির মুখ থেকে ধুঁয়ো এসে আমার মুখে লাগে। অনন্যা বেরিয়ে আসছে দেখতে পাই, আমি একটু কেপে উঠি, কিন্তু অনন্যা এমনভাবে আসে যেনো সে চারদিকের

কিছুই দেখছে না, শুধু আমাকে দেখছে, দেবে দেবে সুস্থ হয়ে উঠছে। আমরা একটু হাঁটি, হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়াই, আমাদের ঘরে শুধু রিকশা আর বেবিট্যাঙ্গি জটলা পাকাতে থাকে।

‘আমরা এখন কী করবো?’ আমি বলি।

অনন্যা বলে, ‘আপনার কাঠালগাছটিকে দেখতে যাবো ভাবছি, কাঠালগাছটিকে আমি ভুলতে পারছি না।’

আমি বলি, ‘ওটা অস্টব কিছু নয়।’

অনন্যা বলে, ‘কিন্তু ওর ছায়ায় আমার বসতে ইচ্ছে করছে।’

আমি গাড়ি নিই নি, গাড়ি নিয়ে ওর কলেজের গেইটে যেতে আমার খারাপ লাগছিলো, আমি নিঃশ্ব হয়ে ওর কলেজের গেইটে যেতে চেয়েছিলাম। আমরা একটি বেবিট্যাঙ্গি নিই; বহু বছর পর যেনো আমি বেবিতে চড়ছি, গতকালও চড়েছিলাম তা আমার মনে পড়ছে না। অনন্যা আমার পাশে আমি ভাবতে পারছি না, বেবিটাকে আমার ডানামেলা পারি বলে মনে হয়। ওর শাড়ির একটি শাড়ি উড়ে এসে আমার নাকে লাগে। অনন্যা ব্যাগ থেকে দুটি গোলাপ বের করে গোলাপ দুটির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

অনন্যা বলে, ‘গোলাপ দুটি এখন আমি হাঁড়ে ফেলে দেবো, ফেলতে আমার একটু কষ্ট হবে।’

আমি বলি, ‘হাঁড়ে ফেলে দেবে কেনে? কষ্টই পাবে কেনো?’

অনন্যা বলে, ‘উচ্চমাধ্যমিকের একটি ছাত্র প্রতিদিন আমাকে দুটি করে গোলাপ দেয়, বাসায় ফেরার সময় প্রতিদিন হাঁড়ে ফেলে দিই।’

আমি বলি, ‘তাহলে কেনে?’

অনন্যা বলে, ‘ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হয়, না করতে পারি না।’

আমি বলি, ‘আপার গভীর প্রেমে পড়েছে বালকটি।’

অনন্যা বলে, ‘আমি যখন কলেজে ঢুকি তখন সে দূর থেকে দেবে আমাকে, যখন বেরোই তখন দূর থেকে দেবে আমাকে।’

আমি বলি, ‘আজ তাহলে সে বাসায় ফিরে আস্থাত্যা করবে।’

অনন্যা বলে, ‘করতে পারে।’

আমি বলি, ‘কেমন দেখতে ওই বালক প্রেমিক?’

অনন্যা বলে, ‘ব্যস বেশি হবে না, কিন্তু বেশ বড়োসড়ো, ওর পাশে আমাকে ওর বাস্তবীই মনে হবে। ক্লাশে আমার দিকে তাকাতে গিয়ে বারবার কেঁপে ওঠে।’

আমি বলি, ‘নিষ্পাপ প্রেম।’

অনন্যা বলে, ‘কিছুই নিষ্পাপ নয়।’

আমি বলি, ‘তুমি কি বোঝো ওই বালক তোমাকে মনে মনে ভোগ করে?’

অনন্যা বলে, ‘আমি শুব শুবি। ঘুমোনোর আগে সে যে আমাকে তেবে তেবে নিজেকে মন্ত্রন করে, তা আমি শুবি।’

আমি বলি, 'সে হয়তো স্বপ্ন দেখে একদিন তুমি তার কাছে গিয়ে বলছো, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচনো না, তাকে জড়িয়ে ধরছো, সে তোমাকে জড়িয়ে ধরছে, দূজন মিলিত হচ্ছে।'

অনন্যা বলে, 'তা আমি জানি। তবে ও-ই শুধু নয়।'

আমি বলি, 'আর কে?'

অনন্যা বলে, 'বুড়ো প্রিসিপালটিও। সে নিজেকে জেসাস ক্রাইষ্ট মনে করে।' আমি বলি, 'অধ্যাপনা তো একরকম আঘোংসগ্রহি!'

অনন্যা বলে, 'সে ওসব জানতোই না। আমি তাকে একদিন বলি কাউকে না কাউকে তো কাঁটার মুকুট পরতেই হয়। সে বলে, কী বললেন? আমি আবার বলি কাউকে না কাউকে তো কাঁটার মুকুট পরতেই হয়। তখন থেকে সে মনে ক'রে আসছে সে-ই কাঁটার মুকুট পরেছে।'

আমি বলি, 'প্রতিটি বদমাশের ভেতরেও একটি ক'রে জেসাস ক্রাইষ্ট রয়েছে।'

অনন্যা বলে, 'কিন্তু ওই বড়ো জেসাস এখন প্রত্যেক দ্বিতীয় আমাকে ডেকে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, আমি আর আপনার দুইজনই কাঁটার মুকুট পরছি। সেও স্ত্রীসহবাসের সময় স্বপ্ন দেখে।'

কখন যে আমরা ওই কাঁঠালগাছটিকে পেরিয়ে পেছি, বেয়াল করি নি; বেয়াল করলেও আমি চিনতে পারতাম না। আমি এক সময় বেবিঅনাকে খামতে বলি, বেবি থেকে নেমে সবুজ ঘাস আর কাঁঠালবনের প্টাকে আমরা হাঁটতে থাকি। অনন্যা হাঁটতে থাকে আগে আগে, এটাই আমার ভাবে সাগে; মেয়েদের আগে আগে হাঁটতে আমার ভালো লাগে না। আমি হঠাতে দেখতে পাই অনন্যার স্যান্ডলের নিচে মাটির আর ইটের টুকরো খিলিক দিয়ে উঠছে। তখনেকটি মাটির টুকরোকে ইটের টুকরোকে আমার মাণিক্য বলে মনে হচ্ছে। আমি একটি টুকরো হাতে তুলে নিই, হাতে তুলে নেয়ার সাথে সাথে তা আবার মাটিতে পরিণত হয়, আবার ইটে পরিণত হয়; কিন্তু অনন্যা যেখানেই পা রাখে সেখানেই আমি মাণিক্যের দৃঢ়তি দেখতে পাই। আমি দুটি টুকরো আমার বুকপকেটে রাখি।

অনন্যা পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি মাঝেমাঝে কী তুলছেন?'

আমি বলি, 'মাণিক্য।'

অনন্যা বলে, 'দেখি।'

আমি টুকরোটি তার হাতে তুলে দিই, সে হেসে উঠে বলে, 'এ তো মাটির টুকরো।'

আমি বলি, 'একটু আগেই এটি মাণিক্যের টুকরো ছিলো।'

অনন্যা অভ্রতভাবে হাসে আমার দিকে চেয়ে।

বাস্তার বাঁ পাশেই একটি কাঁটাগাছ দাঁড়িয়ে ছিলো, একটু দূর থেকে আমি ওর কাঁটাগাছে দেখেছি, একটিও পাতা নেই, কাঁটাতারের মতো কাঁটায় আবৃত গাছটি; এখন অনন্যার শাড়ির আঁচল উড়ে গিয়ে ওই কাঁটার ওপর পড়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সেখানে লাল লাল ফুল ফুটে উঠছে। আমি হাত বাড়িয়ে ফুল কুড়োতে যাই।

অনন্যা চিৎকার ক'রে ওঠে, 'করছেন কী, করছেন কী, কাটায় আপনার হাত ছিড়ে যাবে।'

আমি বলি, 'কাটা কোথায়, লাল লাল ফুল।'

অনন্যা বলে, 'গাছে নয়, অন্য কোথাও।'

আমরা একটি কাঠালগাছের ছায়ায় বসি; সবুজ রাত্রের মতো ছায়া ঝ'রে পড়ছে অনন্যার মুখে, আমার চুলে, অনন্যার শাড়িতে, আমার মুঠোতে। অনন্যা স্যান্ডল খুলে পা দুটি একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে বসেছে, গম্বুজের মতো হাঁটুর ওপর রেখেছে হাত দুটি, আমি তার পাঁচটি সোনালি আঙুল দেখতে পাচ্ছি। তার আঙুল থেকে কী ঝরছে? জ্যোৎস্না? এখন রাত হ'লে ঘাসের ওপর আলো পড়তো, আলো দেখা যেতো; এখন আলো দেখা যাচ্ছে না, তবে আলোতে ঘাসগুলো আরো সবুজ হয়ে উঠছে। অনন্যার পায়ের পাতার নিচের ঘাসগুলো সোনালি হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে, এমন সোনালি ঘাস আমি কখনো দেখি নি; আমি একবার হাত বাড়িয়ে তার পায়ের নিচ থেকে একগুচ্ছ ঘাস তুলে আনি।

অনন্যা চমকে পা সরিয়ে নিয়ে বলে, 'কী করছেন, কী করছেন?'

আমি বলি, 'ঘাসগুলো সোনালি হয়ে উঠছে বলে আমি হচ্ছিলো।'

অনন্যা বলে, 'আপনি কি মাঝেমাঝে হেল্পিংহান দেখেন?'

আমি বলি, 'আগে কখনো দেখি নি।'

অনন্যা বলে, 'কখন থেকে দেখেছে?'^{১০}

আমি বলি, 'আজ থেকে, সম্ভবত আজ থেকে।'

অনন্যা হেসে বলে, 'আমার সাথে দেখা হ'লে প্রত্যেকেরই একটি নতুন রোগ দেখা দেয়, আমার খুব কষ্ট করে।'

আমি বলি, আমার রোগ দেখা দেয় নি।'

অনন্যা বলে, 'তাহলে কী?'

আমি বলি, 'আমার রোগ সেৱে যাচ্ছে।'

আমি অনন্যার বাঁ পায়ের পাতাটি আমার ডান হাতের সবগুলো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করি; অনন্যা বলে, 'এ কী করছেন'; কিন্তু আমি তার পায়ের পাতায় আঙুল বোলাতে থাকি। আমি একটি কবুতরের পিঠে হাত রেখেছি মনে হয় আমার; আমি তার মুখের দিকে তাকানোর সাহস করি নি, আমি জানি না সে কীভাবে তখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ছিলো, তার পায়ে চুম্বো খাওয়ার সাধ হয় আমার, আমি তার পায়ের পাতায় চুম্বো খাই; তার দিকে তাকাই। আমি দেখি সে চোখ খুলে ঘুমিয়ে আছে।

অনন্যা বলে, 'আমার কাছে মৃত্যুর মতো সুখকর মনে হলো।'

আমি বলি, 'আমার কাছে জন্মলাভের মতো।'

অনন্যা হেসে বলে, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে কাঠালগাছটিকে একটি বর দিই, কিন্তু বর দেয়ার শক্তি আমাদের নেই।'

আমি বলি, 'তুমি শুধু একবার গাছটিকে ছুঁয়ে যেয়ো, তাহলে এটি চিরকাল বেঁচে থাকবে।'

অনন্যা হাসতে থাকে, আমি দেখি গাছটি আরো সবুজ হয়ে উঠছে।

দু-তিনটি লোক আমাদের পাশ দিয়ে চ'লে গেলো; খুব শান্ত নিরীহ গ্রামের মানুষ, মাছ ধ'রে বা বেত চ'রে ফিরছে।

অনন্যা বলে, ‘এই লোকগুলো কী ভাবছে জানেন?’

আমি বলি, ‘ওরা বোধ হয় ভাবতে জানে না।’

অনন্যা বলে, ‘খুব জানে; ওরা ভাবছে আপনাকে খুন ক'রে আমাকে যদি জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া যেতো।’

সন্ধ্যায় আমাকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে অনন্যা চ'লে যায়। আমিই নামিয়ে দিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে উল্টোপথে ফিরতে হবে, তাই সে রাজি হয় নি। আমাকেই সে নামিয়ে দিয়ে যায়। দালানটিকে আমার একটি দশতলা মাণিক্যের খণ্ড মনে হয়। একেবার অর্চিকে মনে পড়ে। আমার ঘরে গিয়ে টেবিলে একটি কাগজের টুকরো পাই;— ‘স্যার, আপনার জন্যে ব'সে থেকে থেকে দুটীয় বাসায় যাচ্ছি, আপনার জন্যে কেমন লাগছে’,— আমার সহকারিণী মেয়েটি বেশ কৃত আক্রান্ত হচ্ছে, প'ড়ে মায়া লাগলো ওর জন্যে। ওকে কি টেলিফোন ক'রে আসবো আমি ফিরেছি? থাক, ওর আরেকটুকু কেমন লাগুক, কেমন লাগার সময়ের মতো সুবের সময় আর হয় না; ও আরেকটুকু সময় সুবে থাকুক। কাগজের টুকরোটি আমি জ্বালারে রেখে দিই। ফিরে গিয়ে অনন্যার টেলিফোন করার কথা। সেটিকে কি একবার টেলিফোন করবো? থাক। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠে।

টেলিফোনে অনন্যা নয়, দেবী বস্থা বলছেন, ‘আপনাকে দুপুর থেকে খুজছি, টেলিফোন ক'রে পাগল হয়ে যাচ্ছি।’

আমি বলি, ‘হারিয়ে গিয়েছিলাম।’

দেবী বলেন, ‘কিন্তু আপনাকে আমার ভীষণ দরকার, এখনি দরকার; ধার চাই না, এখনি আপনাকে চাই।’

আমি বলি, ‘কোনো দুর্ঘটনা?’

দেবী বলেন, ‘অনেকের জন্যে।’

কিন্তু অনন্যার টেলিফোন? আমি তার স্বর শুনতে চাই, তার স্বর দেখতে চাই, আরেকটুকু সেরে উঠতে চাই। টেলিফোন ক'রে আমাকে না পেলে সে কি ভয় পাবে না? সে তো সব কিছুতেই ভয় পায়। ভাববে না আমি লিফ্টে আটকে গেছি, আমার লিফ্ট উঠছে আর নামছে, আমি চিৎকার করছি; কেউ শুনতে পাচ্ছে না? আমি বেরিয়ে পড়ি দেবী আমাকে ডেকেছেন, ধার চাইছেন না, অনেকের জন্যে দুর্ঘটনা, আমি বেরিয়ে পড়ি। দেবীর বাসায় গিয়ে আমি অবাক হই। সরাসরি আমাকে তাঁর শয্যাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়, আগে যা কখনো হয় নি। দেবী ভয়ঙ্কর সাজে সেজেছেন, মনেই হচ্ছে না তাঁর বয়স আটচল্লিশ, তাঁকে তবী দেবীই মনে হচ্ছে। তাঁর পাশে এক স্বাস্থ্যবান যুবক ব'সে আছে। দেবী আমাকে দেবে দেবীর মতো হাসেন।

‘এ ইচ্ছে শমশেদ মোল্লা’, দেবী যুবকটির সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘জমশেদ মোল্লা সাহেবের পুত্র; আজ আমরা বিয়ে করছি।’

‘জমশেদ মোল্লা সাহেব কোথায়?’ একটু চমকে একটু দুঃখ পেয়ে একটু বিবেচকের মতো আমি বলি।

‘তিনি সিঙ্গাপুর আছেন, দেবী বলেন, ‘তাকে দরকার নেই। আপনাকে ডেকেছি আপনি সাক্ষী হবেন।’

‘জমশেদ মোল্লা সাহেব’, আমি বলি, ‘ফিরে এসে গোলমাল করবেন না তো?’

শমশেদ মোল্লা বলে, ‘বাবারে আমি তাইলে ছিড়ড়া ফালামু না? ভয় পাইয়েন না, বাবায় আমারে ঘমের মতন ডরায়।’

যুবক বুবই বলিষ্ঠ, পিতার থেকেও, আমার সামনেই দেবীকে জড়িয়ে ধরে, দেবীর হাড় ভাঙার শব্দ যেনো আমি উনতে পাই; দেবী তার বাহুর ভেতরে প্রজাপতির মতো প’ড়ে থাক। কোনো ডানা ভেঙে গেছে কি না আমি বুঝতে পারি না; কিন্তু আমার অত্যন্ত সুন্দর লাগে ওই দৃশ্য। আবর্জনার ওপর চন্দ্রমণিকা প’ড়ে আছে দেখতে আমার বুব ভালো লাগে। দেবীকে সে বাহু থেকে মুক্তি দেয় না, তার বাহুর ভেতর ভাঙতে থাকে; শমশেদ মোল্লা দেবীর গালে একটি ক্ষমতা দেয়ার চেষ্টা করে। কামড়টি দিতে পারলে দেবীর গাল থেকে একশো ধাম মাংস উঠে আসতো। শমশেদ মোল্লা বুব উত্তেজিত, আজ রাতেই দেবীকে পৌচ-সাতবার প্রতিবর্তী ক’রে ছাড়বে।

‘এখন ছাড়ো’, দেবী বলেন, ‘অনেক স্টার পাবে কামড় দেয়ার।’

শমশেদ মোল্লা দেবীকে মুক্তি দেয়, দেবী আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘শমশেদ একটু জংলি, ওর জংলামোহ অমাত্মালো লাগে। দেখতে ইচ্ছে হয় গওয়ারের নিচে কেমন লাগে।’

শমশেদ মোল্লা বলে, ‘তোমারে আইজও আমি পুরা পাই নাই। আইজ রাইতেই পাইতে চাই।’

দেবী বলেন, ‘পাইবা।’

অটি আজ চ’লে যাচ্ছে, আমি অফিসে যাই নি, যেতে ইচ্ছে করে নি; ওকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, ওর ঘরে যেতে আমার সাহস হচ্ছে না, দেবে যদি আমার বুব কষ্ট লাগে, যদি ওর বুব কষ্ট লাগে। ও একবার আমাকে দেখে অবাক হয়েছে, বলেছে, ‘তুমি অফিসে যাও নি?’ আমি বলেছি, ‘আজ যাবো না; ও বলেছে, ‘আবু, অফিসে যাও, বাসায় থাকলে তুমি কাঁদবে।’ আমি কাঁদি নি, অনেক বছুর কাঁদি নি; কিন্তু ফিরোজা মাঝেমাঝে কাঁদছে।

অটি বলছে, ‘আস্মু, তোমার কান্না দেবে আমার হাসি পাচ্ছে।’

ফিরোজা বলছে, ‘তোমার কান্না দেবেও একদিন কেউ হাসবে।’

অটি কোমল হয়ে বলছে, ‘আস্মু কেঁদো না, আমার সাথে চলো।’

ফিরোজা বলছে, ‘যাবো।’

ফিরোজা আরো কাঁদছে, অর্চিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদছে, আমি ইর্বা করছি ফিরোজাকে, কেন্দে সে সুখী হয়ে উঠছে, আমি সুখী হ'তে পারছি না। ফিরোজা আর আমি কথা বলছি না, আমাদের কথা বলার কিছু নেই; অর্চি চলে যাচ্ছে তাতে কষ্ট আমাদের ব্যক্তিগত, ফিরোজারটা ফিরোজার আমারটা আমার, দুঃখটা আমাদের মিলিত নয়। আমরা অনেক দূরে স'রে গেছি, দুঃখেও আমরা এক হ'তে পারছি না। ফিরোজা আর সবই স্বাতীবিকভাবে করছে, অর্চি আর আমাকে যাওয়াচ্ছে, দূর থেকে দাঢ়িয়ে দেখছে, তার কানাভরা মুখটিকে আমার সুবের মুখ মনে হচ্ছে। বিকেলে অর্চির প্লেন, আমরা অনেকেই এসেছি, আমার অফিসের সবাই এসেছে, অর্চির নানুবাড়ির সবাই এসেছে, চাচারা এসেছে। অর্চি চলে যাওয়ার সময় আমি শুধু একটি চুমো খেলাম ওর গালে, জড়িয়ে ধরতে পারলাম না, অর্চি হেঁটে বাঙ্কবীদের সাথে বিমানে গিয়ে উঠলো। অর্চির বিমান আমার চোখ ছিদ্র ক'রে আমার শেষ দীর্ঘনিশ্চাসের মতো পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে যেযে মিলিয়ে গেলো। অর্চি কি এখন ভয় পাচ্ছে? অর্চির কি এখন ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে? আমি একবার অঙ্ককার দেবি।

আমি গাড়ির পাশে এসে দাঢ়িয়ে ছিলাম ফিরোজা আসবে মনে ক'রে। আমি আজো এমন মনে করি? অন্যরা আমার কাছে আসতে না, বুঝতে পারছি তারা সাহস পাচ্ছে না, তারা আমার বেদনাটুকু আমাকেই সম্ভুক্ত করতে দিচ্ছে, সবাই ফিরোজাকে ঘিরে আছে; সে কাঁদছে, তাকে জড়িয়ে উঠে আছে কেউ কেউ। ফিরোজা শুব সুখী। আমার সহকারিণী মেয়েটি একবার এসে দাঢ়িয়েছিলো, কিছু বলতে পারে নি। আমার একটু শূন্য মনে হচ্ছে নিজেকে। স্বাক্ষর যদি আমাকে ঘিরে দাঢ়াতো, আমি কেন্দে ফেলতাম, তারা আমাকে জড়িয়ে দাঢ়াতো, আমি হাঙ্কা হয়ে উঠতাম; কিন্তু আমাকে ঘিরে কেউ দাঢ়াচ্ছে না, জড়িয়ে দাঢ়াচ্ছে না। আমি বোধ হয় ফিরোজার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি। আমি কি গাড়িতে উঠে চলে যাবো? আমি চলে যাচ্ছি না; আমি বোধ হয় ফিরোজার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

'তুমি যাও, আমি তোমার সাথে যাবো না,' ফিরোজা বলে।

'আজই, না কি কখনো যাবে না?' আমি বলি।

'তা পরে দেখা যাবে', ফিরোজা বলে।

আমি গাড়িতে উঠি, কিন্তু আমি কোথায় যাবো? গাড়ি চলতে শুরু করেছে ড্রাইভার যখন শহরে চুকে জানতে চাইবে কোথায় যাবো, আমি কী বলবো? তাকে আমি কোথায় যেতে বলবো? আমার একটু পান করতে ইচ্ছে করছে, আমি পান করবো না, মনে হবে আমি কাতর হয়ে পড়েছি, কাতর আমাকে দেখতে আমি পছন্দ করি না। পান করলে আমি শুব সৎ হয়ে উঠি, সরল হয়ে উঠি, নিজেকে শুলে ফেলি, আমি পান করবো না। শহরে চুকে আমি ড্রাইভারকে ছেড়ে দিই, ইটতে থাকি। সম্ভ্যা বেশ গভীরভাবে নেমেছে, সম্ভ্যা কি এতাবেই নামে সব সময়, না কি আজ অন্যভাবে নেমেছে? প্রতিটি আলোর রেখাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। কোথায় যেতে পারি আমি এখন? অর্চির কি কষ্ট লাগছে? অর্চির কি ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে? অর্চির মুখটি কেমন? অর্চি কতো বড়ো?

ওর চূল কি ঝাঁকড়া, দেউখেলা, পিঠের ওপর ছড়ানো? ও কি কোনো দিন ফিরে আসবে? ফিরোজা কি আজ নৃত্যাভিকটির সাথে থাকবে? অনন্যা এখন কী করছে? তাকে প্রতিদিন দুটি গোলাপ দেয় তার এক ছাত্র। আমি একটি পানশালায় চুকে পড়ি, একটু পান করি। পান করতে আমার ইচ্ছে করছে না, চারপাশের সবাই খুব কষ্টে আছে। আমি কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে তারা খুব কষ্টে আছে, আমার থেকে অনেক কষ্টে আছে। একটি লোক বারবার কেঁদে উঠছে। তার কি মেয়ে মারা গেছে, একমাত্র মেয়ে? একটি কবি এসেছে বোধ হয় পানশালায়, সে বারবার সবার পাখরে মাফ চাচ্ছে, তাকে ক্রুশবিন্দু করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে, কেউ তাকে ক্রুশবিন্দু করছে না বলে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি কি তাকে ক্রুশবিন্দু করার ভারটি নেবো? তার কোনো ভক্ত নেই, যে ওই কাজটি করতে পারে? লোকটিকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, সে কতোগুলো পচা পদ্য লিখেছে আমি জানি না, তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। আমি বেরিয়ে পড়ি। একটি রিকশা নিই আমি, রিকশাটি অনন্যাদের বাড়ির রাস্তায় এসে উপস্থিত হয়, রিকশাটি বোধ হয় অনন্যার টিকানা জানে, বা অনন্যার গন্ধ খেংকে খেংকে এখানে এসে গেছে। আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি। এখানেই তাকে নামিয়ে দিয়েছিলাম আমি? আমি রাস্তার এক কোণে দাঁড়াই, আমার একটু সুখ লাগছে, তাহলে এখানেই কোথাও অনন্যা থাকে, আমি দাঁড়িয়ে থাকি। মানুষের মুখগুলো আমার অঙ্গুত লাগতে থাকে। শহর কি দেবতার ভূরে গেছে, দেবীতে ভূরে গেছে? সবাইকে আমার দেবতা আর দেবী ননে হচ্ছে। একটি লোক আমাকে সালাম দেয়, তাকে আমি চিনতে পারি না: লোকটি অবাক হয়ে সরে পড়ে। আমি রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটতে থাকি। আমি দেখতে পাই অনন্যা হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে একটি রিকশায় চৰে গেলো, আমি তাকে ডাকতে চেষ্টা করি, আমার গলা থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না।

কখন বাসায় ফিরেছি আমি জানি না, কাজের যেয়েটি দরোজা খুলে দিয়ে আমার দিকে অঙ্গুতভাবে তাকায়। আমি আমার ঘরে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিই। শব্দ টেলিফোন বাজছে, টেলিফোন বাজছে, পৃথিবীতে আর কিছু নেই টেলিফোনের শব্দ ছাড়া, আমি কোনো টেলিফোন ধরছি না, পৃথিবীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি একটি বোতল বের করি, পান করতে থাকি। অর্চি কি কষ্ট পাচ্ছে? তার কি ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে? তার কি প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে? আমার ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আমাকে ঘিরে আছে অঙ্ককার আকাশ। আমি নদীর পর নদী দেখতে পাচ্ছি, নদীর ওপর আমার ব্রিজগুলো দেখতে পাচ্ছি, যেগবতী যমুনা, করতোয়া ফুলবরি, ফুলমতি, সুরমা, একটির পর একটি ব্রিজ ধ'সে পড়ছে, ধ'সে পড়ার দৃশ্য আমার কাছে সুন্দর লাগছে। ফিরোজা কি এখন নৃত্যাভিকটির বিছানায়? ফিরোজার বী স্তনটি লাফিয়ে উঠছে আমার চোখের সামনে, সেচিতে দুটি বড়ো বড়ো তিল আছে, আমার কামড়ের দাগ হয়তো মুছে গেছে। যতোই বয়স বাড়ছে ততোই সুন্দর হচ্ছে ওর স্তনযুগল। অনন্যা কী করছে, ঘুমোচ্ছে? তার ছাত্রটি? কতোগুলো গোলাপ সে ফেলেছে এ-পর্যন্ত? অনন্যা কি কখনো

ঘূমিয়েছে কারো সাথে? তার ছাত্রটির সাথে? ‘স্যার, আপনার জন্যে বসে থেকে থেকে ছটায় বাসায় যাচ্ছি, আপনার জন্যে কেমন লাগছে’; লাঞ্চক। আমি কি একবার ফোন করবো আমার সহকারিনীটিকে? অনন্যাকে? না, আমি কাউকে ফোন করবো না। কলাপাতাটি কি বেঁচে আছে, মাহমুদা রহমান উদ্বার পেয়েছেন? এখন হিন্দি ছবির যে-মেয়েটি নাচছে, তার বগলের লোমগুলো আমার ভালো লাগছে, ওর বগলের লোমে কে কে কে কে জিভ রাখে? অনন্যার বগলে কি লোম আছে? অনন্যা কি শেভ করে? বাঙালি মেয়েগুলো শেভ করে ওরা কোথায় শিখেছে কে জানে, বিছিরি লাগে; হয়তো অনন্যাও শেভ করে। মাহমুদা রহমান করতো, দেবী করতো, ফিরোজাও করতো। আমাদের কাজের মেয়েটিও বোধ হয় করে। নইলে আমার ফেলে দেয়া ব্লেডগুলো পাই না কেনো? আবদুর রহমান সাহেব কি এখনো সেই কাজের মেয়েটিকে নিয়েই থাকেন? না কি বদল করেছেন? বড় মারা যাওয়ার পর তিনি আরো ভালো আছেন; বছর বছর কাজের মেয়ে বদলাচ্ছেন। তিনি আর বিয়ে করবেন না, প্রিয়তমা স্তীর শোক ভুলতে পারছেন না, কাজের মেয়ে বদলাচ্ছেন, কাজের মেয়ে বদলাচ্ছেন।

এখন যে-ফোনটি বাজছে, সেটি অনন্যার, শব্দ ত্বরণে ক্ষমতে পারছি; কিন্তু আমি ধরতে এতো দেরি করছি কেনো? আমি কি ফোন ধরবো না? অথচ আমি আজ অফিসে এসেছি শুধু অনন্যার ফোনেরই জন্যে। কিন্তু আমি কৰান ধরছি না কেনো? ফোন একবার থামলো, আবার বাজতে শুরু করলো, অনন্যা অনেকক্ষণ ফোন ধরে রাখতে পারে, আবার থামলো, বাজতে শুরু করলেও আবার। আটটা চালিশ বেজে গেছে, তবু অনন্যার ফোন বাজছে, সে কি তার নিজের ক্লাশ ধরবে না? আজ তার নটার ক্লাশ নেই? কেনো নেই? তার কি অসুখ করেছে? সে কি যাবে কোথাও? তার কতোটুকুই আমি জানি, আসলে কিছুই জানি না। জনতেও চাই না। তার ছাত্রটি তাকে কতোগুলো গোলাপ দিয়েছে এ-পর্যন্ত? গোলাপ দিতে গিয়ে ছেলেটা অনন্যার হাত ছোয় না? অনন্যার তখন কেমন লাগে? অনেকক্ষণ আঙুল লেগে থাকে? ঘাস কি সত্যেই সোনালি হয়ে উঠেছিলো? আমি কি হেলুসিনেশন দেখি? আমি এবার ফোন ধরি।

‘আমি তব পেয়ে গিয়েছিলাম’, অনন্যা বলে, ‘আপনি ফোন ধরছেন না দেখে। আধঘণ্টা ধরে রিং করছি।’

‘তুমি আজ কি কলেজে যাচ্ছো না?’ আমি বলি।

‘না, আজ আর যাবো না; বুক কষ্টে ভ’রে গেছে’, অনন্যা বলে।

‘তোমার ছাত্রটি গোলাপ কাকে দেবে তাহলে?’ আমি বলি।

‘আপনি কি ওকে সীর্বা করেন?’ অনন্যা বলে।

‘একটু তেবে দেখতে হবে’, আমি সম্ভবত মিথ্যা বলি।

‘আপনার কি অসুখ করেছে?’ অনন্যা বলে।

‘না তো’, আমি বলি।

‘কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার অসুখ করেছে’, অনন্যা বলে।

‘তুমি কি আমাকে সারিয়ে তুলতে পারো?’ আমি বলি।

‘নিজেকেই আমি সারাতে পারি না, আপনাকে কীভাবে সারাবো?’ অনন্যা বলে।

‘কিন্তু আমার মনে হয় তোমার আঙ্গুলে আরোগ্য আছে’, আমি বলি।

অনন্যা হাসে, আমি তার হাসি দেখতে থাকি; সে বলে, ‘তাহলে আপনি আপনার সিংহাসনে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করুন, আমি ম্যাসাজ করে দিই।’

আমি অনন্যার স্পর্শ অনুভব করতে থাকি; দশটি স্বর্ণচাপা আমার চুলের ভেতর দিয়ে ব'য়ে চলেছে, আমার চোবের পাতার ওপর দিঘির ওপর কালো ছায়ার মতো স্থির হয়ে আছে, স্বর্ণচাপা বয়ে চলেছে আমার নাকের ওপর দিয়ে মুখের ওপর দিয়ে আমার গ্রীবার ওপর দিয়ে বুকের ওপর দিয়ে পিঠের ওপর দিয়ে আমার মাংসের ভেতর দিয়ে আমার রক্তের ভেতর দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি স্বর্ণচাপা বয়ে চলেছে নদী বয়ে চলেছে ছায়া স্থির হয়ে আছে আমি ঘুমিয়ে পড়ছি আমি স্বর্ণচাপা দেখছি ঘাস সোনালি হয়ে উঠেছে পায়ে চুম্বো খাচ্ছি আমি অনুভব করছি আমার বুকের ওপর কে যেনো মাথা রাখছে অনন্যার শরীরের গন্ধ পাচ্ছি অনন্যার শাড়ির গন্ধ পাচ্ছি স্বর্ণচাপার গন্ধ পাচ্ছি।

‘একটু কি ভালো লাগছে?’ অনন্যা বলে।

‘খুব ভালো লাগছে’, আমি বলি।

‘আমাকে কি আপনার দেখতে ইচ্ছে করছে না?’ অনন্যা বলে।

‘আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি’, আমি বলি।

‘কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না’ অনন্যা বলে।

‘দুপুরে একসাথে খেলে কেমন হয়?’ আমি বলি।

‘বেশ হয়’, অনন্যা বলে।

‘কোথায়?’ আমি বলি।

অনন্যা তার প্রিয় রেস্তোরাঁটিয়ে স্থায় বলে। চিংড়ি। অনন্যার একটি প্রিয় রেস্তোরাঁ আছে! অনন্যা টেলিফোন রাখতেই মাহমুদা রহমানের ফোন বেজে ওঠে, আমাকে এখনি তার ওখানে যেতে হবে। আমার কোনো কাজ নেই, তবু বলি আমার অনেক কাজ; মাহমুদা রহমান তা ওনতে রাজি নন, আমাকে যেতেই হবে, এখন না গেলে হবে না। আমি গিয়ে দেখি মাহমুদা রহমান আর হাফিজুর রহমান দুজন দু-সোফায় বসে আছেন। তারা কথা বলছেন না। আমাকে দেখে হাফিজুর রহমান মাথা আরো নামিয়ে নিলেন। কাউকে অপরাধীর মতো ব'সে থাকতে দেখলে আমার খারাপ লাগে, আমার খারাপ লাগলো। আমাদের সবারই তো অপরাধীর মতো ব'সে থাকার কথা, কিন্তু আমরা সবাই পুণ্যবানের মতো বসি, শুধু কেউ কেউ ব'সে অপরাধীর মতো

‘আপনি আমাকে উদ্ধার করলেন না’, মাহমুদা রহমান বলেন, ‘কিন্তু আমি উদ্ধার করেছি নিজেকে, জানেন?’

‘আমি বলি, না।’

মাহমুদা রহমান বলেন, ‘মেয়েটিকে খুন করি নি, বিয়ে দিয়েছি।’

আমি বলি, ‘কোথায়?’

মাহমুদা রহমান বলেন, ‘আমাদের ড্রাইভারের ভাগনের সাথে দু-লাখ টাকা দিতে হয়েছে, বাচ্চাটা তারই হবে।’

হাফিজুর রহমান বলে, ‘বাচ্চাটিকে আমি নিয়ে আসবো।’

মাহমুদা রহমান বলেন, 'তা আনবে, পোলা হলে তো আনবেই, পোলার বাপ হবে আলহজ মোঃ হাফিজুর রহমান।'

হাফিজুর রহমান বলে, 'আজ আমি চলে যাচ্ছি, আগামী মাসে ডেলিভারির সময় আবার আসবো।'

মাহমুদা রহমান বলেন, 'আজ চলে যাচ্ছা, কিন্তু বুকে একটা দাগ নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। আমি একটু প্রতিশোধ নিতে চাই।'

হাফিজুর রহমান বলেন, 'কী প্রতিশোধ?'

মাহমুদা রহমান বলেন, 'আমি মাহবুব সাহেবের সাথে আজ রাতে ঘুমোবো এটুকু শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। তুমি কিছু মনে কোরো না, মাহবুব সাহেবকে আমি পছন্দ করি, তাঁকে দেহটি দিতে চাই।'

আমি কোনো কথা বলি না; তালো মানুষের মতো বলতে পারি না, 'এ কী বলছেন, এ কী বলছেন', আমি চুপ করে থাকি, একটা সৎ মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার তালো লাগছে না। হাফিজুর রহমানের মুখ কঠিন হয়ে উঠার কথা, কিন্তু তিনি আরো ভেঙে পড়ছেন; তিনি বানিয়েই বলতে পারতেন, 'অশ্রু ঘুমাওই' কিন্তু তাঁর মুখে কোনো কথা আসে না। তাতে মাহমুদা রহমান প্রত্যাশাচ্ছেন না, তিনি সুব পেতেন যদি হাফিজুর রহমান সাড়া দিতেন। সাড়া জাপানের জন্যে মাহমুদা রহমান তীব্র হয়ে উঠতে থাকেন।

'আমি শুধু ঘুমোবো না', মাহমুদা রহমান বলেন, 'আমি মাহবুব তাইয়ের দ্বারা প্রেগন্যান্ট হবো।'

হাফিজুর রহমান একবার নড়েচড়ে বসেন, আমি পাথর হয়ে যাই।

'মাহবুব তাই রাজি না হলে', মাহমুদা রহমান বলেন, 'আমি আমার ড্রাইভারের সাথে ঘুমোবো, ড্রাইভারের দ্বারা প্রেগন্যান্ট হবো।'

হাফিজুর রহমান এবার নড়েচড়ে বসতেও পারেন না, একটু কাঁও হয়ে পড়েন সোফার ওপর।

মাহমুদা রহমান বলেন, 'ড্রাইভার রাজি না হলে ড্রাইভারের ভাগনের সাথে ঘুমোবো, আমি পেটে তার একটা পোলা নেবো।'

আমি উঠে পড়ি, কোনো কথা বলি না। অনন্যার প্রিয় বেঙ্গোরায় যেতে হবে আমাকে, সে বলছে সেটি শুব সুন্দর চুকলেই মন ভরে যায়। মেয়েরা একটু পরেই আসে বলে জানি আমি, তাই একটু দেরি করেই চুকি, গিয়ে দেবি অনন্যা আলোঅঙ্ককারাঙ্গন এক কোণে বসে আছে। সে বসে আছে দেবে আমি বিশ্রিত হই, আমারই আগে আসা উচিত ছিলো।

'একা একা অপেক্ষা করতে আমার তালো লাগে', অনন্যা বলে, 'তাই আমি একটু আগেই এসে বসে আছি।'

'দেরি ক'রে আসতে আমার খারাপ লাগে', আমি বলি, 'আরেকটুকু আগে এলে তোমাকে আরেকটুকু বেশি দেখতে পেতাম।'

'তাহলে একটু দেরি করে বেরোবো আমরা', অনন্যা বলে।

কিন্তু আগের সময়টুকু কোথায় পাবো?' আমি বলি।

আমি কোনো খাবারের নাম মনে রাখতে পারি না, কিন্তু অনন্যার দেখছি সব মুখস্থ, হয়তো নম্বরগুলোও মুখস্থ। সে একেকটির নাম, রেসিপি, আর স্বাদ বলতে থাকে, তার ঠোট থেকে নামগুলো বুব সুস্বাদু হয়ে বেরোচ্ছে। অনেক বছর পর খাবার আমার কাছে সুস্বাদু মনে হয়। আমি সুপ নেড়ে নেড়ে চিংড়ি বুজতে থাকি, অনন্যা চমৎকার মশলা মিশিয়েছে সুপে, তার আঙুল থেকে সুস্বাদ গলে গলে নেমেছে সুপের পেয়ালায়। আমার মনে পড়ে প্রথম যেদিন চেচিংচোতে সুপ খেয়েছিলাম, সেদিন আমার বুব হাসি পেয়েছিলো।

'আমি যদি সেদিন মরে যেতাম তাহলে আপনার সাথে দেখা হতো না', অনন্যা বলে।

'আমি একটি সুন্দর লাশ দেখতে পেতাম', আমি বলি, 'বুব কষ্ট লাগতো; জানতে ইচ্ছে করতো জীবিত সে কেমন ছিলো।'

'আমাকে আপনার কেমন লাগে?' অনন্যা বলে।

'ভালো ও সুন্দর', আমি বলি।

'সুন্দর দেখলে আপনার কেমন লাগে?' অনন্যা বলে।

আমি কোনো উত্তর দিই না, দিতে পারি না। আমি যেনো বুঝে উঠতে পারছি না সুন্দর দেখলে আমার কেমন লাগে।

'বলুন, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে', অনন্যা বলে।

'আমার সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে ইচ্ছে করে', আমি বলি, 'ছেলেবেলায় আমি চাঁদটাকে জড়িয়ে ধরে কামড়াতে চাইতাম।'

'আপনি তো ভয়ঙ্কর স্বর্ণে বলে, 'সব কিছুকেই কামড়াতে চান?'

'চুলোর লাল টুকটুবে, আগুনকেও আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করতো', আমি বলি, 'সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে ইচ্ছে করতো।'

'আমাকে ভোগ করতে আপনার ইচ্ছে করছে না?' অনন্যা বলে।

আমি অনন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, ঘাসে সোনালি হয়ে উঠছে দেখতে পাই।

'না', আমি বলি।

'কেনো?' অনন্যা বলে।

'তোমাকে আমার সুন্দরের থেকে বেশি মনে হয়', আমি বলি।

'তাতে কী?' অনন্যা বলে।

'আমি তা বুঝতে পারছি না', আমি বলি, 'তবে আজো তোমাকে ভোগ করার কোনো ইচ্ছে আমার হয় নি। কোনো দিন হ'তে পারে।'

'আপনার চোখ দেখে আমি তা বুঝতে পারি', অনন্যা বলে, 'কিন্তু জানেন আমি যেখানেই যাই সবাই আমাকে ভোগ করতে চায়, হয়তো সব মেয়েদেরই চায়।'

'আমিও সাধারণত চাই', আমি বলি।

‘আমার ছাত্রটি আমাকে ভোগ করতে চায়’, অনন্যা বলে, ‘ওই গোলাপের অর্থ আমি বুঝি।’

চূপ ক'রে হাসে অনন্যা, এবং বলে, ‘বুড়ো প্রিসিপালটি আমাকে ভোগ করতে চায়। ইলেক্ট্রিক বিল দিতে গেলে কেরানিটি এমনভাবে তাকায়! কোর্টে আমাদের একটি মামলা আছে, আমিই দেখাশোনা করি, আমাদের প্রত্যেকটি উকিল আমাকে ভোগ করতে চায়, আমি বুঝি, তাদের চার পাঁচটি ক'রে বাজা আছে।’

‘বৌড়া ভিখিরিকে পয়সা দেয়ার সময় খেয়াল কোরো, দেখবে সেও তোমাকে ভোগ করতে চাচ্ছে’, আমি বলি, ‘মনে মনে ভোগ করছে।’

‘এমনকি আমার তিনটি সহকর্মীও চাচ্ছে’, অনন্যা বলে, ‘আমি ওদের সাথে তোগে সঙ্গী হই।’

‘তা চাইতে পারে’, আমি বলি, ‘সব সময় পুরুষ লাগে না।’

‘ওরা হোস্টেলে থাকে’, অনন্যা বলে, ‘আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যায়, তালো খাওয়ায়, আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা ঘুমোয়, আমাকে কিছু বলে না।’

‘ওরা ভাবছে এক সময় তুমি নিজেই অংশ নেবে’, আমি বলি।

‘আমি শিগগিরই বোধ হয় অনেক দূরে চলৈ যাবো’, অনন্যা বলে, ‘কষ্ট হয় আপনার সাথে দেখা হবে না।’

‘কোথায় যাবে, কেনো দেখা হবে না?’ আমি বলি।

‘আমি নিজেও জানি না’, অনন্যা বলে, ‘হয়তো কেউ জানবে না। তার আগে আমরা একদিন বেড়াতে যাবো।’

‘তার আগে তুমি আমার সাথে বেড়াতে যাবে’, আমি বলি, ‘তাহলে আমি তোমার সাথে কোনো দিন বেড়াতে যাবো না। তখন তুমি আর অনেক দূরে যেতে পারবে না।’

‘বেড়াতে না গেলেও আমাকে চলৈ যেতে হবে’, অনন্যা বলে, ‘চলুন না আজই বেড়াতে যাই।’

‘না, না, না; আমি বেড়াতে যাবো না। আমি বলি।

অনন্যাকে আজ মধুরতম মনে হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করবে, হয়তো তাকে ভোগ করার বাসনা জেগে উঠবে, আমার রক্ত জুলৈ উঠবে। আমি উঠে পড়ার প্রস্তাৱ নিই, অনন্যা আরো কিছুক্ষণ থাকতে চায়, কিন্তু আমি উঠতে চাই।

‘আপনার কি কোনো জৰুরি কাজ আছে?’ অনন্যা বলে।

‘না, কোনো কাজ নেই; বেরিয়ে কোথায় যাবো, তাও জানি না; কিন্তু আমি উঠতে চাই।’

‘কেনো?’ অনন্যা বলে।

‘আর কিছুক্ষণ থাকলে আমার মনে ভোগ করার সাধ জাগবে’, আমি বলি।

‘জাগুক না’, অনন্যা বলে।

আমি অনন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি; কিন্তু এখনো আমার ভোগ করার সাধ জাগছে না, অনন্যার শরীর পরিমাপ করার আগ্রহ হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমার তেতুর কোনো পুরুষ নেই, লিঙ্গ নেই। অদ্ভুত লাগে আমার।

‘আমাকে দেবে যাদের সাধ জেগেছে’, অনন্যা বলে, ‘তাদের জন্যে আমার কোনো সাধ জাগে নি; আমার ইচ্ছে হচ্ছে যার জন্যে আমার সাধ জেগেছে আমার জন্যে তার একটু সাধ জাগুক।’

‘হয়তো কোনো দিন জাগবে’, আমি বলি।

‘তখন হয়তো আমি থাকবো না’, অনন্যা বলে।

অনন্যা ওঠে, আমি তাকে একটি রিকশায় উঠিয়ে দিই। অনেকক্ষণ রিকশাটির দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু আগে আমার মনে হচ্ছিলো কোথায় যাবো আমি জানি না, কিন্তু এখন আমার তা মনে হয় না। আমার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে। খুব দুঃখ পেলে আমি খুব সুস্থ হয়ে উঠি। ছেলেবেলা জেগে ওঠে আমার মধ্যে, যখন আমি চুরম কঠে পড়ি তখনি এটা হয়, দুঃখ পেলে আমি কেমন করে যেনো নিজেকে গুটিয়ে আনি নিজের মধ্যে। এখন যদি আমি রাস্তায় ব'সে তিক্ষে চাইতে শুরু করতাম, সেটা অস্বাভাবিক হতো না, আমার ভেতরটা তেমনি করছে; যদি আমি ট্রাকটির নিচে ঝৌপিয়ে পড়তাম, সেটা অস্বাভাবিক হতো না, আমার ভেতরটা তেমনি করছে; কিন্তু আমি বাসার দিকে ইটাতে থাকি। একটি রিকশা নিই, কাজের মেরুট আমাকে দেবে অবাক হয়। যেয়েটির মুখ দেবে ওকে নিঃসঙ্গ লাগে, ও আমার থেকেও নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। একটু হইকি যাবো? না। একটা এক্সএক্সএক্স হবি থাকবো? না। আমার সহকারীণীটিকে ফোন করবো? না। আমি আমার বইগুলো আবার খুজতে শুরু করি, অনেক দিন বই পড়ি নি, একটি পাগলামুর কবিতার বই আমার হাতে পড়ে, এককালে ওর কবিতা ভালো লাগতো, তার পাগলামো আমি পছন্দ করতাম; আমি পড়তে শুরু করি, পাগলামো অস্মার আবার ভালো লাগতে শুরু করে। আমি ওর কবিতা পড়তে থাকি, উচুকভে পড়তে থাকি, আমার মুখস্থ হয়ে যেতে থাকে, বাইরে সন্ধ্যা হয়ে যেতে থাকে। বাইরের ফোন বাজতে থাকে, আমি ধরি না। আমার কোনো বাইরের জগৎ নেই। কিন্তু ফোনের শব্দে আমার চারপাশ ভেঙে পড়তে থাকে; আমি ফোন ধরি।

‘মাহবুব সাহেব’, মাহমুদা রহমান বলেন, ‘আপনাকে পাবো ভাবি নি, কিন্তু একটি খবর দেয়ার জন্যে আপনাকে চারদিকে ফোন করছি।’

‘কী খবর বলুন?’

‘এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে হাফিজের হাট অ্যাটাক হয়েছে’, মাহমুদা রহমান বলেন, ‘হাফিজ মারা গেছে।’

‘আমি খুব দুঃখিত’, আমি বলি, ‘আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।’

‘কিন্তু আমার কোনো কষ্ট লাগছে না’, মাহমুদা রহমান বলেন।

হাফিজুর রহমানের লাশ দেখতে কি যেতে হবে আমাকে? মাহমুদা রহমান আমাকে যেতে বলেন নি, আর হাফিজুর রহমান ব'লে কেউ ছিলেন, তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিলো, আমার মনে পড়ে না; তাঁর চেহারা কেমন ছিলো? আমার মনে পড়ে না। অর্টিকে মনে পড়ে আমার, অর্টির মুখটি মনে পড়ে না। অর্টি কি পৌছে ফোন করেছে? অর্টি কি পৌছেছে? অর্টির প্রেন কি এখনো উড়ছে, চিরকাল উড়তে থাকবে? অর্টির

এখন ফিরে আসতে ইচ্ছে করছে? অট্টি কে? আমার যেয়ে? অট্টির অনেক ছবি আছে অ্যালবামে, এখনি আমি বের ক'রে দেখতে পারি, দেখতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু দেখতে গেলে ছবিগুলো যদি কাঁদে, ছবিগুলোর চোখে যদি জল দেখা দেয়? অনন্যা কি বাসায় ফিরেছে, না কি সে অনেক দূরে যাবে বলেছে, অনেক দূরে যাত্রা করেছে? কতো দূর যাবে? আমি কি অনন্যাকে একবার ফোন করবো? আমি ফোন করলে সে ভয় পাবে, মনে হবে আমার কিছু হয়েছে।

ফিরোজা ফোন করেছে, তার বেশি কথা নেই, একটি মাত্র তার কথা।

'আমি তোমার থেকে পৃথক থাকতে চাই', ফিরোজা বলে।

'ঠিক আছে', আমি বলি।

ফিরোজার কথা আমার মনেই পড়ে নি কয়েক দিন, তার ফোন পেয়ে মনে হলো সে আমার স্ত্রী ছিলো, এখনো আছে; তবে এখন দূরে থাকতে চায়, কিছু দিন পর হয়তো বিচ্ছেদ চাইবে। একলা থাকতে আমার খারাপ লাগছে না, বিজ তেওঁ পড়লে বিজের খারাপ লাগে না, খারাপ লাগে অন্যদের, আমার খারাপ লাগছে না। আমার ব্যক্তিগত সহকারিনীটিকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, বিষণ্ণতায় সুন্দর হয়ে উঠছে। কার জন্যে, কী জন্যে?

'তোমাকে এতো বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেনো?' আমি বলি।

সে চমকে ওঠে, আমার থেকে সে এমন প্রশ্ন আশা করে নি; কিন্তু আমার প্রশ্ন মনে সে খুশি হয়ে উঠছে।

'কই, না স্যার, এমনি', সে বলে।

'বিষণ্ণ হওয়ার কথা আমার', আমি বলি।

'কেনো স্যার?' সে বলে।

'আমার যেয়ে চলে গেছে, বউ পৃথক থাকতে চাচ্ছে', আমি বলি।

মেঝেটি আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

আমাদের লিমিটেড এখন গোটা দশেক বিজের কাজ করছে, তার মধ্যে একটি বড়ো বিজ রয়েছে, কিন্তু এখন আমি ভাবছি সুড়ঙ্গপথের কথা। বিজ দেবে দেবে আমার ক্লান্তি এসে গেছে। যে-শহরটিতে আমি থাকি, সেটি জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে, ওর দম আটকে আসছে, ওর রাস্তাগুলো নিশাস ফেলতে পারছে না। আমি সুড়ঙ্গপথের কথা ভাবছি, একটি পরিকল্পনা এসেছে আমার মাথায়। শহরের কেন্দ্র থেকে উত্তর দক্ষিণ পুর পশ্চিমে সুড়ঙ্গ খৌড়া যেতে পারে, তার পরিকল্পনা করছি আমি মনে মনে, কিছুটা কাগজে কল্পিউটারে; আমার মনে হচ্ছে এটা করার এখন সবচেয়ে ভালো সময় আমার। আমার শরীরকাঠামো ততোদিন টিকবে না, আমি একটিও সুড়ঙ্গপথ দেখে যাবো না, কিন্তু তার পরিকল্পনা করার এটাই ভালো সময়। আমাদের কয়েকজনের সাথে আমি আলাপ করেছি, তাঁরা হেসেছেন, একজন আমাকে 'স্পন্দিষ্টা' উপাধি দিয়েছেন, কিন্তু আমার ভালো লাগছে। বাস্তবের থেকে স্পন্দিষ্টা বেশি ভালো লাগছে আমার।

অনেক দিন পর নূর মোহাম্মদ আর বেগম নূর মোহাম্মদকে দেখে তালো লাগলো আমার; আগের যতোই বারান্দায় তারা একজন দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখ আরেকটুকু ঘোলা হয়েছে মনে হয় নূর মোহাম্মদ সাহেবের; আরেকজন চায়ের পেয়ালা নিয়ে পুর দিকে তাকিয়ে আছেন, চা খাচ্ছেন না। আমার কি বেশ ভালো লাগলো? কী সুব এভাবে দাঢ়িয়ে থেকে ব'সে থেকে? তারা কী ক'রে পারছেন? তাদের ক্লান্তি লাগছে না? ক্লান্তিকে তারা এতো মহৎ ক'রে তুলছেন কীভাবে? একদিন আমি তাদের সাথে গিয়ে বসবো? তারা কি আলাপ করবেন আমার সাথে? তারা কি বুঝতে পারছেন তারা ক্লান্ত? একটি বেজি দৌড়ে ওপাশের জঙ্গলে চুকলো, বেজিটাকে আমার ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করছে; নূর মোহাম্মদের ঈর্ষা করছি না। অনেক দিন ধ'রে আমি কাম বোধ করছি না, আমার একটু বোধ করতে ইচ্ছে করছে; আজ অফিসে গিয়ে দেখবো সহকারণীটিকে দেখে আমার কামবোধ হয় কি না।

‘আপনার সাথে বেড়াতে যেতে চাই’, অনন্যা ফোনে বলছে, ‘আপনি কেনো রাজি হচ্ছেন না?’

‘তাহলৈ তো তুমি অনেক দূরে চলে যাবে’, আমি বলি।

‘চ'লে যে যাবোই তা তো আমি নিশ্চিতভাবে জানি না’, অনন্যা বলে, ‘যেতেও পারি, তার আগে চলুন না গাছ দেখে আসি নন্দী দেখে আসি।’

‘আমি নদী আর গাছ অনেক দেখেছি, আমি বলি।

‘একলা নদী দেখা একলা গাছ দেখা’থেকে দূজনে গাছ আর নদী দেখা ডিন্ন’, অনন্যা বলে।

‘আমার থেকে সবাই অনেক দূরে চ'লে যেতে চায়’, আমি বলি।

‘আজ আমার আর্কাম শুনে দিন’, অনন্যা বলে, ‘তাই আজ বেড়াতে যেতে খুব ইচ্ছে করছে।’

‘তোমার আর্কা নেই?’ আমি বলি, ‘তুমি তো কখনো বলো নি।’

অনন্যা কাঁদতে থাকে, আমি তার কান্না দেখতে পাই।

‘চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি’, অনন্যা বলে।

‘না’, আমি বলি।

আমার সহকারণীটিকে দেখে আমি কামবোধ করছি, সে এখন অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আমার সামনে, মাঝেমাঝে দু-একটি কথা বলছে, বিলিকের মতো লাগছে আমার।

‘স্যার, আজকে কি আমাকে বিষণ্ণ লাগছে?’ সে বলছে।

‘না, খুব ঝলমলে দেখাচ্ছে’, আমি বলি।

‘আমাকে তো আপনি পছন্দ করেন না, স্যার’, সে বলে।

‘কে বললো তোমাকে?’ আমি বলি।

‘আমার মনে হয়’, সে বলে, ‘আমার একটি খবর আপনাকে দিতে ইচ্ছে করছে, স্যার।’

‘বলো’, আমি বলি ।

‘আমার বিয়েটা কয়েক দিন আগে ভেঙে গেছে’, সে বলে, ‘এখন তালো আছি, স্যার ।’

‘আমার সাথে তুমি আজ বেড়াতে যাবে?’ আমি বলি ।

‘যাবো’, সে বলে ।

আমি ফোন করে পাঁচতারা হোটেলের দশতলায় একটি কক্ষ বুক করি, দেবীর সাথে গিয়েছিলাম যে-কক্ষটিতে ।

‘আমি আজ তোমাকে ছেড়ে চাই’, আমি বলি ।

‘আমিও চাই’, সে বলে ।

আমরা দশতলার কক্ষটিতে প্রবেশ করি, যেয়েটি উড়ছে ব'লে মনে হচ্ছে; গাড়িতে প্রজাপতির মতো করছিলো, বারবার জানালার কাছে লেগে ফিরে ফিরে আসছিলো ভেতরে, বক্তা বোধ হয় তার সহ্য হচ্ছিলো না । আমি ঘুরে চুকে তার দিকে তাকাই, আমাকে সে জাগিয়ে তুলছে মনে হচ্ছে । আমি এতো দিন খেঞ্জল করি নি সে একটি চমৎকার শরীর, হাঁটার সময় অনেকটা নাচার মতো ভাসি রয়ে । এক সময় হয়তো নাচতো, এখনো নাচে? তাকে আমি কী করে জড়িয়ে পরবো? আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না । আমি একটি সোফায় বসে পড়ি সে মেঝেতে বসে ।

‘তুমি মেঝেতে বসলে কেনো?’ আমি বলি ।

‘আপনিও বসুন স্যার’, সে বলে, আপনার তালো লাগবে ।’

আমি মেঝেতে বসি, তার খেকে অনেকটা দূরে ।

‘তুমি আবার আমাকে রিয়ে করতে পাগল হয়ে উঠবে না তো?’ আমি বলি ।

‘না’, সে বলে ।

আমাকে সে আর স্যাত বলছে না, আমি স্বত্ত্ব পাচ্ছি ।

‘তোমার কি মনে হবে না যে আমি তোমাকে শোষণ করেছি? আমি বলি ।

‘না, আমি তো অনেক দিন ধ'রে মনে মনে চাচ্ছি’, সে বলে ।

শরীর অনেক দিন পর আমাকে মুক্ষ করে, আমি একটি নতুন শরীর লাভ করতে থাকি; আমার খোলশ বসে পড়তে থাকে, নতুন হয়ে উঠতে থাকি আমি । এ-নতুনকেই আমি চেয়েছিলাম । তার শরীরের স্বত্ত্বাব আমাকে বিশ্বিত করে; তার ডান হাতের একটি আঙুল আমি খেলাছলে ছুই, তারপর দুটি-তিনটি আঙুল ছুই, দুবার আন্তে ঠোটে ঘষি, আর অমনি সে মাথাটি কাঁধের ওপর বাঁকা করে রেবে ঘুমিয়ে পড়ে; আমি তার মুখে আঙুলের টোকা দিয়ে চিবুক নেড়ে ঠোট টেনেও তার ঘৃণ্য ভাঙাতে পারি না । তাকে ঘুমিয়ে আমি যেভাবেই রাখি ঘুমের মধ্যে সে সেভাবেই থাকে । সে এমন সম্মোহিত হলো কীভাবে? আমি তার একটি হাত ওপরের দিকে তুলে ধরি, হাতটি সেভাবেই থাকে; মুখটি আমি একটু ঘুরিয়ে দিই, সেভাবেই থাকে । সে এমন সম্মোহিত হলো কীভাবে? আমি একটু ঘুমিয়ে দিই, সেভাবেই থাকে । এমন সম্মোহিত শরীর আমি কখনো দেখি না । মেয়েরা নিক্ষিয় আমি জানি, নারীবাদী দুটি নারীও আমি দেখেছি,

তারাও স্বল্প সক্রিয়তার পর সম্পূর্ণ নিষ্ঠিয় হয়ে পড়ে; কিন্তু এ সম্পূর্ণ সম্মোহিত। আমি এক এক ক'রে তাকে বন্ধ থেকে মুক্ত ক'রে আনি, বিশ্বাসকর সব দেহখণ্ড বেরিয়ে পড়তে থাকে। তার ক্ষন দুটি পর্যন্ত সম্মোহিত হয়ে আছে। আমি দুটিকে একে অন্যের সাথে মিলিয়ে দিই, তারা দুটি যমজ বোনের মতো মিলে থাকে; আমি দুটিকে দূরতম দূরত্বে সরিয়ে দিই, তারা দূরবর্তী দীপের মতো ভাসতে থাকে। আমি যদি শিখ হতাম বিশ্বাসকর এ-বন্ধু দুটি নিয়ে বছরের পর বছর খেলতাম। আমি তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, সে কিছুতেই জাগে না; আমার মনে হ'তে থাকে পরম পুলকের আগে সে জাগবে না। তার একটি দীর্ঘ অঙ্কুর রয়েছে, আমার কড়ে আঙ্গুলের সমান, গোলাপি আভা আছে তাতে, আর সেটিও সম্মোহিত। তার শরীরের যে-অংশ আমি গলাতে ঢাই, সেটুকুই গলতে থাকে; দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ সময় কেটে যেতে থাকে, তিন ঘণ্টার মতো হবে, সে তখন সম্পূর্ণ গ'লে যায়, এবং এক সময় সে চিৎকার ক'রে ওঠে।

‘আমি কোথায়?’ সে চিৎকার ক'রে ওঠে।

‘আমার সামনে’, আমি বলি।

নিজেকে সে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখে একটু লজ্জা পড়ে কিন্তু নিজেকে ঢাকার কোনো চেষ্টা করে না; আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।

‘আমি ম'রে গিয়েছিলাম’, সে বলে।

‘তিন ঘণ্টার ছোটো মৃত্যু’, আমি বলি।

‘তিন ঘণ্টা?’ সে ঝলমল ক'রে ওঠে, আর বলে, ‘এমন মৃত্যুই আমি চেয়েছি কিন্তু ওই লোকটি তা বোবে নি, তাই ভেঙে গেলো।’

অনন্যা দু দিন ধ'রে কেনেভকে করছে না, আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি; প্রতিটি কোষে আমি সময় বোধ করছি। আমার শরীরের তেতুর সময়ের কাঁটা ফুরছে না স্থির হয়ে আছে? সময় আশ্চর্য ভাবী জিনিশ। সবচেয়ে ভাবী কী, কৃষ্ণ গহ্বর? একটি কৃষ্ণ গহ্বর আমার ওপর এসে পড়েছে। অনন্যা কি তাহলে খুব দূরে চ'লে গেছে? কেনো সে খুব দূরে যেতে চায়? আমি কিছুই তার কাছে জানতে চাই নি, সে বলতো না হয়তো। তার জন্যে আমি রক্তের এমন টান বোধ করি কেনো? আমার সহকারীণীটি একবার বলেছে, ‘স্যার, আপনাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।’ আমি কিছু বলি নি। আমি একবার বেরিয়ে পড়ি, একটা রিকশা নিই, রিকশা নিয়ে এখন আর কেউ কিছু মনে করে না, আমার ভালো লাগে, অনন্যাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হই, আমার বয়স হয়েছে, একটি চায়ের দোকানে চুক্তে চা খাই, আবার পথে দাঁড়াই। আমার ভালো লাগে। তারপর অফিসে ফিরি।

বিকেলে ফিরোজা ফোন করে, ‘তুমি কেমন আছো?’

আমি বলি, ‘ভালো।’

ফিরোজা বলে, ‘আমি ফিরে আসতে চাই।

আমি বলি, ‘এভাবেই তো ভালো আছি।’

ফিরোজার কান্নার শব্দ শুনতে গাই, আমি টেলিফোন রেখে দিই ।

ফিরোজ কেনো ফিরে আসতে চায়? নৃতাত্ত্বিকটির সাথে? কি তার মিল হচ্ছে না, না কি নৃতাত্ত্বিকটি এখন তরুণীতর নৃত্য চর্চায় মন দিয়েছে। ফিরোজার জন্যে একটু সহানুভূতি হয়, কিন্তু আমি কোনো অভাব যত্নণা বোধ করি না। অনন্যার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে, অর্চির জন্যে কষ্ট হচ্ছে, —অর্চির প্লেন কি নেমেছে, —ফিরোজার জন্যে হচ্ছে না, যদিও আমি চাচ্ছি তার জন্যও আমার রক্তে কিছুটা কষ্ট দেখা দিক। আমি কি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারি না? কেনো পারি না? নৃতাত্ত্বিকটির সাথে সে ঘুমিয়েছে ব'লে? তাতে কী হয়েছে? অন্যের সাথে ঘুমোলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়? যারা অন্যের সাথে ঘুমোয় না, তারা কি খাটি থাকে? আমি কি নষ্ট হয়ে গেছি, অন্যের সাথে আমি অনেক ঘুমিয়েছি ব'লে? সন্ধ্যার দিকে দেখি ফিরোজা ফিরে এসেছে; একা আসে নি, সাথে তার আম্বা আর বোনও এসেছে। তাহলে সে ধৰেই নিয়েছে সে অধিকার হারিয়ে ফেলেছে, একা এলে অধিকার ফিরে পাবে না; কেউ তাকে অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আমি বাইরে যাবো ব'লে ভেবেছিলাম, তারা আসায় আমি যেতে যাবো না। ফিরোজা কাদছে দেখে আমার ঝারাপ লাগে, কিন্তু তাকে কষ্ট বলা যাব না। তার বোন হাঙ্কা ভঙ্গিতে কথা বলছে যেনো কিছুই হয় নি।

‘ফিরোজাকে নিয়ে এলাম’, তার বোন বলেন, ‘ও খুব কষ্টে আছে।’

আমি বলি, ‘সে তো পৃথক থাকতে চায়।’

তার বোন বলেন, ‘ওটা ওর বিষয় তুমি কিছু মনে কোরো না।’

আমি বলি, ‘আমাদের আর একসাথে থাকা সম্ভব নয়।’

তার আম্বা বলেন, ‘তুমি কি আমাকে ঘেন্না করো।’

ফিরোজা বলে, ‘তুমি কি আমাকে ঘেন্না করো।’

আমি বলি, ‘না।’

ফিরোজা বলে, ‘আমি তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই।’

আমি বলি, ‘না।’

আমরা চারজন ব'সে আছি, কথা বলছি না; ফিরোজার বোন কথা বলছিলেন, এখন তিনিও কথা বলছেন না; তবে তাঁরা আরো দেখবেন, হয়তো সারারাত দেখবেন, তারপরও দেখার জন্যে আরো দিনরাত প'ড়ে থাকবে। আমি ‘না’-টিকে ফিরিয়ে নিতে পারবো ব'লে মনে হচ্ছে না; ফিরোজার সাথে আমার বাঁশের সাঁকো ভেঙে গেছে, ওটি আবার আমি তৈরি করতে চাই না। আমি আর কোনো সাঁকোই তৈরি করতে চাই না, প্রথাগত সাঁকো তো নয়ই। শ্বামী-স্ত্রী শব্দগুলো ঘিনঘিনে মনে হচ্ছে আমার কাছে, নিজেকে আমি আর শ্বামী ভাবতে পারছি না কারো, কাউকে আমার স্ত্রী ভাবতে পারছি না। কাবিনের নোংরা কাগজে অনেক আগে আমি একবার সই করেছিলাম, তার কবল থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। এমন সময়, সঙ্গে সাড়ে আটটা হবে, ফোন বেজে ওঠে।

'এটা মাহবুব সাহেবের বাসা, মাহবুব সাহেবের বাসা?' অন্য প্রান্ত থেকে এক মহিলা আর্ত চিৎকার করছেন, কোথাও হয়তো আকাশ ভেঙে পড়েছে।

'বলছি', আমি বলি, 'আমি মাহবুব বলছি।'

'আমি ডাক্তার তাহমিনা', তিনি আরো আর্ত চিৎকার করেন, 'আমি এলিফ্যান্ট রোডের মুস্তি ক্লিনিক থেকে বলছি।'

'বলুন', আমি বলি।

'আপনি অনন্যা নামের কাউকে চেনেন?' তিনি বলেন, 'আমি খুব বিপদে আছি।'

'কেনো?' আমি বলি।

'সে বিকেলে আমার ক্লিনিকে এমআর করানোর জন্যে এসেছিলো', তিনি বলেন, 'তার দেরি হয়ে গিয়েছিলো, তার আর জ্ঞান ফিরে আসে নি।'

'আমার টেলিফোন নম্বর কোথায় পেলেন?' আমি বলি।

'তার ব্যাগে একটি ফিজিঙ্গের বইয়ের তেতর নাম আর নম্বর পেয়েছি', মহিলা কেবে ফেলেন, 'আমি তিন হাজার এম আর করেছি, আপে এসে আর হয় নি।'

'এ-নামের কাউকে আমি চিনি না', আমি বলি, 'এ-নামের কাউকে আমি চিনি না।'

আমি টেলিফোন রেখে দিই। অনন্যা নামের কাউকে আমি চিনি না।

আমি শুন্ক হয়ে চেয়ারে বসি, অনন্যা নামের কাউকে আমি চিনি না। আমার ঘেন্না লাগতে থাকে, ওরা তিনজনই আমার সাথে কথা বলতে চায়, কী যেনো বলে, আমি শুনতে পাই না। আমার ঘেন্না লাগতে থাকে। আমি কোনো কথা বলি না, ওরা তিনজন আমাকে কী বলছে আমি শুনতে পাই না। ওরা আর কথা বলছে না মনে হয়, হয়তো ডয় পেয়ে গেছে। আমি অনন্যা নামের কাউকে চিনি না। দশটা বাজলো মনে হয়, ঘড়িটা ধামছে না, সারা পৃথিবীত ঘড়িটা দশটা বাজার সংবাদ পৌছে দেবে মনে হচ্ছে। আমি একটি পায়ের পাতা দেখতে পাই, পায়ের পাতার নিচে ঘাস সোনালি হয়ে উঠছে। আমার বুক খুব ভারী হয়ে উঠছে। আমি অনন্যা নামের কাউকে চিনি না।

এগারোটা বাজলো, ওরা তিনজন আমার সামনে বসে আছে, খুব শুক্রতৃপূর্ণ কী যেনো বলতে চাচ্ছে, আমি শুনতে পাই না। বারোটা বাজলো, ঘড়িটা সারা সৌরজগতে বারোটা বাজার শব্দ পৌছে দেয়ার পণ করেছে। একটা বাজে; কার জন্যে বাজে? আমি আর বসে থাকতে পারছি না, আমি উঠে দাঁড়াই, দরোজা খুলে বাইরে বেরোই। আমি রাস্তার দিকে হাটতে থাকি, এলিফ্যান্ট রোড আমি চিনি, এলিফ্যান্ট রোডের দিকে হাটতে থাকি। এখন কটা বাজে আমি জানি না। আমি চৌরাস্তায় এসে দাঁড়াই। মহিলা কোন ক্লিনিকের নাম যেনো বলেছিলো? মডার্ন, নবজীবন, আরোগ্য, আবেহায়াত? আমি কোনো নাম মনে করতে পারছি না। কতো নম্বর এলিফ্যান্ট রোড? ১০, না ১০০, না ১০০০? আমি মনে করতে পারছি না। আমি প্রতিটি দালানের দরোজায় দরোজায় যেতে থাকি, প্রত্যেকটি দরোজা বন্ধ; আমি নাম পড়তে চাই, কোনো নাম পড়তে পারি না। আমি দরোজা থেকে দরোজায় দৌড়ে যেতে থাকি, চিৎকার করতে থাকি নাম ধ'রে, কোনো দরোজা খোলে না। আমি কিছু দেখতে পাই না, চারদিকে প্রচণ্ড

অঙ্ককার নামছে। আমার সামনে একটি দালান ভেঙে পড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দৌড়ে অন্য দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি, একটির পর একটি দালান ভেঙে পড়ছে; ওপাশের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে. এপাশের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, সামনের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, পেছনের দালানগুলো ভেঙে পড়ছে, মহাজগত জুড়ে ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে; আমি ভাঙ্গা দালানের ক্ষেত্রে দিয়ে ছুটছি, দালানের পর দালান ভেঙে পড়ছে, শহর ভেঙে পড়ছে, আমি অবসরে ভেঙে পড়া দালানের পর দালানের ক্ষেত্রে দিয়ে ছুটছি, কী যেনো বুজছি, আমি চারদিকে দালান ভেঙে পড়ছে, শহর ভেঙে পড়ছে, সব কিছু ভেঙে পড়ছে।